পড়শি বসত করে

পড়শি বসত করে

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৮ এপ্রিল ১৯৬১

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ মুদ্রক
ইম্প্রেসন হাউস
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক
নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২, বিডন রো
কলকাতা-৭০০০০৬

পড়শি বসত করে

পিছনে না ফিরে উপায় নেই। পিছনেই ফিরতে হচ্ছে তাকে। ভবিতব্যই তাকে যেন টানছে ধূলিহর-এ, অথচ বিজন যেতে পারছে না। এ যে কী টানাপোড়েন! এতখানি টাকা-পয়সা খরচ করে, গায়ের ঘাম ঝরিয়ে, শত উদ্বেগ মাথায় নিয়ে যে ধূলিহর নির্মাণ করল জগৎপুরে, সেই ধূলিহর-এ পৌঁছতে কত বাধা! যেতে চায় বিজন, পিছনে হাঁটতে হাঁটতে...আহা সে যেন পূর্বপুরুষের জীবনে পৌঁছে যাবে ধূলিহরে পা দিয়ে। ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবার সঙ্গে পুকুরধারে গিয়ে দাঁড়াবে। আমগাছের ছায়ায় দাঁড়াবে, শহর থেকে গাঁয়ে ফিরবে, কলকাতা ত্যাগ করে জগৎপুরে থিতু হবে, টাইম মেসিনে চেপে ষাট সত্তর আশি বছর আগের পৃথিবীতে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে, গান্ধীজিও বেঁচে, ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা, তাঁর বাবা প্রপিতামহ উঠোনে গোলা থেকে ধান বের করে বড় পাল্লায় মেপে তুলে দিচ্ছে বাগদি আর মুসলমান চাষীদের ধামায়...বুঝলেন গৌড়বাবু, আমরা ওপারে ফেলনা ছিলাম না।

গৌড়াবাবু, গৌড়েশ্বর মণ্ডল বিজনের ধূলিহরবাসী। বারো ফুট রাস্তার ওপারে তার দালান বাড়ি, মাথায় অ্যাসবেস্টসের ছাউনি। বউ ছেলে, ছেলের বউ, সব ওখানে, তিনি ধূলিহর-এ বিজনের রাখা পালঙ্কে শুয়ে পা নাচাতে নাচাতে বলেন, এমন সবাই বলে দাদা, ওপারে সবারই জমিদারি ছিল।

বিজন যাবে। দু সপ্তা' ধূলিহরে ফেরা হয়নি। সব হয়ে গেছে তবু পাকাপাকি ভাবে যেতে পারছে না, অথচ যেতে চায় বিজন। বেরোতে যাবে তো ষাট বছরের পুরনো ফ্ল্যাটবাড়ির অন্ধকার থেকে কবিতা ডেকে ওঠে, শুনছ!

পিছনে ডাকলে!

ডাকলাম দরকার হল তাই, দাঁড়িয়ে যাও।

কী দরকার? বিজন বসে পড়ে বলে।

তুমি কি তোমার ধূলিহর-এ যাচ্ছ?

ধূলিহর কি তোমার এ নয় কবিতা?

আমি তো পিছনে ফিরতে ভয় পাই, আমি তো তখন তোমাদের কেউ নই।

এও তো সত্য। পনের বছরের একত্র জীবন তাদের। পনের বছর আগের বাঁকুড়া নিবাসী কবিতা রায়কে বিজন কি চিনত? নাকি কবিতা চিনত তাদের।

তারা তো এদেশি বটে। সাতপুরুষ এদেশি। তার আগে কোথায় কে ছিল জানা যায় না। বর্ধমান থেকে বাঁকুড়া কোর্টে ওকালতি করতে ঠাকুর্দার বাবা গিয়েছিলেন ওদিকে। সেই থেকে তো বাঁকুড়ার বাসিন্দা। আবার বাবার বাবা, ঠাকুর্দা মশায় ওকালতিতে না গিয়ে ন'পাহাড়ি হাই স্কুলে গেলেন মাস্টারিতে, তারপর ও জায়গায় মন বসে গেল তাঁর। ওখানেই বাড়ি করে থিতু হলেন—কবিতা তো আসলে ন'পাহাড়ির মেয়ে। পাহাড়ি কবিতা। ডানা এমন ঝাপটায়, বিজন তা সামলাতে পারে না। তবু বিজন বলল, তা ঠিক, তুমি না হয় দূর থেকে দেখ।

তাই তো দেখছি গো। কবিতা তার গলা জড়িয়ে ধরে আচমকা চুমু খায়। ছেলের বয়স এখন দশ। মেয়ের পনেরো। কবিতার চল্লিশ। বিজন সাতচল্লিশ। বাড়ি করা শেষ। ছেলে ক্লাস ফোরে। একটু একটু করে বড় হবে। বড় হবে আর বিজন বুড়ো হবে। মাথার চুলে এর ভিতরেই রুপোলি ভাব জেগেছে কোথাও কোথাও। এখন জগৎপুর—ধূলিহরে যাওয়ার আগে একটি গাড়ি কিনলে হয়। কত শস্তায় গাড়ি দিচ্ছে নানা কোম্পানি। বিজনের বাবা, ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা, তাঁর বাবা কী ভেবে ছিলেন তাঁদের উত্তরপুরুষ বিজনকুমার বসু হাওয়া গাড়ি হাঁকিয়ে ধূলিহর থেকে কলিকাতা ভ্রমণে যাবে? তাঁরা কি এও ভেবেছিলেন ধূলিহর ছেড়ে পুরনো ভিটেমাটি দেশ ছেড়ে আলাদা দেশ কলিকাতায় গিয়ে আবার কলিকাতা থেকে ধূলিহরে ফিরবে বিজন। তাঁরা এও জানতেন না কলিকাতা পাকাপাকি ভাবে কলকাতা হয়ে যাবে। বিজন তৈরি হতে হতে ভাবছিল, এখন, এরপর সে কী করবে? কবিতাকে জিজ্ঞেস করলে বলেছিল, কেন, ছেলেটাকে বড় করতে হবে না, মেয়ের বিয়ে?

ও তো আপনি বড় হবে, বাকিটা কমপ্ল্যান করবে। হাহা করে হেসেছিল বিজন, মেয়েরও বিয়ে হয়ে যাবে।

বাহ্? মানুষ করতে হবে না?

মানুষ তো আপনিই হবে।

না গো না, ওটা খুব বড় কাজ।

কী জানি। বিজন বিড়বিড় করেছিল, আমরা তো আপনা আপনি বড় হয়েছি।

না হওনি, তুমি তো জীবজন্তু পাখপাখালি নও যে পায়ে জোর হলে ডানায় জোর হলে কাজ শেষ, ওগো তুমি একটু সংসারে মন দাও।

কবিতা বেশ ওগো, হ্যাঁগো বলতে পারে। তখন মা-কাকিমার কথা মনে পড়ে। কাকিমা আছেন। মা-বাবা কেউ নেই। বিজন মনে মনে ভাবে ধূলিহর-এ কবিতাকেই মানাবে। বেশ আটপৌরে করে কাপড় পরে মাথায় কাপড় দিয়ে

ফেরিওয়ালার কাছ থেকে জিনিস কিনবে, দর করবে এটা ওটার। তারপর। বিজন জানে না। মানুষের কাজ এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। ছেলে-মেয়ে মানুষ করার ভার তো কবিতা নিয়েছে। সকাল বিকেল তাদের মাথার ভিতরে এটা ওটা ঢুকিয়ে দিচ্ছে—বড় হচ্ছিস পাখি, বড় হওয়াটা বুঝতে হবে, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে...। বিজন বলল, ধূলিহর-এ একটা নদী ছিল কবিতা।

শুনেছি শুনেছি কপোতাক্ষ তো।

যে নদীর তীরে মধুসূদনের জন্ম, সেই নদী ধূলিহর-এর পাশেই।

হুঁ, সে তো অন্যদেশ, এখন ওসব বলে কী হবে?

জগৎপুরে যদি একটা নদী থাকত কবিতা।

কবিতা খিলখিল করে হেসে ওঠে। আছে তো মাছের ভেড়ি, জলাভূমি, নদী ভেবে নাও, ইস ওই জায়গায় কেউ যায়!

বিজন চুপ করে থাকে। জগৎপুরে, জগৎপুরে গড়ে ওঠা তার বাড়ি ধূলিহর-এর নিন্দা তার কানে বিষবৎ। কবিতা অবশ্য ধূলিহর নয়, জগৎপুরের নিন্দে করে। বারণ করেছিলাম, শুনলে না তুমি যা করো নেশায় করো বিজন, জগৎপুরে কী আমি আমার নাচেরই ইস্কুল রাখতে পারব, ওখানে ভরত নাট্যম কেউ করবে? তুমি ধূলিহর ধূলিহর নিয়ে মাতলে, আমার কী হবে ভাবলে না! ধূলিহর কি অন্য জায়গায় হত না?

মনেই পড়েনি তখন কবিতার একটি জগৎ আছে। সেই জগৎ ওই জগৎপুরে অন্ধ হয়ে যাবে। বাড়ি করার সময় বড় একটা হলঘরের কথা একবার বলেছিল সে, বিজন ভুলেই মেরেছে। কবিতার খুব শখ বড় হলঘরে অনেক ঘুঙুর একসঙ্গে বেজে উঠবে। তা ধিন তা ধিন...। কোথায় হল তা ধূলিহরে?

এই ফ্ল্যাটটি হল পুরোপুরি দেশলাই বাক্স। এর একটাই সদর দরজা। তা বন্ধ হলে চারদিকে শুধু দেওয়াল আর দেওয়াল, বড় বড় জানালাও রয়েছে। কিন্তু পুবের জানালা খুললে সাত ফুটগলির ওধারে বাড়িওয়ালার বাড়ি, পশ্চিমের জানালা খুললে আরেক প্রতিবেশীর দেওয়াল, দক্ষিণে জলের রিজার্ভার, পাম্পঘর, প্রাচীর। প্রাচীরের ওপারে পার্শ্বনাথ দিগম্বরের মন্দির। গরমের সন্ধেয় পাঁচিল টপকে পার্শ্বনাথ ঠাকুরের পাঠানো ঠান্ডা বাতাস আসে। বড় জানালার পাশে তাদের শোবার খাট। বেশ বড়, খেলার মাঠের মত। সেই খাটের মশারি চাদর সব হাওয়ায় উড়ে যায় সরাসরি দরজা দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া সুযোগ থাকে বলে। বিজনের বিয়ের পর পর মা বাবা বেঁচে, বোন তখন ও স্বামীপুত্তুর নিয়ে দিল্লি যায়নি, মাঝে মধ্যে চলে আসত। ফলে তাদের দরজা বন্ধ করে শুতে হতো। হাওয়া আর বইত না ঘরের ভিতরে। বড় জানালার ওপারে আকুলি বিকুলি করে হাওয়ার ঢেউ অন্য কোথাও গিয়ে

আছড়ে পড়ত। তারপর কতদিন গেল। এখন এই ঘরের দরজা আর বন্ধ হয় না। তারা চারজন। তাদের গোপনীয়তা আর কার কাছে? হ্যাঁ একতলার ফ্ল্যাট থেকে বাইরেটা দেখা যায় না। বাড়ির বাইরের টালা পার্ক, রাস্তা, জলের ট্যাঙ্ক, কিছুই চোখে পড়ে না। তারা থাকে দক্ষিণে, দক্ষিণের হাওয়া নিয়েছে তারা। উল্টো দিকের উত্তর অংশের প্রতিবেশী জানালা খুলে রাস্তা, আর মাঠের সবুজের ভাগ পেয়েছে, আর পেয়েছে উত্তরের হাওয়া। সে হাওয়া শীতের সময় হিমালয় থেকে বয়ে আসে। শীতের দিনে উত্তরের ফ্ল্যাটগুলি, এতকলা দোতলা তিন তলায় বরফ হয়ে থাকে। ওরা তখন জানালাই খুলতে পারে না। তবু এর ভিতরের কবিতার নাচের ইস্কুল। কী জেদেই না করছে সে। বিজনের 'ধূলিহর' বাড়িটার উত্তরে গৌড়াবাবুর গৃহ, পরপর বাড়ি ঘরদোর, হাওয়া আসার সম্ভাবনা কম। পশ্চিমে বাঁশবন, বড় কালকাসুন্দে গাছ, ডুমুর আর নোনা গাছের আড়াল তাই রোদ আটকে যায়, আবার পুবটা খোলা দক্ষিণও।

বিজন বলল, ধূলিহর-এ গিয়ে না হয় দোতলাটা নাচের জন্যই করে নেব।

নাচ আর হবে না, চুল বেঁধে মাথার ঘোমটা ফেলে হাতে আয়না নিয়ে দাঁড়াব তো?

আহা তা কেন, ওখেনে কি মানুষ থাকে না?

কেন তোমার গৌড়া থাকে, লোকটাকে দেখলে গা রি-রি করে।

আমার বাড়িটা দেখছে ও, রাতে উঠে উঠে বেরিয়ে এসে দ্যাখে আমার বন্ধ বাড়ি ঠিক আছে কিনা। খালি বাড়ি ফেলে রাখা ভয়েরও তো।

ও যেন বেশি দেখতে চায় বাড়িটা।

বিজন টের পায় আজ আর জগৎপুর—ধূলিহর-এ যাওয়া হবে না। আহা কী তার শখ! সেই কোন কালে, তার জন্মেরও বারো চোদ্দো বছর আগে ধূলিহর ছেড়ে চলে এল তারা বসিরহাট আমতলি গ্রামে। সেখেনে ঠাকুর্দা একটা ধূলিহর গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন বাকি জীবন ধরে। বাড়ি পুকুর, গাছ গাছালি...। ওপারের লোককে ডাকলেন আমতলিতে জমি কিনে, জমি দখল করে থাক, সব লোক চলে এলে এ গাঁয়ের নাম 'ধূলিহর' করে দেওয়া যাবে না হয়। অন্তত ধূলিহর পল্লী তো হবে। ধন্য আশা কুহকিনী। আমতলিতে ধূলিহর-এর লোক কেউ এল না। আসেনি কি? এসেছে দেখেছে ফিরে গেছে কলকাতার দিকে। ধূলিহর ছেড়ে আবার ধূলিহর গাঁয়ে কেউ ফেরে? তারা ওপার থেকে এপারে এসে কলকাতার দিকে ছুটল। কলকাতার যত কাছে থাকা যায়, দমদম বিরাটি দুর্গানগর বারাসত, মধ্যমগ্রামে গিয়ে বসত করল। বিজন শুনেছে যদি বাবা জেদ ছাড়তেন, তখন যদি ওখানে না গিয়ে এদিকে দু-চার

কাঠা করে জমি কিনে বাড়ি করে থাকা হত, সব সুবিধেই হতো, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় তো আসতে হল, কিন্তু ভাড়াটে ফ্ল্যাটে। আমতলি গ্রামে পড়ে থাকল সব যেমন পড়ে থেকেছিল ধূলিহর-এ। আমতলি থেকেও যেন তারা বিতাড়িত হয়েছে, যেমন হয়েছিল ধূলিহর থেকে। ভাল লাগছে না এসব ভাবতে। বিজন বলল, যাই।

এই রোদ্দুরে কোথায় যাবে? কবিতা জিজ্ঞেস করল।

রোদ পড়লে যাব বলছ?

তখন তো যেতে যেতে সন্ধে, অতখানি পথ অন্ধকারে হাঁটতে হবে।

ব্যাগে তো টর্চ নিয়েছি।

টর্চ কি তোমাকে খারাপ লোকের হাত থেকে বাঁচাবে? জগৎপুর মোটেই ভাল জায়গা নয়।

খারাপ হল কোথায়?

হয়নি, তোমার বাড়ি করার সময় তিন হাজার ইট, দশবস্তা সিমেন্ট ডাকাতি করে নিয়ে যায়নি?

সে তো দূরের লোক।

দূরের কী কাছের বুঝছ কী করে, ওই গৌড়েশ্বর করিয়েছিল কি না বলতে পার?

না না, পুলিশ তাহলে বলত।

কবিতা মাথা নাড়তে লাগল। কবিতা একদম সহ্য করতে পারে না গৌড়েশ্বরকে। বলে, ভীষণ পাজি, তোমার থেকে টাকা নেয় তো?

কই না তো।

তোমার জানালা দরজা রং করাতে কত মেরেছিল জান না? হ্যাঁ, প্রায় তিন ডবল মানে তিনগুণ। পরে বিজন খোঁজ নিয়ে জেনেছিল রঙের দামটাও পর্যন্ত অনেক বেশি বেশি করে ধরেছিল। বিজন বলল, যাক গে, আমি কখন ধূলিহর জগৎপুর যাই বলত?

সে তুমি বুঝবে।

কতদিন বাড়িটাকে দেখিনি।

আহারে, এই তো সেদিন গেলে, কতদিন প্রেমিকার মুখ দ্যাখেনি খোকা, ফিরে এসে আমার কানে কানে ওর রূপ বর্ণনা করবে, পারি না বাবা, কতদিন তুমি—যাও তো যাও, তোমার ধূলিহরে গিয়ে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে শুয়ে থাক গিয়ে।

যদি ভোরবেলায় যাই? বিজন একটা সময় শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করল বটে।

কবিতা বলল, যেতে যেতে রোদ উঠে যাবে, ওদিকে রোদ খুব ধারাল, তাপ বেশি।

ওদিকে তাপ বেশি তা কবিতা জেনেছে কোথা থেকে তা শুনতে যাওয়া অনর্থক। জলাভূমি, মাছের মস্ত ভেড়ির জল ছুঁয়ে যে বাতাস ঢোকে জগৎপুরে, তার ধূলিহর বাড়িতে তা কী ঠান্ডা! জেনেও নিজের অপছন্দের নতুন নতুন কারণ সাজাচ্ছে কবিতা। বিজন মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, তাহলে যাব কখন?

কবিতা হেসে বলল, পরের দিন যেও।

শিব্রামীয় ভাষায় উত্তর পেয়ে বিজন বলল, পরের দিন তোমাকে নিয়ে যাব কবিতা, চল না আমরা ধূলিহরে পাকাপাকি ভাবে শিফট করে যাই।

তারপর?

ওখেনে গিয়ে সংসার করব, ধান জমির কথা বলে রেখেছি গৌড়াকে, ভাগ চাষী দিয়ে চাষ করাব, বাড়ির পিছনে ধানের গোলা রাখব, ধান ঝাড়া হবে।

তোমার পাঁচ কাঠায় এসব হবে।

হবে, গৌড়া বলেছে হয়ে যাবে।

আর কী বলেছে?

ওই জমিতে শব্জি চাষি হবে, উচ্ছে বেগুন পটল মুলো।

কবিতার দু'চোখ বিস্ফারিত, জিজ্ঞেস করল, তুমি কী সিরিয়াসলি বলছ, মানে চাষ করবে?

আমি করব কেন, চাষী দিয়ে করাব।

মধ্যস্বত্বভোগী না রায়ত।

রায়ত, মধ্যস্বত্ব নিত খাজনা, আমি নেব ফসল।

কবিতা বলল, তুমি পাগল হয়ে গেছ, জগৎপুরে যেতে হবে না।

বাহ্, আমার বাড়ি।

ওখেনে আমরা কেউ যাব না।

ধূলিহর-এ যাবে না?

না, না, না, শহর থেকে কেউ গ্রামে ফেরে না, আমি নাচ ছাড়তে পারব না।

বিজন জিজ্ঞেস করল, দোতলাটা পুরো তোমার জন্য করে দেব।

ফাঁকা ঘরে আমাকে একা নাচতে হবে, ওখেনে কেউ নাচ শিখবে? গ্রাম থেকে শহরে যায় লোকে, শহর থেকে গ্রামে যায়? চাষবাসে ফেরে? সে তো পেছন দিকে হাঁটা বিজনবাবু।

বিজন বলল, তা কেন, বাপ-ঠাকুর্দাকে স্মরণ করাও তো হতে পারে।

স্মরণ করতে পার, তাদের যুগে ফিরতে পার না।

বিজন হাঁ করে কবিতার ভীত মুখখানি দেখছে। কথাটা তো দামী। কবিতা যে এভাবে ভাবছে তা সে টেরও পায়নি। জগৎপুরে যেতে কেন ভয় পাচ্ছে তা এখন ধরতে পারছে বিজন। নাচ তো ওর প্রাণ!

দুই

বাড়ির বয়স ছ'মাস। ছ'মাসে তারা পরপর তিনদিন বাস করেছিল ধূলিহর-এ। তিন রাত্রি গৃহ প্রবেশে তাই নিয়ম। সেই তিন রাত্তিরের ভিতর কোনো পূর্ণিমা ছিল না, বরং প্রথম সন্ধ্যা, প্রথম রাত্রিটুকু ছিল গাঢ় অন্ধকারে ভরা। সেই তিনদিন-এ কবিতা খুব উৎসাহ ভরে সংসার করেছিল। সত্যনারায়ণ সিন্নি দিয়েছিল, লক্ষ্মীর পুজো করেছিল, বিজনকে পাঠিয়েছিল অনেকটা দূরে খাল ধারের গ্রাম পোলেনাইট-এ বাজার করতে। এলাকাটা মৎস্যজীবীতে ভরা। আসলে জেলে পাড়া। সল্টলেক পার হয়ে অনেকটা গিয়ে জগৎপুর। জগৎপুরের অনেক অনেক আগে সল্টলেক থেমে গিয়েছিল। বিজনকে জমির দালাল সুকেশ বলেছিল, দেখুন না বছর দুয়েকের ভিতর কী হয়, একেবারে বদলে গেল বলে, খালের ওপারে বড় টাউনশিপ, আর এদিকে মাইল তিনেক গিয়ে সল্টলেক, এ জায়গার দাম কত হবে ধারণাই করতে পারবেন না।

ধারণা করতে পারছে বিজন। জমি কেনার পর তো অনেকদিন কেটে গেল। বাসটাও ঢোকেনি। একটি অটোরিকশাও চালু হয়নি। এমন কী তিন চাকার প্যাডেল করা রিকশাও নয়। কী অদ্ভুত, জায়গাটা যেমন ছিল তেমন আছে। যানবাহন নেই, নেই তো নেই। গৌড়েশ্বর বলে, যানবাহন হলে চুরি ডাকাতি বাড়বে দাদা, নেই তো বেঁচে গেছি।

আমি যে আসতে পারছি না গৌড়াবাবু।

আসবেন আসবেন, আসার দিন কি ফুরিয়ে যাচ্ছে?

আহা খরচ করে বাড়ি করলাম, লোন শোধ করছি।

গৌড়েশ্বর বলেছে, লোন শোধ হয়ে যাবে, বাকি থাকবে নাকি?

ফালতু ইনভেস্টমেন্ট হল, ভাড়া দেব।

খবদ্দার দাদা, বাইরের লোক ঢোকালে আর বেরোতে চাইবে না। কথাটা তো সত্যি। বিজনদের এই যে ছ'ফ্ল্যাটের বাড়ির ছয় বাসিন্দা তো বংশপরম্পরায় রয়েছে এখেনে। ভাড়া বেড়ে বেড়ে শ'পাঁচ-বড় বড় তিনখানি ঘর, বড় বড় জানালা, চারজনের দখিনা হাওয়া চারজনের উত্তুরে হাওয়া, চব্বিশ ঘন্টা জল একতলার দুই ফ্ল্যাটে, ওপরের গুলিতেও তা ছিল, ইদানীং পাশের বাড়ির

বাসিন্দা, প্রতিবেশী বাড়িওয়ালা গিন্নি পাম্প চালাতে গড়িমসি করে ওপরের চার ফ্ল্যাটকে গরমের সময় খুব ভোগান। জল বন্ধ করে, পাম্প না চালিয়ে অতিষ্ঠ করে ওদের যদি তুলে দেওয়া যায়। কে ওঠে! কলকাতা থেকেই তাহলে যে উঠে যেতে হবে। এতকাল কলকাতার হাওয়া জল রোদ, ধুলো ময়লা, শীত কুয়াশা গায়ে মেখে সিজন্‌ড হয়ে এখন কি ফেরা যায় কদমগাছি বামুনগাছি জগৎপুর কাশীনাথপুর-এ? কেউ কোনোদিন গিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাস-এ। নগর কখনো গ্রাম হয়েছে? গ্রামই তো বদলে গেছে নগরে। মানুষ কি কৃষিকাজ ছেড়ে শিল্পের শ্রমিক হয়ে আবার ফিরতে পারে কৃষিকাজ-এ? চারদিক তো দিনরাত্রি সরগরম হয়ে আছে কৃষি না শিল্প, শিল্পই আমাদের ভবিষ্যৎ, নগরায়ন-ই শিল্পের আর এক মুখ, নগর গড়, নগর বসাও। এই ক'দিন আগে নামী এক লেখক লিখলেন রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ আর্তির কথা দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর—ফিরে কি পেলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অরণ্য? সভ্যতা কি পিছনে ফেরে? এত সবের ভিতরে নিঃশব্দে, গোপনে বিজনকুমার বসু মশায় তাঁর মধ্যবয়সে গ্রামে ফেরার সব আয়োজন করে ফেলেছেন। তা ছাড়া তাঁর উপায় কী? কলকাতা আর তার আশপাশে জমি হল সোনা। জমি আর থাকছে না। এরপর ঝুড়ি করে কলকাতার মাটি বেচা হবে। তা কিনতেও আগরওয়াল মুরুটিয়া, নেওটিয়ারা ছুটে আসবে। কলকাতা থেকে রাস্তা যেদিকে যাক, সেই রাস্তার দু'ধারের জমি ও সব বেচাকেনা প্রায় শেষে। যদি কিছু পড়ে থাকে তো তার ব্যবস্থাও হয়ে যাচ্ছে। যখন আছে নিয়ে নিন, হয় নগর হোক। যে ভাবে হয় হোক। জমিজমার শেষ বন্দোবস্তের যুগ এখন। এরপর আর এ জগতের কোথাও কোনো ক্রয়যোগ্য বিক্রয় যোগ্য জমি থাকবে না। আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। এসবের ভিতরে বিজন পাঁচ কাঠা কিনে ধূলিহর-এর পত্তন ঘটাল জগৎপুরে। সেই ধূলিহর-এ গৌড়েশ্বরকে পেল। লোকটা এসে বলল, আমি আছি যখন, কোনো ভয় নেই দাদা, বাড়ি আপনার ভালো থাকবে, বাড়ি আপনার থেকে যাবে, নির্ভয়ে যান বউদি।

তিনদিন তিনরাত্রি কাটিয়ে ফেরার সময় গৌড়েশ্বর বলেছিল, যখন মনে হয় আসবেন, এলে আমাদের ভাল লাগবে। কিচেনে তালা, টয়লেটে তালা, পিছনের খিড়কি দুয়ারের গ্রিলে তালা, দুটি ঘরে তালা, সদর দরজায় তালা, তারপর গ্রিল গেটে তালা দিয়ে চাবির গোছা যখন কবিতা তার ব্যাগে ভরেছিল গৌড়েশ্বর বলেছিল, থাকল কী যে এত তালা লাগালেন বউদি?

কেন খাট থাকল, আলনা থাকল, চেয়ার থাকল।

থাকল থাকল, আমরা কি নেই?

লোকটা গোলগাল। বেশ মিশমিশে কালো। মাথার চুল সব ঝরিয়ে

ফেলেছে, যে কটি আছে রুপোলি। মাথায় পাঁচফুট তিন বড় জোর চার। লুঙ্গি আর হাফ হাতা পাঞ্জাবি পরে থাকে সব সময়। চোখ দুটি সব সময় চঞ্চল। কবিতা কথা বলতে চাইছিল না। গৌড়েশ্বরের কথায় জবাবই দিচ্ছিল না। লোকটার গায়ে পড়া ভাব তার পছন্দ হয়নি স্পষ্ট। না হোক, কিন্তু লোকটাই তো গ্যাস ওভেন গ্যাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছে তিন দিনের জন্য। ভর্তি সিলিন্ডারের দাম দিয়েছে বিজন, খরচ হয়েছে তো একটুখানি। সিলিন্ডারটি শেষে নিজের ঘরে টেনেছে লোকটা। চাল ডাল যা বেশি হল, বলল, নিয়ে যাবেন কেন, নিয়ে যেতে নেই, শাস্ত্রে তা বলে না, নতুন বাড়ি তো সব উপচে পড়ুক, বরং আমাকে দিয়ে যান।

সেই তিনদিন তিনরাত্রির কথা মনে পড়ে বিজনের। কত রাত তখন! ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সারাদিন মাঠেঘাটে টইটই করে। তাদের জন্ম থেকে তো তারা এমন দ্যাখেনি যে গাছে খেজুর হয়ে আছে থোকা থোকা। কী রকম চুন হলুদের রঙ তার আগে। মাঠ গেছে দূর কত দূর। এই মাঠের ভিতরে নাকি এককালে বিদ্যাধরী নদীর গতিপথ ছিল। গৌড়েশ্বরের নাতির সঙ্গে দুজনে হেঁটেছিল। রাতে বিজন তার বউকে বলছিল, এখানে এলে প্রকৃতির ভিতরে বেড়ে উঠবে আমাদের ওরা, অন্যরকম ভাবে গড়ে তুলব।

কী রকম ভাবে?

যা শিখবে সব প্রকৃতি থেকে।

বোঝা গেল, ইস্কুল পাঠশালা?

আচ্ছা লালনকে এখানকার স্কুলে যদি ভর্তি করে দিই।

কবিতা বলেছিল, মাথা খারাপ, তোমার ছেলে বুনো হয়ে উঠবে।

বুনো! বিজন বলেছিল, হোক না বুনো।

বসে বসে তাড়ি খাবে গরমের দুপুরে।

কে খাচ্ছিল?

কেন তোমার ওই গৌড়েশ্বর আর একটা লোক।

হে হে করে হেসেছিল বিজন, দশাসই মোষের মতো তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

ও তো দুধকুমার।

সে কে?

ও আমাকে সাদা বালি সাপ্লাই করেছিল, ওই যে মাঠের কোণে টালির চাল, ওটা ওর বাড়ি।

তুমি ওকে ভাল করে চেন?

কেন চিনব না?

ওফ! কী পরিবেশে নিয়ে এলে!

বিজন তখন কবিতাকে একটু বেড় দিয়ে ধরেছিল, কেন কবিতারানি, ভাল লাগছে না ধূলিহর?

রাখো দেখি তোমার ধূলিহর, তুমি তো দ্যাখোনি, তোমার জন্মও এপারে, তাহলে এত ধূলিহর, ধূলিহর করো কেন?

মা বাবা, ঠাকুদ্দা ঠাম্মা যে চোখের জল ফেলতে ফেলতে গেছেন।

ছিল তাঁদের গ্রাম, তাই গেছেন ওইভাবে।

বউরানি এই যে ওপারের ধূলিহর এপারে বসিয়ে দিলাম, এতে তাঁদের চোখের জল মুছলাম।

কবিতা বলেছিল, ওসব তোমার আবেগ, সত্যি কি তাই হল?

হল, আমি তাঁদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

কোথায়?

কেন এই ধূলিহরে।

কী সব বল, তাঁরা ওপরে গেছেন, তাঁদের নিয়ে টানটানি করো কেন?

তাঁরা তো ছিলেন একসময়।

ছিলেন তো ছিলেন, এখন নেই, মিটে গেল।

বিজন বলেছিল, তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলাম আমি।

দ্যাখো এসব কথা বলো না, তুমি এ বাড়ির নাম বদলাবে।

কেন, এতো ধূলিহর।

মোটেই না, ধূলিহর তোমাকে খেয়েছে, যাঁরা নেই তাঁদের আবার ডাকাডাকি কর কেন, এতে সংসারের ভাল হয় না।

চুপ করে গিয়েছিল বিজন। সে অতি সাধারণ মানুষ। জীবনে চাকরি বিবাহ, সন্তান ব্যতীত তার আর কিছু ছিল না। তারপর একদিন একটা লোকের পাল্লায় পড়ে তার মোটর সাইকেলের পিছনের চেপে জগৎপুর চলে এল। সে বলেছিল, বাড়ি একটা করতে হয় স্যার, ফ্ল্যাটে থাকেন তাই বসতবাটির সুখ বুঝবেন না, আপনার রিলেটিভ সবাই তো বাড়ি করেছে, আপনি করবেন না?

সে ছিল সুকেশ আগরওয়াল। তার ছিল একটি এসটিডি বুথ। সঙ্গে ফোটোকপিয়ার মেসিন। যখন একা ছিল বেশ ছিল। দেখতে দেখতে পাড়ায় আর পাঁচটি দোকান হয়ে যেতে আর মোবাইল ফোনের প্রাবল্য বেড়ে যাওয়ায় দোকান আর চলে না, তখন আরম্ভ করল জমির দালালি। ফ্ল্যাটের দালালি, তার পাল্লায় পড়ে জগৎপুরে এসেছিল বিজন এক শীতের সকালে। এসে মুগ্ধ হয়েছিল। এখন সুকেশ ওসব ছেড়ে দিয়ে অন লাইন লটারির ব্যবসা করছে।

তাকে একদিন ধরেছিল, খেলবেন নাকি দাদা, মজা আছে খুব, আবার লাভও হবে।

কবিতা বলেছিল, ওর ধারকাছে যাবে না, লোকটা তোমাকে ফাঁসিয়েছে।

তা কেন, এ জায়গার খোঁজ কী করে পেতাম তা হলে?

না পেলেই বা কী হতো।

দ্যাখো কবিতা, আমাদের আমতলির বাড়িটা তো ধূলিহরের কথা ভেবেই করা হয়েছিল, কপালে থাকল না, এটা তাই হল।

কবিতা গুম মেরে গিয়েছিল। সে ন'পাহাড়ি থেকে বিয়ের পর কলকাতায়। মাঝে এম. এ পড়তে বর্ধমান শহরের ছিল। গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। অরণ্য পাহাড় থেকে নগরের খাঁচায় ঢুকেছে সে। সোনার খাঁচা সোনার দাঁড়, তাতে মুগ্ধ হয়েছে। একবার শহরের স্বাদ পেলে আর কি সে ফেরে গ্রামে, ন'পাহাড়িতে। গ্রাম তো উজাড় হয়ে যাচ্ছে। হাতে পায়ে জোর হলে, ডানায় জোর হলে, পথটা চিনতে পারলে কলকাতার দিকে ছুটছে সবাই। ন'পাহাড়িতে কলকাতা থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার বাস দাঁড়াত। সেই সব বাসের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কতজন যে উধাও হয়ে গেছে ফিরতি বাসে। বিজন বোঝাচ্ছিল গাছগাছালি মাঠ প্রান্তর নদীর কাছে থাকলে মানুষের জীবন সুখের হয়। ইট কাঠ পাথরের ভিতর প্রাণ শুকিয়ে মরে যায়।

তোমার জগৎপুরের সবাই সুখে আছে?

আছেই তো।

তা আছে, সকালে যা তাড়ি খাওয়ার ধুম দেখলাম, বাড়ি হয়েছে হয়েছে, এ জায়গা ডেভলপ না করলে আসা হবে না, তোমরা ওই আমতলি থেকে এলে কেন?

বাবা চাকরি করেন কলকাতায়, দাদারা কলকাতার কলেজে।

জগৎপুরে কলেজ আছে, চাকরি আছে?

এতো কলকাতার কাছেই, কলকাতাই বলতে পার।

বললেই হবে বিজনবাবু, এ হল সেই জোব চার্নকের কলকাতার এক টুকরো, কারোর চোখ পড়েনি, নিজের মতো করে পড়ে আছে, মাঝে তিনশোটা বছর চলে গেছে, এখানে থাকব কী করে?

পরদিন সকালে দুধকুমার এসেছিল। ছ ফুট লম্বা। ভীমের মতো চেহারা। কালো পাঁকের মতো চকচকে গায়ের রং। গা থেকে বুনো গন্ধ বেরোচ্ছে। লুঙ্গি আধভাঁজ করে পরা। গায়ে একটা হাওয়াই শার্ট, তার সবকটি বোতামই খোলা। বুক থলথল করছে অতিরিক্ত মাংসে। চোখগুলি রাঙা। মাথায় তেল চুপচুপে চুল, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পেটে একটু তাড়ি ছিলই। হাঁক

মেরেছিল বাড়ির সামনে এসে, বিজনদা, ও দা'বাবু, কোথায়, আমি দুধে।

বিজন বেরিয়ে এসে বিব্রত হয়েছিল, কী ব্যাপার দুধকুমার?

দুধকুমার হেসেছিল, দা'বাবু, তুমি আমার দাদাবাবু, কিছু পাব না?

কী পাবে?

এতবড় বাড়িখান উঠল, সাপলাই দিলাম তো শুধু ভিত ভরাটের সাদা বালি, ইট, লোহা, সিমেন্ট কত কী লাগল, কিছুই দিলাম না।

তোমার ওসব আছে?

সাপলাই দিয়ে দিতাম, যাকগে নাওনি যখন নাওনি, জগৎপুরে এলে, এই ধূলিহর না কী করলে বাড়ির নাম, আচ্ছা এর মানে কী?

ও তুমি বুঝবে না।

দুধকুমার সব বোঝে দা'বাবু, তুমি গৌড়ারে ঢেলে দেচ্ছো, আমি কি বানের জলে ভেসে এয়েছি, ও তোমার পেয়ারের হয়েছে।

কী সব বলছ?

রাগ করলি হবে, আমারে তাড়ি খাওয়ার ট্যাকাটাও তো দিতি পার।

কেন, এসব কথা বোলো না, চলে যাও।

বাহ্! কাল পুজো হল, আমারে তো বলনি, অথচ আমি সাদা বালি দিতে মেঝে ঢালাই হল, না হলি মেঝে তুমার ফেটে যেত।

মাতাল বক বক করতে লাগল। বলতে লাগল, বাড়িখানা হয়ে কতবড় ছায়া হয়েছে বলো রাস্তাটির বাঁকে, ও ছায়া তো আগে ছিল না।

না ছিল না।

সেখানে ছায়া পড়ছে, রাস্তার গা'র জমি, ও জমি তো আমার শরিকি, দু আনা তের গণ্ডা অংশ আছে, যে পাকাপাকি ছায়া করে দিলে বিকেলে, এর কী বিহিত হবে না?

তখন বেলা দুপুর। জানালা দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল কবিতা আর লালন আর পাখি। দুলে দুলে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল দুধকুমার, টাকা না নিয়ে সরবে না।

তিন

কতদিন আগে ঘটে গেছে এসব! দুধকুমার বিশটা টাকা নিয়ে খুশি হয়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু যাওয়ার সময় ওই কথাটিই আবার স্মরণ করিয়ে গিয়েছিল, বাড়ির ছায়াটা সমস্ত কালের মতো ফেললে দাদাবাবু, এর কী হবে?

কী হবে সত্যি? ঘরে ঢুকতে কবিতা বলেছিল, কাদের ভিতর এসে পড়েছ

বুঝছ? ছায়া দিয়ে কতবার টাকা আদায় করবে ও, ছাদ ঢালাই-এর দিনে নেয়নি?

হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল বিজন, বলেছিল, মাতাল কিন্তু খারাপ না ওর কথাগুলো।

খারাপ কে বলেছে, কিন্তু ওই ছায়ার গুনাগার দিতে হবে তোমাকে সমস্তজীবন।

তার মানে?

ছায়া ফেলার খেসারত, ওই দ্যাখো সেই ছায়ার ভিতর কেমন শুয়ে আছে লোকটা! তাকে বিজন দেখেছিল তার বাড়ির গায়ে বাড়িরই ছায়ায় ঢেকে যাওয়া ঘাস জমিতে চিত হয়ে শুয়ে আছে দুধকুমার। তার মস্ত শরীর ঘন শ্বাস প্রশ্বাসে কাঁপছে। ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে ঘরে বসেও। আহা কী সুখে ঘুমায় দুধকুমার! বৈশাখের বেলা। ছায়াটির পর থেকেই রোদ ঝিমঝিম করছে প্রকৃতি। জগৎপুরের মাঠ প্রান্ত, সেই খালপাড় পর্যন্ত, সেই বিদ্যাধরীর সোঁতা পর্যন্ত। বিজন বিড় বিড় করে বলেছিল, এরা

না, না, তাড়িজীবী।

তালের রসই তো তাড়ি।

ওসব জানি না, এখানে ভদ্রলোকে থাকতে পারো না।

পরের দুদিনই দুধকুমার এসেছে। সকাল বেলায় এসে হেঁকেছে, দা'বাবু, ও বিজন দাদাবাবু, বেলা করে ওঠো নাকি?

কী হল? চায়ের কাপ নিয়ে বিজন এক ফালি বারান্দায়।

দুধকুমার বলেছে, ট্যাকা দাও, বাজার নিয়ে আসি।

বিজন বলেছে, লাগবে না দুধকুমার, আমার ভগ্নীপতি বাজার নিয়ে আসবে।

এই তো মিথ্যে কথাটি বললে দা'বাবু, এখেনে এত ভাল বাজার থাকতে ভগ্নীপতির বাজার খেতি হবে?

আহা আনবে তো।

একেবারে পাকা হিসেব দিয়ে দেব, মারব না।

নানা না তা বলছি না, দরকার নেই।

হতভম্ব হয়ে লোকটা দাঁড়িয়েছিল। বাড়িটাকে ভাল করে দেখেছিল। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, মেঝে ফাটেনি তো?

না, না তা হবে কেন?

কত লোকের বাড়ির মেঝে ফেটে যায় আড়াআড়ি, লম্বালম্বি।

বিজন বলেছিল, আমারটা হয়নি।

হবে না, তুমি লোক ভাল দাদাবাবু, আরে দ্যাখো না, ওই ওদিকে জোত ভীম, জোতভীমের নিকুঞ্জ হালদার দালান করল, ভাইদের ফাঁকি দিয়ে সব জমি নিজের নামে লিখে নিয়েছিল, পাকা জালিয়াত—বলতে বলতে দুধকুমার বারান্দায় উঠে পড়ে পা ছড়িয়ে বসে গিয়েছিল, বলছি, সব জানবে, আমার চা হবে না? আমারে তুমি চেন না দা'বাবু, আমারে বাদ দে একা চা খাওয়া তুমারে মানায় না।

আসছে চা, তা কী হল সেই লোকটার?

জালিয়াত, ঠগ, কী না সে, অতবড় দালান হাঁকাল, রাজপেসাদ বলতি পার, মেঝেতে পাথর পর্যন্ত বসায়ে দিল, আমারে আমার প্রাপ্য দিল না।

তুমি কী দিয়েছিলে?

কিছু না দা'বাবু, সাদা বালিটিও না।

তবে তোমার প্রাপ্য হবে কেন?

কেন হবে না বলো, কোথাও কিছু হলে সবারই তো কিছু হয়।

বোঝা গেল না।

বোঝাচ্ছি। বলে লালনের হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়েছে দুধকুমার, বলেছে, সোন্দর বেটাবেটি তবে দুটো কেন, আরো হোক।

থাক, তোমার কথা বলো।

আমার আবার কথা কী, ফড়িং মেরে পেট চলে, দুটো রেখ না, ছেলে-পুলে বেশি না হলি দালান কোঠার মানে কী! জমজম করবে কীসে?

তোমার ক'টি?

ভগবানের ইচ্ছা এখনও একটাও না, বউও না।

তার মানে কী হল?

আগে ছিল, এখন নাই।

কী হল?

হবে আবার কী, আমার বউ আমারে ত্যাগ দিয়ে চলে গেছে দা'বাবু, এখন সেই দুঃখে তাড়ি খেয়ে থাকি।

অদ্ভুত এক জগতে এসে পড়েছে তা টের পাচ্ছিল বিজন। ভয় পাচ্ছিল দুধকুমারের গমগমে কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে তার গৃহিণী। দুধকুমার তার দুঃখ বৃত্তান্ত বলছিল, তার স্যাঙাৎ তার সব্বোনাশ করেছে। ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়েছে সে বেটা ভগবান মণ্ডল। তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সল্টলেকে। বালির কারবার যখন একটু আধটু ধরেছে সে ভগবান তাকে সাহায্য করেছিল। সল্টলেকের সব তো বালিতে ভরাট করা। কোদাল মারলেই বালি। ভগবান মণ্ডলের আসল বাড়ি ভোজেরহাট খোদহাটি। খোদহাটি জানা আছে

দা'বাবুর? জানা নেই। থাকবেই বা কেন? ভগবান মণ্ডলের সঙ্গে আলাপ না হলে সে বড় একটা খোদহাটির খোঁজ রাখত! তখন তার নতুন বিয়ে। সল্টলেকে বাবুরা যে বাড়ি তুলেছে তার ভিত ভরাটের সাদা বালি সল্টলেকের বালির মাঠ থেকে তুলে কারবার ফেঁদেছিল ভগবান। থানা পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল। কারবারে তার সঙ্গী হল দুধকুমার। সেই হল কাল। তাকে একদিন সাইকেলের পিছনে চাপিয়ে জগৎপুরে নিয়ে এল।

থাক, আর বলতে হবে না দুধকুমার।

না, না শোনো সবটা, জানা দরকার তোমারও, দুধকুমার যে এখন কোন দুঃখে তাড়ি খেয়ে মরে তা না জানলে তুমি দুধকুমাররে ভুল ভাববা।

চলো তাহলে বাইরে বেরোই।

আমার ঘরে চলো।

দুধকুমারকে বসিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল বিজন। কবিতা আর ছেলে মেয়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। বিজন গায়ে পাঞ্জাবি তুলতে কবিতা চাপা গলায় বলেছিল, রোদে ঘুরো না, আর ওসব না।

না, না, আসলে এদের একটু হাতে রাখতে হয়, বাড়িটা তো থাকবে এখন।

এমন করলে যে থাকার উপায় নেই।

উপায় হবে, ঠিক হবে। বলতে বলতে বিজন বেরিয়ে পড়েছিল, তার সঙ্গে মস্ত দেহ নিয়ে মেদিনী কাঁপাতে কাঁপাতে হাঁটছিল দুধকুমার। তখন গৌড়েশ্বর ফিরছিল খাল পাড় থেকে। তাদের এক সঙ্গে দেখে সামনে এসে পথ আটকেছিল, বলেছিল, দুধের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছেন দাদা?

এই ওর বাড়ি।

আপনার কি চলে নাকি?

না না এমনি।

গৌড়েশ্বর বলেছিল, দুধে দাদারে কিন্তু খাওয়াবিনে।

না না আমি খাই দুঃখে, উনি খাবেন কেন?

শুকনো প্রায় নিষ্ফলা শূন্য মাঠের ভিতরে গনগনে রোদ মাথায় হেঁটেছিল বিজন। গৌড়েশ্বর বলল, আমি আসছি তা হলে বাড়ি ঘুরে।

না তুমি আসবো না কাকা।

কেন আসব না?

না আসবা না, ভগবানরে মদত দিয়েছিল তুমি।

ওরে হারামি, নিজের বউরে নিজে রাখতে পারলি নে, আর দোষ হল আমার, যা না, তোর বউরে আনতে যা না, নিয়ে আয়।

যাব তো। বলে দুধকুমার হন হন করে হাঁটে। বড় মায়া লাগে তখন

বিজনের। সে তো বুঝতেই পারছে। কিন্তু সবটা নয়। কৌতূহল হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে এই জগৎপুরের কত কালের বাসিন্দা! কত যুগের। এরকম তো সব জায়গায় ঘটে। তবে কলকাতায় ঘটলে তা চাপা থাকে, লোকে ভুলেও যায়। কিন্তু জগৎপুরে লোকে ভোলে না কিছুই। কত পুরুষের কথা মনে রাখে সবাই। মনে হয় পূর্বজন্মের স্মৃতিও ধরে রাখে যেন। দুধকুমার তার ইট আর মাটি দিয়ে গাঁথা দালানের বারান্দায় মাদুর পেতে বসতে দেয় বিজনকে। বলে, কী করব দা'বাবু, তুমি তো আমারে, দ্যাখো না, আমার বুনও আমারে দেখল না।

তোমার বোন কোথায়?

কেনে তুমার বউ! বলে হা হা করে হাসে দুধকুমার, বলে ইটগুলো ওই সললেক থেকে আনা, টালিও গ্যাঁড়ানো মাল, পুরো ভিটেটা ওইরকম, এরকম ঘরে লক্ষ্মী কি থাকে, থাকে না, তুমি তো খাবা না?

না।

ঠিক আছে, তবে খেলি শরীর ঠান্ডা হতো।

সে দেখা যাবেখন। বলে বিজন সিগারেট ধরিয়েছিল। মদের নেশা তার নেই। কালেভদ্রে হুইস্কি চলে। দেশি মদ এ জীবনে একবার ছুঁয়েছিল।

ঝাড়গ্রামে গিয়ে একবার মহুয়া খেয়েছিল খুব। পরে বমি করে ভাসায়। আসলে সে একেবারে পরিশীলিত বাবু। সে নিজেই ভাবতে পারো না কী করে জগৎপুরে একখানা ধূলিহর বসিয়ে দিল। ভর্তি করে পর পর দু'গেলাস নিয়ে হাতের তালুতে রাখা নুন আর কুচি আদা জিভে লাগিয়ে ছিল দুধকুমার, তারপরই হু হু করে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল, বলেছিল, দা'বাবু তুমি বিশ্বাস করবা না আমার এত রাগ যে রাগের চোটে আমি নিকুঞ্জ হালদারের পাথর বসানো মেঝে ফাটাই দিলাম।

কী রকম?

আরে তুমি দালান হাঁকাচ্ছো, আমি বললাম এক নম্বর ইট দেব, নোনা হবে না, দাগী হবে না, ভাল পোড় খাওয়া সরেস, শালা হাঁকিয়ে দিল।

দিতে পারে তার যদি পছন্দ না হয়।

বললাম তাহলে পাণ্ডুয়ার বালি এনে দেই।

হল না তো?

না হয়নি, পাকুড়ের 'টোনচিপ' দেব বললাম, তাও না, শেষে সাদা বালি, তাও না, তখন সেখেনে দাঁড়ায়ে বলে এলাম তোমার মেঝে ফেটে যাবে, হল তাই।

হল সত্যি?

হ্যাঁ গো, পাথর ফেটে গেল, দেওয়ালেও চিড়।

ইস! অতখরচ করে করল।

সব তো অধম্মের টাকা, কিন্তু দ্যাখো তুমি তো মোজেক মারনি, পাথরও বসাওনি, সেরেফ লাল মেঝে কালো বডার, কীর'ম হয়েছে বল দাদাবাবু।

ভাল।

ভাল তো হবে, বলছি তুমারে ডেকে আনলাম কেন বল দেখি।

কেন?

তুমি আমার দাদাবাবু, তুমার বউ আমার বুন, আমার বউরে ভগবান বশীকরণ করে নেয় গেল, আমি তারে ফিরাব।

আনো ফিরিয়ে আনো।

সে আসতি চায়, অথচ পারে না, আসে না।

না আসে তো কী করে ফেরাবে?

দুধকুমার থমথমে মুখে বসে থাকল। ভারী মুখখানি ড্যাম ড্যাম করছে। খালি বুক ভরে গেছে ঘামের জলে। জামাটি ইতিমধ্যেই খুলে কোলের উপর রেখেছে সে। জামার পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাল, ধোঁয়া ছেড়ে রোদ ঝাঁ ঝাঁ মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকল। একটু বাদে বলল, কিন্তু আমি চাঁদমণিরে ফেরাব।

ঠিক আছে ফিরিয়ো।

তুমার সাহায্য লাগবে।

আমি! অবাক হয়েছিল বিজন, আমি কী করব?

যা করা সে আমি বলব পরে, আচ্ছা দাদাবাবু তুমি কি তুমারে বন্ধক দেছ গৌড়ার কাছে, হারামি আমার কাকা সম্বন্ধে, কিন্তু ওরে আমার জুতো মারতি ইচ্ছে হয়।

কেন হয়েছেটা কী?

বলছে, দাদারে আমি যদি বলি তবে দাদা তোরে হেলেপ করতি পারে, কিন্তু তার জন্যি খরচ লাগবে, তুমি কি খরচ নেবা?

বিজন বিব্রত হয়ে উঠল। কী বলবে বুঝতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, না এলেই ঠিক হতো। তে রাত্তির কাটাতে এসে এ কী বিপদ! জগৎপুরে কোন জগতে এসে পড়ল সে? উত্তর না পেয়ে দুধকুমার বলল, তোমারে দেখে তো তেমন মনে হয় না।

কী মনে হয়?

আরে দা'বাবু, সাদা বালির দাম হয়েছিল এক এক লরি পাঁচশো টাকা, আমি নিলাম সাতশো টাকা করে, তুমি তো কোনো কথা জিজ্ঞেস কর নি।

হেসে ফেলেছে বিজন, বলেছে, দাম জানতাম না।

তা কী করে হয়, তোমারে গৌড়ই তো বলেছিল সাড়ে ছ'শো করে এনে দেবে।

থাক, তুমি না হয় পঞ্চাশ বেশি নিলে, তিন লরিতে দেড়শো টাকা।

তবে! তুমি তো লোক খারাপ না, কাকা বলেছে পাঁচশো টাকা আগাম নেবে, আর বউ ফিরে এলে আরো পাঁচশো দিতে হবে।

সে তো ওর ব্যাপার।

না গো দা'বাবু, তোমারে দিয়ে কাজটা করাবে, শালা কম হারামি। বলতে বলতে দুধকুমার আচমকা থেমে যায়। থমথমে হয়ে বসে থেকে আবার মুখ খোলে, বলে, চাঁদমণিরে যদি দেখতে তুমি দাদাবাবু, গৌড়া আমারে বলত ও আমার যুগ্যি না, মানে আমি ওর যুগ্যি না, বলত অমন বউ তুই পেলি কী করে, শালা এ বাড়িতে উঠতে পারত না।

থাক দুধকুমার, শুনে কী করব?

আমার কাছে ঝাড় খেল, একদিন বউরে কী যেন বলেও ছিল, সে আমারে বলে দিতে ঝাড় দিলাম, ওই মাঠের মধ্যে এমন বলা বললাম, ফের যদি আমার ভিটের দিকে আসে তো কেটে নেব—ও বেটাই ভগবান মণ্ডলরে দিয়ে কাজটা করিয়ে দিল, কী বলব দা'বাবু স্যাঙাতরে নে আলাম ভাল মনে করে, সন্ধেবেলায় তাড়ি নে বসলাম, চাঁদমণি মাছ ভেজে দিল, সেই হল কাল, সে শুধু আসতে চায়, আমি কি জানি চাঁদমণি কাত হয়ে গেছে পেত্থম দিনেই, কী করে হল বলো দেখি?

থাক দুধকুমার, আমাকে কী করতে হবে?

সব বলব, ওই গৌড়া আসছে, তুমি এটা জেনে রাখ চাঁদমণি খুব ভাল, কিছু বোঝে না, সব করেছে গৌড়া, না হলি ভগবানের সাধ্য কী চাঁদমণিরে আমার নেকট থেকে সরায়, আমারই ছিল চাঁদমণি, গৌড় কা' এসো, বসো, তুমার পেন্নাম করি গৌড়কা, তুমার মতো বুদ্ধি কার হয়, কার?

টিপ করে গৌড়েশ্বর মণ্ডলের পায়ে মাথা রাখল দুধকুমার।

চার

তো রাত্তির কাটিয়ে সাতখানা তালা লাগিয়ে ফিরতে ফিরতে কবিতা বলেছিল, তোমার দুধকুমারটা খারাপ না, ওসব লোকের কপালে দুঃখই থাকে।

শুনে মন ভাল হয়ে গিয়েছিল বিজনের। আসলে মানুষের মন! তিনদিন ধরে গৌড়েশ্বর এত করল, করার ভান করল, এত উপদেশ দিল, প্রশংসা

করল তবু কবিতার মন পেল না। আর দুধকুমার। সে যে ওই একটা কথা বলল, 'সমস্ত কালের জন্য ছায়াটা ফেলে দিল দা'বাবু, আমার কী হবে?' তাতেই কবিতার মন ভিজে গেল। কবিতা বলেছিল, তবে তুমি ওই বউ ফেরানোর ব্যাপারে মাথা গলিও না, গৌড়েশ্বর টাকা খেয়ে নেবে ঠিক।

হুঁ। বিজন দেখছিল ক্রমশ জগৎপুরে নিঃশেষ করে তাদের ট্যাক্সি কলকাতা শহরে প্রবেশ করছে। একটু একটু করে একুশ শতকের পৃথিবী ফুটে উঠছে। জগৎপুর যেন জোব চার্নকের আমলের। বিজন বুঝতে পারছিল কলকাতায় ফিরে কি আর দুধকুমারের কথা ভাল করে মনে থাকবে? লিখে রাখতে হবে ডায়েরিতে। তিন দিনে টের পেয়েছিল জগৎপুর একজন্ম, কলকাতা আর এক জন্ম। এক জন্মের কথা অন্য জন্ম মনে রাখে না। শুধু ডায়েরি ধরে রাখতে পারে। লাল কভারের ডায়েরি, নীল কভারের ডায়েরি। নীল কভারটি জগৎপুর। লাল কভারটি কলকাতা। এ ব্যবস্থা বিজনের নিজের মতো করে করা। কবিতা জানে না ভিতরের খবর। শুধু দেখেছে লাল নীল দুটি নোট বই। হয়ত কবিতার খাতা। হয়ত ধূলিহরের কথা লিখে রাখছে বিজন। ওসবে কবিতার মাথা ব্যথা নেই। তারও তো একখানি জগৎ আছে। ভরত নাট্যম। তাদের তিন রুমের ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরটি ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। দিনে ও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। সেখানে ঘুঙুর বেজে ওঠে রবিবার সকালে আর বুধবার সন্ধে। তার ভিতরে বিজন মাথা গলায় না। শুধু একদিন বলেছিল, ধূলিহরে এসব কী করে যে হবে কবিতা?

কবিতার মুখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, যাচ্ছি নাকি এখন?

না মানে যেতে তো হবে।

সে তখন দেখা যাবে।

কখন?

যখন যাবে।

বিজন বলেছিল, খোঁজ নেব?

কবিতা বিষণ্ণ মুখখানি তার দিক থেকে সরিয়ে নিয়েছিল, বলেছিল কী খোঁজ নেবে? কার কাছে, তোমার গৌড়েশ্বর?

না মানে ওদিকেও তো এসব হতে পারে।

কেন হবে না, হাজার দু হাজার বছর আগে হতো, এখন হবে না কেন বিজন, কিন্তু ওখানে তেমন ফ্যামিলি আছে?

জিজ্ঞেস করে দেখি।

জিজ্ঞেস কার কাছে করবে বিজন? সে ডায়েরিতে মানে নীল নোটবই-এ লিখে রাখল, জগৎপুরে কি ভরত নাট্যম সম্ভব? না লিখে রাখলে নির্ঘাত সব

ভুলে যাবে। দুধকুমারের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে গল্প করে ফিরে আসবে।

ইরফান আলি একদিন শুনে বলল, না সম্ভব না বিজনদা, বউদির অত কষ্ট করে শেখা জিনিসটা জগৎপুরে কোনো দাম পাবে না।

কিন্তু বাড়ি তো, আমাদের ধূলিহরে কি ওসব ছিল ইরফান?

ইরফান আচমকা রেগে গিয়েছিল, আপনি তো খুব স্বার্থপর বিজনদা।

বিজন হে হে করে হেসেছিল, না না, তা আমি বলছি না, তবে ভবিষ্যতে ওখানে হবে ঠিক, দেখো আমার ধূলিহরে ঘুঙুর বেজে উঠবে।

ইরফান আলি তার সঙ্গেই ওই জগৎপুরে তিন কাঠা জমি কিনেছিল। তার জমি বিজনের বাড়ির পশ্চিমে। সেখানে সকালে রোদ পড়ত এক সময়। এখন যতীনের ধূলিহর তার ছায়া ফেলে রাখে। ইরফানের বাড়ি বাগনান। জমিটা পছন্দ করেছিল সে যতীনের সঙ্গে গিয়ে। এখন কী করবে বুঝতে পারছে না। বিজন যদি এখন না বাস করতে যায়, সে বাড়ি আরম্ভ করবে কেন? এক সঙ্গে দু'জনে থাকা যেত। ইরফান বিজনের সহকর্মী।

ক'দিন বাদে ইরফান বলল, রেহানা বলছে বাড়িটা করা যেতে পারে, রেহানা নিজের বাড়ি চাইছে।

করো না, দুটো বাড়ি হলে আমরা মাঝে মধ্যেই গিয়ে পিকনিক করব।

না, বিজনদা, আমরা থাকার জন্যই যাব।

থাকবেই তো, বিজন বলল।

আমার তো স্কুটার আছে, অসুবিধে হবে মনে হয় না।

কিন্তু জগৎপুরে যে ভরত নাট্যম হয় না ইরফান।

ইরফান আলি বলল, হয় নাই তো, তবে আমরা গিয়ে করতে পারি, বউদিকে বলবেন আমার মেয়েকে শেখাব।

গণেশ বন্দনা করতে হবে, দশদিক বন্দনা করতে হবে।

ইরফান হেসে বলেছিল, করবে, এতো শিখতে বসা বিজনদা।

বিজন বাড়ি ফিরে বলেছিল, জগৎপুরে একটি স্টুডেন্ট পাওয়া গেছে কবিতা, রাজি?

চমকে উঠেছিল কবিতা, তারপর হেসে বলেছিল, গৌড়ের নাতনি?

না, না, ইরফানের মেয়ে।

সে তো কুঁড়ি এখন।

বড় তো হবে, আমরা কি এখনই যাচ্ছি, ইরফানের মেয়ে বড় হয়ে নাড়া বাঁধার উপযুক্ত হয়ে উঠলে যাব।

কী নাম যেন, কী নাম রেখেছে ইরফান?

কুসুমহিয়া!

কবিতা দুহাতে ভরত নাট্যমের মুদ্রা ফুটিয়ে ধিন তা ধিন তা তা করে উঠেছিল নীল নোট বই এ লিখে রাখো বিজন, কুসুমহিয়া। নাচ শিখবে জগৎপুরে ধূলিহর-এ। গুনগুন করে উঠেছিল কবিতা, শ্রী গণপতিনি সেবিম পরায়ে/শ্রুতমা না ভুলায়ে সেবিম পরায়ে—হে গণপতি, প্রণাম নাও, হে শিল্পী প্রণাম করতে ভুল না।

তো ইরফান একদিন এসে বলল, বিজনদা যদি এমন হয়, আপনার বাড়িতে থেকে আমি আমার বাড়িটা করি।

করতেই পার।

কত ভাড়া দেব?

ভাড়া দেবে কেন, আমি তো বাড়িতে ভাড়াটে বসাচ্ছি না।

না না, আমি ব্যবহার করব, তার দাম দেব না?

বিজন বলেছিল, তুমি যদি না ওঠো ইরফান?

হা হা করে হেসেছিল ইরফান, বলেছিল, তা বটে।

ইরফান তাদের বাড়িতে থেকে নিজের বাড়িটি করবে শুনে কবিতা বলল, বাঁচা গেল, ধূলিহর নিয়ে একা থাকতে হতো, বাড়ি ব্যবহার হলে ভাল থাকে।

হুঁ, গৌড়া তাই বলেছিল।

ওর তো ইচ্ছে অন্য, বাঁচা গেছে, ইরফানরা থাকবে, এদের বাড়ি হয়ে গেলে ওরাই আমাদের বাড়ি দেখবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কবিতা।

কিন্তু আমরা তো যাব একদিন।

যাব, কুসুমহিয়া বড় হোক, বছর পাঁচ থেকে শেখাব।

তাহলে আর ক'দিন! বিজন ভেবেছিল বাচ্চাটির বয়স যখন বছর দেড়, পাঁচ হতে কত আর দেরি। তারপর তারা ধূলিহরবাসী। ইরফানের সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে গল্প করবে। ইরফানের স্কুটারের পিছনে চেপে সে অফিসে বেরোবে। বাস স্টপ অবধি পৌঁছতে পারলে হল। না হলে একটা সাইকেল কিনে নেবে। র‍্যালে পাওয়া যায় এখন? বোধ হয় না, সেনর‍্যালে কতদিন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বিজনদা, বলেছিল ইরফান।

গেল ইরফান। চাবির গোছা তার হাতে তুলে দিতে দিতে কবিতা বলল, ওই গৌড়া মানে গৌড়েশ্বরকে একদম লাই দিয়ো না ইরফান ভাই, লোকটা দুষ্টু।

সে কি আমি জানি নে বউদি।

দুধকুমারকে খোঁজ করে নিয়ো, লোকটা ভাল।

বিজন হা হা করে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, দুধকুমারের প্রেমে পড়ে গেছে তোমার বউদি, আমি আর ধূলিহরে যাব না ইরফান।

পড়েছিই তো, আহা ওর বউটিকে ফেরানোর ব্যবস্থা করো তো ইরফান ভাই, বউ-এর ছেলে না মেয়ে তো হবে একদিন? বিজনকে জিজ্ঞেস করছিল কবিতা, তারপর বলেছিল, মেয়ে হয় যদি আমি নাচ শেখাব, গুন গুন করে উঠেছিল কবিতা, জয় জয় গণপতি...

গেল ইরফান। একটু উদ্বেগে ছিল বিজন। ইরফানকে কেমনভাবে নেবে জগৎপুর? এই খোদ কলকাতা শহরে মুসলমান এসে হিন্দুপাড়ায় থাকতে পারে না, ঘর ভাড়া পায় না, সে কিনা মুসলমানকে পাঠাল তার ধূলিহর-এ। বেশ করেছে পাঠিয়েছে। ধূলিহর তো অমনিই ছিল। যেমন ছিল তেমন করে তুলবে বিজনকুমার বসু।

উদ্বেগ তো শুধু বিজনের নয়। উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল কবিতাও। রবিবারে জগৎপুরে পৌঁছবে ইরফান তার পরিবার নিয়ে, শনিবার গিয়ে সব বলে এসেছিল বিজন। গৌড়েশ্বর বলেছিল, কোনো অসুবিধে হবে না দাদা, থেকে বাড়ি তো করবেই, বাড়ি আমি দাঁড়িয়ে করে দেব, ইট বালি সিমেন্ট পাথর মিস্ত্রির জন্য ওঁকে ছুটতে হবে না, ঠিকেদার দিয়েও করাতে হবে না, গৌড় আছে কী করতে, চা খান।

বিজন তার ঘরে ঢুকেছিল। সব গুছিয়ে রেখে গেছে কবিতা। ইরফান এসে একেবারে সাজানো সংসার পেয়ে যাবে। গ্যাসের ব্যবস্থা করে দেবে গৌড়, একটু বেশি লাগবে, দুশো আশি টাকার সিলিন্ডারে তিনশো পঞ্চাশ, এছাড়া সিলিন্ডারের একটা টাকা লাগবে। টাকাটা বেশি লাগছিল। গৌড় বলল, সে কম করিয়ে দেবে। বিজন বুঝতে পারছিল গৌড় কমিশন খাবে। ইরফানকে সাবধান করে দিতে হবে। বিজন শেষে জিজ্ঞেস করেছিল, মানে মুসলিম বলে কোনো আপত্তি নেই তো আপনাদের?

না দাদা, আপত্তি হবে কেন?

খুব ভাল ছেলে ইরফান, শিক্ষিত।

আমাদের ভিতর ও সব নেই দাদা, উনি তো আমাদেরই মতো।

দেখবেন।

দেখছি দাদা, নিশ্চিন্তে যান, আপনারে ঠিকেদার ঠকিয়েছে, এনার বাড়ি গৌড় তুলে দেবে, কী জিনিস হয় দেখবেন।

বিজন বুঝতে পারছিল লোভটা গৌড়ের ভিতর চাগাড় দিয়েছে। সে ইরফানকে ফোনে বারণ করে দিল, ক'দিন থাকো, তারপর আমিই দেব আমার কন্ট্রাক্টর, ওকে ধারেকাছে আসতে দেবে না।

গৌড় বলেছিল, পুরো বাড়িটায় ইরফান থাকবে?

হ্যাঁ, তাই তো ঠিক আছে।

পুরো বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন?

ছেড়ে দেব কেন, ও ওখেনে থেকে বাড়ি করবে।

কত ভাড়া দেবে?

ভাড়া কেন দেবে, ও আমার কলিগ, ফ্যামিলি ফ্রেন্ড।

গৌড়েশ্বর বলেছিল, এসব ডিসিশন নেওয়ার আগে আমাকে একটু বলবেন, বাড়ি তুলতে খরচ হয়নি, ঠিকেদার টাকা মারেনি?

থাক না গৌড়বাবু।

না দাদা, আমি বুঝেছি দাদা বউদির মতো সরল মানুষ এ দুনিয়ায় নেই, একটা ঘর তালা মেরে রাখলে পারতেন।

কী হবে?

এসে তো বসবেন, যাক গে আপনার বাড়ি, তবে কি না আমি তো দেখেছি বাড়ি উঠতে, আপনার কষ্টও দেখেছি, তাই বলতে ইছে হচ্ছে, ঘরবাড়ি এমন ছাড়তে নেই।

কথাটা টিক করে লেগেছিল। কথাটা মাথায় নিয়ে বিজন কলকাতা ফিরেছিল। ফিরতে ফিরতে তার মনে হয়েছিল, গৌড়েশ্বর লোকটি খাঁটি কথা জানে। বিষয়ের কথা জানে। গৌড়েশ্বরকে তো কোনোদিন তাদের আমতলির বাড়ির কথা বলেনি সে, তবে কী করে সেই ভবিষ্যৎকে ইঙ্গিত করল? আমতলিতেও ধূলিহর বসেছিল। সেই ধূলিহর একদিন তিন শরিকে ভাগ হল। কম ভাগটি তাদের কাছে এল। কতটা এল, কতটা এল না তার খোঁজ করবেই বা কে? বাবা শেষদিকে হয়ে গিয়েছিলেন উদাসীন। আমতলির নাম মুখে আনতেন না। কলকাতার ফ্ল্যাটে বসে খাঁচায় আঁটা পাখির মতো আকাশ দেখতেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। সেই বাড়ি তিন শরিক ভাগ করে নিল, তাদের ও একটি ভাগ হল। দুই অংশ বেচা হয়ে গেল, তাদের অংশ তালা মারা পড়ে থাকল। বাবা যাওয়ার কথা বলতেন না, তারাও ও বাড়ির মায়া ছেড়েছিল। তারা তিন ভাই গিয়ে ওই তিনভাগের একভাগ কি আবার তিনভাগে ভাগ করবে? তা কতটুকু হবে? তার চেয়ে পড়ে থাক। মাঝে মধ্যে গিয়ে দেখে আসা যাবে। রাত কাটিয়ে আসা যাবে, ভাগ করবে না আর।

ফিরে এসে কবিতাকে বলেছিল বিজন, গৌড়া লোকটা তো বিষয়ী, পাটোয়ারি, বলছে বাড়ি অন্যের হাতে দিতে নেই।

দিলে কই, ক'দিনের জন্য থাকবে মাত্র।

বিজন বলেছিল, ক'দিনের জন্যই তো ঢুকেছিল ভটচায্যি মশায়ের জামাই সন্তোষ চক্রবর্তী, আর কি বেরোল?

তোমরা সেইভাবে কি বেরোনর কথা বললে?

কে বলতে যাবে বলো, ষাট মাইল গিয়ে বলে এলাম, সে বলল, হ্যাঁ দেখছি, এখনো দেখছে।

ইরফান তার সন্তোষ চক্রবর্তী কি এক? এক নয়। সন্তোষ চক্রবর্তীর ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে আর একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল খিদিরপুর ডকে। ফ্যাক্টরি বন্ধ হতে কোয়ার্টারের আলো কাটা পড়ল, জলের লাইনও গেল। কোয়ার্টার ছাড়তে লাগল অন্যেরা। পরপর ছয় মেয়ে আর শেষে একটি ছেলে নিয়ে সন্তোষ তখন এসে পড়ল বিজনের বাবার কাছে, জেঠামশায়, আপনার বাড়িটা তো পড়ে আছে, আমি বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে ক'দিনের জন্য ঢুকি, জমি দেখছি, জমি কিনে আমতলিতেই বাড়ি করে নেব।

ব্রাহ্মণের জামাই ব্রাহ্মণ। ছয় মেয়ে রোগা একটি বউ, তার কোলে শিশু সন্তান, এসে দাঁড়িয়েছে এই ফ্ল্যাটের দরজায়, তাকে কী করে ফেরাবেন বাবা? বাড়ি ঘর জমিজমা মানুষ প্রথম বয়সে করে অতি উৎসাহে, অতি আনন্দে। একটা বয়স অবধি মানুষ যা করে তার ভিতরে নেশা থাকে, আনন্দ থাকে। পরে তা কেটে যেতে থাকে। তখন কার্নিস ভেঙে পড়লেও চুপ করে বসে দ্যাখে। এসব হয় বার্ধক্য এলে। আশা ভঙ্গ হলে। বাবার তাই হয়েছিল। বাড়িটা বিক্রি করবেন না, কিন্তু যাবেন ও না কলকাতা ছেড়ে অতদূরের গ্রামে। ধূলিহরও ফিকে হয়ে আসছে তখন। সন্তোষ চক্রবর্তী ভিতরে ঢুকে বাবার পা জড়িয়ে ধরেছিল, এদের নিয়ে কোথায় যাব জেঠামশায়, আপনার তো কাজে লাগে না, পড়ে আছে।

পাঁচ

সন্তোষ চক্রবর্তীর মুখখানা মনে পড়ে বিজনের। এখনো সে আছে। রয়েই গেছে। একশো বছর, দুশোবছরই যেন থাকবে। ইরফান তার বাড়িতে গেল রেহানাকে নিয়ে যখন, সন্তোষ চক্রবর্তীর সঙ্গে আচমকা কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। কবিতা বলেছিল, সন্তোষকে তো তোমরা দিয়ে দিয়েছ, কাউকে যদি কেউ কিছু দিয়ে দেয়, সে কি না নিয়ে পারে?

বাবা তো ক'দিনের জন্য থাকতে নিয়েছিল, কথা ছিল আমতলিতেই শ্বশুরের জমিতে ভিটে তুলে নেবে লোকটা, আসলে ছেলে হওয়ার পর তার মনে জমি বাড়ি ঢুকেছিল, সন্তোষ বলেও ছিল তা এই ফ্ল্যাটে এসে।

কী বলেছিল? না, জেঠামশায় ছ'মেয়ের পর ছেলে, মেয়ে তো পার করে দেব যে করে হোক, ছেলের জন্য ভিটে মাটি তো রেখে যেতে হবে, সে তো আমার রেখে যাওয়া মাটিই পাবে।

বিজনের বাবা বলেছিলেন, তুমি রাখবার কে সন্তোষ, এই যে আমি রেখেছিলাম আমতলিতে, এমনিই তো পড়ে আছে, ছেলেরা কেউ গেল? বড়টা দিল্লি, মেজটা গড়িয়া, ছোটজনও যাবে না ওদিক, কী হবে? সন্তোষ একগাল হেসে বলেছিল, আপনাদের আছে তাই যান না।

কই আছে, ছোটজনের তো এই ভাড়া ফ্ল্যাটই সম্বল।

এ তো জীবনে ছাড়তে হবে না জেঠামশায়।

তা কি হয়, বংশ পরম্পরায় লোকের বাড়িতে থেকে যাবে, নিজের কিছু হবে না?

আমতলিতে আপনারা গিয়ে থাকতে পারবেন না, শিক্ষিত মানুষ কলকাতায় থেকে অভ্যস্থ, কী করে ওখেনে থাকবেন?

সেই কথাই তো বলছি, ছেলের জন্য ভাবছ ওখেনে বাড়ি করবে, ছেলে হয়ত কাজ করতে বিদেশে চলে গেল, ছেলে হয়ত আমেরিকায় গিয়ে পড়ে থাকল, কী হবে তোমার করা ভিটে?

সন্তোষ বলেছিল, আশীর্বাদ করেন জেঠামশায়, তাই যেন হয়।

তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, তোমারে কী করে আশীর্বাদ করব সন্তোষ, তুমি যে আমার পা ছুঁয়েছ এতে আমার কতটা পাপ হল—।

কী যে বলেন জেঠামশায়, বামুন খেতে পায় না, মদের কারখানায় এখন হিসেব লেখে, আগে ছিল অগ্রবাল টেক্সটাইলের ক্লার্ক, আমি আমতলিতে যাব ওই কারণেই, ছেলেটা ব্রাহ্মণ হয়ে উঠুক আবার, আমার সব গেছে জেঠামশায়, গো মাংসটা বাকি আছে—বলতে বলতে চোয়াড়ে মুখের সন্তোষ চোখের জল মুছছিল। বউ মেয়েরা সব মেঝেয় বসে আছে। বড় মেয়েটার বয়স বছর চোদ্দো। ওদের পার করে দেবে? কী করে পার করাবে সন্তোষ?

সন্তোষ চক্রবর্তী তিন মাসের জন্য চাবি নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বারবার বলে গেল, ভগবান আপনাদের সব দিয়েছেন, আরো দেবেন, আপনাদের আরো হোক।

সেই সন্তোষ তিন মাসের জন্য গিয়ে আর বেরোল না। গেল যে চাবি নিয়ে সেই চাবি ফেরত দিল না। চিঠি পাঠালে জবাব দেয় না। আমতলির আর এক বামুন এসে অভিযোগ করে গেছে, সন্তোষ ভিতরে উঠোনে রান্নাঘর তুলেছে। পাকা দেওয়াল টালির চাল। অভিযোগ করে গেছে, কত আম হয়েছিল, সব সে খেল, একটাও পাঠাল না আপনাদের? সামনের উঠোনে দুপাশ কুপিয়ে কুমড়োর মাচা দিয়েছে, ঝিঙের মাচা করেছে। কী কী হয়েছে সেই সাজানো বাড়ির? বাবা এসব শুনতে শুনতে চোখ বুজতেন, কোনো কথা বলতেন না। শুধু মাঝে মধ্যে খেপে উঠত তার মেজ ভাই অতীন, কেন হবে,

এবার গিয়ে ওকে বের করে নিয়ে তালা লাগিয়ে আসব।

বাবা বলতেন, না, তোদের তো অসুবিধে হচ্ছে না।

না কেন, ও বাড়িটা আমাদের একটা ঘোরার জায়গা হয়ে থাকত, গেসট হাউসের মতো করে রেখে দেব, সাজিয়েগুছিয়ে বন বাংলোর মতো করে।

অতগুলো মেয়ে নিয়ে ও যাবে কোথায়?

সে ও বুঝবে, শ্বশুরের জমিতে বাড়ি করার কথা ছিল না?

পারছে না, পারলে নিশ্চয়ই করত।

এসব কথা মনে পড়েছিল জগৎপুর থেকে ফিরে। বিজন ভাবছিল সে কি ভুল করল ইরফানকে থাকতে দিয়ে? যদি ইরফান না ওঠে, নিজের বাড়ি না করে? তখন কবিতার উপর একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিল বিজন, কবিতা কেন বারবার ইরফানের হয়ে কথা বলছে। কবিতাই তো ইরফানকে প্রস্তাবটা দিয়েছিল, গিয়ে থাক না যদ্দিন নিজের বাড়ি না কমপ্লিট করতে পার। সেদিন ইরফান কিছু বলেনি, পরে নিজেই তো প্রস্তাব দিল। আসলে কবিতা নিজে যেতে চাইছে না। যাবে না এখন। গেলে বারোটি ছাত্রী নিয়ে তার ভরত নাট্যম বন্ধ হয়ে যাবে। কষ্ট করে শিখেছিল। ভালও বাসে। তার ছাত্রী সংখ্যা বাড়ছে একটি দুটি করে। সে এত তাড়াতাড়ি এসব বিসর্জন দিতে রাজি নয়। নাচটা গেলে কী নিয়ে থাকবে? বিজন আচমকা বলেছিল, তোমার উৎসাহে গেল, তবে তেমন কিছু হবে না মনে হয়, তাই না?

মানুষকে তো বিশ্বাস করতে হবে।

সন্তোষ চক্রবর্তীকে বিশ্বাস করে কী হল?

সবাই তোমার লোভী বামুন নয়।

তাই কি? জানি না।

কবিতা বলেছিল, চল না কাল আমতলি যাই।

কেন?

এমনি, আমাদের একটা বাড়ি হয়েছে, আর একটা বাড়ি রয়েছে, কোনো বাড়িতেই আমরা থাকি না, কিন্তু দেখবও না।

ইচ্ছে করছে সত্যি?

হুঁ। কবিতা তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, ইরফান আর সন্তোষ চক্কোত্তি এক নয়, বিজনবাবু তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

বলা যায় না কবিতা, আমরা যে এই ফ্ল্যাটে এত বছর রয়েছি, অন্যের বাড়ি তো, উঠছি, না ওঠার কথা ভাবছি?

না, না, তা কেন, যখন আমাদের যাওয়ার সময় হবে, যাব।

কবে সেই সময় হবে?

এখন কী যাওয়া যায়, কী করে যাব? বলে কবিতা চুপ করে গিয়েছিল, তারপর বলেছিল, জায়গাটা ডেভলপ করুক, যাব, আমাদেরই তো বাড়ি, শহরে থাকার অভ্যেস, ওখেনে গিয়ে থাকতে পারবে এখন?

থাকতে থাকতে অভ্যেস হয়ে যাবে।

লোকে শহর থেকে গ্রামে যায়? গ্রামই তো শহরে আসে, তাই না, জগৎপুর আসুক।

কথাটা সত্যি। কী যে হয়েছিল তাদের! বিজনকে পরে বলেছিল কবিতা, গেলে আমার এতদিনের চেষ্টাটা নষ্ট হয়ে যাবে, আমি তো ক'জনকে তৈরি করছি, আমাকে কতবার বলেছে হিন্দি ফিল্মের ডান্স শেখাতে, আমি তো তা করিনি, জগৎপুরে গেলে সব যাবে।

আচমকা বিজন জিজ্ঞেস করেছিল, কত পাও?

কত পাই মানে? কবিতা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে বসেছিল।

না মানে এতে কত হয় তোমার?

আমি কি ওই জন্যে করি?

বিজন চুপ করে গিয়েছিল। টের পেয়েছিল কথাটা ঠিকমতো বলতে পারেনি। কথাটা বলাও ঠিক হয়নি। কবিতা যদি ঘরে বসে বাচ্চা পড়ায় তাতেও অনেক হতে পারে। কিন্তু সে কারণে তো নাচ শেখায় না। ওই যে হিন্দি ফিল্মি ডান্স—ও করলে উঠতি পয়সাওয়ালা লোকেরা ভাল দেবে। কবিতা বলেছিল, আমি তো বেশিদুর যেতে পারিনি, কী করে যাব, উপায়ও ছিল না, তবে শিখিয়ে তো আনন্দ পাই—আনন্দটা ফেলে রেখে যাব?

আর কথা এগোয়নি। কিন্তু পরদিন ভোরে তাকে ডেকেছিল কবিতা, ওঠো, যাবে না আমতলি?

কী করতে যাব?

বাহ্, তোমাদেরই তো বাড়ি, মাটি, একবার একবার তো যেতে হয়।

গিয়ে কী হবে?

না গেলে ও ধরে নেবে বাড়িটা ওর।

কবিতার জোরাজুরিতেই গিয়েছিল বিজন সপুত্র সস্ত্রীক। বাস থেকে নেমে অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখেছিল। কী নিঃঝুম হয়ে পড়ে আছে প্রকৃতি। ফাল্গুন মাস। বাতাসে আমের বোলের গন্ধ ভুর ভুর করছিল। অল্প তেতে ওঠা রোদের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল উদাসী বাতাস। আগে, সেই অনেকদিন আগে এই রাস্তার গা দিয়েই গিয়েছিল মার্টিন কোম্পানির ছোট রেলগাড়ি। কতদিন রেললাইন দেখেছে বিজন! কবে সেই রেললাইন মুছে গেল তা জানে না। রিকশায় চেপে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছিল, তখন সাড়ে এগারটার

মতো বেলা। রিকশায় বসে কবিতা বলেছিল, চলে গেলে কেন তোমরা?

থাকার উপায় ছিল না, আসলে তাও নয়, বাবা হঠাৎ নিস্পৃহ হয়ে গেলেন ভাইরা অংশ আলাদা করে নেওয়ায়, আমাদেরও কলকাতা ছাড়ার উপায় ছিল না।

শহর ছাড়া হয় না, কিন্তু গুছিয়ে তো রেখে দেওয়া যেত।

কে গুছাবে, যাঁর জিনিস তিনি সন্তোষের হাতে চাবি তুলে দিয়ে বললেন, যাও সুখে বাস করো, আমরা সুখে বাস করার জন্যই তো তৈরি করেছিলাম।

কবিতা বলল, কী অদ্ভুত গ্রাম, লোকজন কত কম!

আছে, তবে জমি তো অনেক বেশি, বাগান পুকুর ধান জমি গাছ-গাছালি, আগে এক একটা লোকের লাগতও অনেক।

কই অনেক, এখনই তো লাগে বেশি।

ও লাগার কথা বলছি না, বলছি জমির কথা।

ছিল অনেক, জমিই তো ভাত দিত, এখন চাকরি বাকরি জমি হয়েছে।

কী সুন্দর বলেছিল কবিতা। রিকশাওয়ালা ঠিক জায়গায় এনে থামিয়ে দিয়েছিল। রিকশা থেকে নেমে বিজনের সব অচেনা লাগছিল। অচেনা লাগছিল আর ছোট লাগছিল। এ কোথায় এল? ছেলেবেলার সেই গ্রামে সেই বাড়িতে! কোথায় এখানে ছেলেবেলা? হেঁপো বুড়ো যেন রোদে বসে শ্বাস নিচ্ছে। বিঘে ছয়ের মতো মস্ত জমির বাড়ি তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বেড়া টেনে ভাগ করেছে নতুন বাসিন্দারা। এর ভিতরে সব চেয়ে কুশ্রী হয়ে আছে তাদের অংশটা। সেই অংশে সন্তোষ চক্রবর্তী লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বারান্দায় বসে বিড়ি টানছিল। বিজনদের দেখে চিনতে পেরেছিল কিন্তু বারান্দা থেকে নামেনি। বরং না চেনার ভান করে বসেই ছিল। বিজন সংকোচ বোধ করছিল, কিন্তু কবিতা তার ছেলের হাত ধরে ভিতরে চলে গিয়েছিল, সন্তোষবাবু কে আছেন?

কেন, আমি আছি।

আমরা কলকাতা থেকে আসছি, আমার শ্বশুরের ভিটে তো।

সন্তোষ বসেই ছিল, বলল, কার কথা বলছেন?

অনন্তকুমার বসু, ভুলে গেলেন। বিজন আচমকা রেগে কথাটা বেশ চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, আমাকেও চিনতে পারলেন না?

সন্তোষ নিস্পৃহ গলায় চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছিল, অ্যাই রেণু, একটা মাদুর নিয়ে আয়, আসুন, বসুন।

শানের মেঝেতেই বসে পড়েছিল কবিতা কেননা মাদুর আসছিল না। বিজন টের পাচ্ছিল সন্তোষ চক্রবর্তী ভিতরে ভিতরে তাদের প্রত্যাবর্তনকে প্রতিরোধ করছে। ভয়ও পাচ্ছিল। তারা মেঝেতে বসলে সে আবার ডেকে উঠেছিল।

ভিতর থেকে ছেঁড়া মাদুর হাতে একটি বছর বারোর মেয়ে বেরিয়ে এসেছিল। তার বালিকা বয়স তখনই অন্তর্হিত। তার কিশোরীর সলজ্জতাও ছিল না। বারো বছরেই যেন বৃদ্ধা, অনেক অভিজ্ঞতার ভারে বেঁকে গিয়েছিল, বলেছিল, এত চেঁচাও কেন?

কথা বললি শুনিস নে।

আমি অন্য কাজ করছিলাম, বলে মাদুর ফেলে দিয়ে মেয়েটি আবার ভিতরে চলে গেছে। সন্তোষ চক্রবর্তী চুপ করে বসে ছিল। বিজন রেগে যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। তার ভয় হচ্ছিল। অনাহুতের মতো বসে আছে নিজেদের ভিটেতে।

তার জগৎপুরের বাড়িতে তত সময়ে ঢুকে গেছে ইরফান আলি পরিবার নিয়ে। সে ঠিক করেনি। ইরফান যদি থাকতে চায় অন্য কোথাও থাকুক, তার নতুন বাড়িতে কেন? এটা কবিতার জন্য হয়েছে। তার মনে হচ্ছিল সে যেন জগৎপুরের ভবিষ্যতে পৌঁছে গেছে, বলে উঠেছিল, আপনাকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল, পেয়েছেন?

সন্তোষ গা ছাড়া দিয়েছিল, বলেছিল, হ্যাঁ।

যেতে বলা হয়েছিল।

সময় পাইনি।

সময় পাননি, কেন পাননি?

পাইনি পাইনি, সে শুনে কী করবেন ছোটবাবু, এদিকে এলেন যে হঠাৎ।

এলাম, এখানেই এলাম।

সে তো দেখতে পাচ্ছি, খেয়ে যাবেন তো?

কবিতা বলেছিল, না না, আমি বাড়িটা দেখিনি, একটু দেখতাম।

হেসেছিল সন্তোষ, বলেছিল, কী দ্যাখবেন, বাড়ির লোক যদি ভাল না থাকে বাড়ি ভাল লাগবে আপনার?

আমবাগান, নারকেলগাছ কোথায়?

আছে পিছন দিকে, ও রেণু রেণু।

ঠিক আছে থাক।

না না, কটা ডাব আনতে বলি, দুকুরে বাউনঘরে এলেন।

তখন বিজন ফুঁসে উঠেছিল, এটি বাউনঘর হল কবে?

তাই তো বলে লোকে, এ পাড়ায় আর বাউন আছে? বলে সন্তোষ চক্রবর্তী উঠে দাঁড়িয়ে লুঙ্গির কষি ভাল করে বেঁধেছিল। লোকটার গায়ের রং ময়লা, গা ভর্তি রোম। কীরকম বুনোবুনো ভাব। বুকের রোমগুলি প্রায় পেকে গেছে তখন, উঠোনে নামতে নামতে ডেকেছিল কবিতাকে, আসুন বউদি আমি দেখিয়ে আনি।

থাক, বলছি চিঠিটা পড়েছিলেন?

হ্যাঁ, কিন্তু আমার মন ঠিক নেই ছোটবাবু, এমন দিনে এলেন যে ভাল করে অভ্যর্থনা করব যে সে মনও নেই, কাল আমার সেজ মেয়েটা পলাইছে একটা ছোঁড়ার সঙ্গে।

বিজন তড়িতাহত হয়েই যেন ছিটকে নেমে এসেছিল উঠোনের রোদে, জিজ্ঞেস করেছিল, কী বলছেন?

রিকশাওয়ালার সঙ্গে, দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, আর তো নেই তেমন, ছেলের জন্যও রাখতে হবে, সব মেয়েদের পিছনে ঢালব।

খোঁজ করেননি?

নাহ্! ভালই হয়েছে, আমিই বা কী করতাম, বাউন বাউন করলি হবে, হ্যাঁ, কী করতি আলেন বলেন দেখি, হঠাৎ যে? আপনারা তো এদিক পানে আসেনই না।

ছয়

নারকেলগাছ, আমগাছ দেখিয়েছিল সন্তোষ। অন্তত গোটাদশ হিমসাগর। তখন গুটি ধরেছিল সবে। সন্তোষ বলেছিল, এবার তেমন হয়নি, একবার হয় একবার হয় না।

গতবার খুব হয়েছিল?

হ্যাঁ।

আমাদের দুটো পাঠাতে পারতেন। কবিতা বলেছিল।

কী হবে, বাজারে তো পাঁচ টাকা কিলো হয়ে গিয়েছিল।

বিজন বলেছিল, এবার আপনাকে উঠতে হবে।

সন্তোষ চক্রবর্তী হেসেছিল, বলেছিল, আমি তো উঠতে চাই, উঠতে দেয় না, এখেনে এসে আমার আর বাড়ি করা হল না।

উঠোনে নতুন রান্নাশাল। রান্নাশালের বারান্দায় অল্পতে বৃদ্ধা হয়ে যাওয়া এক রমণী মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। তাকে চিনেছিল বিজন অল্প দূর থেকে। সন্তোষের বউ। ভটচায্যি বাড়ির মেয়ে। অল্প বয়সে সুন্দরী ছিল। বিয়ের পর সাতটা বাচ্চা গর্ভে ধারণ করেছে এক নাগাড়ে। শরীর আর থাকে! তাদের দেখে সন্তোষের বউ মাথায় কাপড় তুলেছিল। ওরা আবার বাইরে এসে বসেছিল। ভাল লাগছিল না কবিতার। সে বসিরহাট ফিরে যেতে চাইছিল। ওখানে খেয়ে বাস ধরা হবে। বাসে আর কত সময়, ঘন্টা দেড়। সন্তোষ বলেছিল, না বসে যান, ভাত না খেয়ে গেলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে।

আপনি উঠবেন না?

না, আপনার বাপ ঠাকুর্দা বারণ করে।

তার মানে?

তেনারা তো থাকেন এখেনে। বলে সন্তোষ গম্ভীর হয়েছিল, বলেছিল, আমি তো আর থাকতে চাইনে, কিছুতেই না, কেন থাকব পরের বাড়ি, এই করে আমার ভিটে হল না।

আমাদের বাড়িটা আমরা সাজিয়ে গুজিয়ে রাখি।

রাখুন, কে বারণ করেছে। কিন্তু পারবেন না, আপনার বাবা, ঠাকুর্দা তাঁর বাবা বড় ঠাকুর্দা সব এখেনে চলেন ফেরেন, আমার সঙ্গে কথা হয়।

কী সব ফালতু কথা বলছেন।

সন্ধেয় থাকুন না, দেখে যান, অবশ্য আপনি কী করে দেখবেন, আমি দেখব, আমার সেই ক্ষমতা আছে।

ঠিক আছে, আপনি এবার উঠুন।

পারব না, আপনার বাপ ঠাকুদ্দা বলছে ব্রহ্মশাপ ঘুচল।

তার মানে?

ব্রাহ্মণের শাপ ছিল কিনা আপনাদের ফেমিলির উপর?-বলে বিড়ি ধরিয়ে ফুকফুক করে ধোঁয়া উগরোয় সন্তোষ চক্রবর্তী, আপনি জানেন না ছোটবাবু?

না তো।

ছিল, বাউনের সব্বোনাশ করেছিল আপনার ঠাকুদ্দার ভাই, জমি মেরে খেয়েছিল।

আমরা তো জানি না, এসব এখন বানাচ্ছেন?

না আজ্ঞে আপনার বাবা জানতেন, উনি তো দেবতুল্য মানুষ ছিলেন। বলে জোড় হাত কপালে ঠেকায় সন্তোষ চক্রবর্তী। গা চিড়বিড় করছিল। খুব রেগে গিয়েছিল বিজন। লোকটা খুব চালাক। কথাটা কবিতার সামনে ফেঁদেছে বলে আরো রেগে যাচ্ছিল বিজন, কিন্তু সন্তোষের কোনো হেলদোল ছিল না। সে বলছিল বিজনের পিতামহর ভাই তিনিও পিতামহ, কালিদাস বসুর কথা। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সেই মানুষটি ছিলেন সাতক্ষীরা কোর্টের মুহুরি। তাঁর কেনো বংশধর নেই। তিনটি কন্যা ছিল, তারা তিন জায়গায় গিয়েছিল, আশাশুনি, মাগুরা আর বাদুরিয়া, তারপর তারাও কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের কন্যারাও কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে কত জনের বংশ ধারা।

বিজন বলেছিল, আমি এসব জানি না আপনি জানেন, আমার ঠাকুরদা ছিলেন দুর্গাদাস বসু এইটুকু জানি।

দুর্গাদাসের সঙ্গে আমার কথা হয়।

থামবেন?

শুনে যান না, শুনতে দোষ কী, কালিদাসের বংশলোপ পেয়েছে আমার ঠাকুর্দার শাপে, আমি কি জানতাম ছাই, বলেছেন তো আমার শ্বশুরমশায় ৺জগদীন্দ্র ভটচায্যি।

হয়েছে, সব আপনি বানিয়েছেন।

না আজ্ঞে, বানাব কী করে, সত্যি কথা আবার বানানো যায়? আমার শ্বশুরমশায় তো ব্রহ্মরাজপুরের লোক, ব্রহ্মরাজপুর তো আপনাদের ধূলিহরের গায়ে, আমাদের বাড়ি ছিল বুধাহাটা, এসব জায়গার নাম শুনেছেন?

জিজ্ঞাসাটা ভাসিয়ে দিয়ে সন্তোষ চক্রবর্তী গা চুলকোতে লাগল। এর ভিতরে সন্তোষের একটা মেয়ে এসে কবিতাকে ভিতরে টেনে নিয়ে গেল, তা বললে হয় কাকিমা, এমনিতে আমাদের সব্বোনাশ হচ্ছে, আরো হবে যদি শুধু মুখে যান, কিছুই পারব না তবে যা পারি তাই দেব।

কবিতা উঠে গেল ছেলেমেয়েকে নিয়ে সন্তোষ চক্রবর্তীর কাহিনির হাত থেকে বাঁচতে। বিজন বলল, জায়গাগুলো তো ছিল।

ছিল না আছে, বর্ডারের ওপারে, আপনার ঠাকুদ্দার ভাই কালিদাস বোস আমার ঠাকুদ্দা মহিম চক্কোত্তির তিন বিঘে জমি জাল করে নিয়ে নিয়েছিল, কোন তিন বিঘে, সবচেয়ে সরেস জমি, অনেক দিনের নজর ছিল।

কী সব বলছেন!

ঠিক বলছি, আপনার বাবা কি এককথায় এমনি রাজি হয়েছিল ছোটবাবু, তিনি ঋণ শোধ করেছেন।

কার ঋণ কে শোধ করে!

বংশটা তো একটা সময় একটাই ছিল, তারপর কালিদাসের বংশ লুপ্ত, আমি কী করে এবাড়ি ছাড়ি?

বিজন হতভম্ব হয়ে কথা বলতে পারছিল না। সন্তোষ চক্রবর্তী বলছে উনিশশো চল্লিশের কথা। তার তিন বছর বাদে দুর্ভিক্ষ লাগে। বন্ধকী জমি তখন কালিদাস লিখিয়ে নেয় সন্তোষের ঠাকুর্দার কাছ থেকে ক'মন ধানের বদলে, সেই দুর্ভিক্ষের কথা কি ছোটবাবু জানে?

কী করে জানবে বিজন? যদি জন্মান্তর থাকে তো সে ওই দুর্ভিক্ষেই মরেছিল ভাতের অভাবে। সন্তোষ চক্রবর্তী বলছে, এত পাপ করেছিল কালিদাস বোস, গরিব বাউনের সব সব্বোনাশ করেছিল শুধু দুর্ভিক্ষের বাজারে ধান দিয়ে দিয়ে।

বিজনের মনে হচ্ছিল উঠে যায়। কিন্তু উঠবে কী করে, সন্তোষ চক্রবর্তী যেন তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ছিল। কীরকম হিসেব দিচ্ছে কালিদাস বোসের

বংশ লোপের—
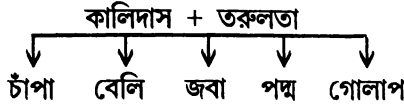
গোলাপের জন্ম দিতে গিয়ে তরুলতা মরে যায়। তখন কালিদাস আর একটি বিয়ে করে। তার কোনো সন্তানই হয়নি। কালিদাসের তিন বিয়ে ছিল। শেষ জন পুত্রসন্তান যদি না হয় সেই ভয়েই প্রথম গর্ভ নিয়েই গলায় দড়ি দেয়।

বিজনের কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। কালিদাসের মেয়েগুলো যে ঘরে গেছে সেই ঘরে পুত্র সন্তান দিতে পারেনি। তারাও চার পাঁচটা করে মেয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে সারা জীবন গঞ্জনা খেয়ে মরেছে।

বিজন বলল, এসব শুনে আমার লাভ কী, আপনি বাড়ি কবে ছাড়বেন?

সন্তোষ চক্রবর্তী কথাটা কানেই নিল না, বলল, লোকটা সমস্ত গাঁর লোককে খাওয়াতে পারত, তার ঘরে কত দলিল পর্চা জমা হয়েছিল তা আমার শ্বশুর মশায় জানতেন, আমার দু'জেঠা তিনটে পিসি মরেছিল ওই মন্বন্তরে। আমার জন্ম অনেক পরে, কিন্তু জন্মে বসতে শিখেই আমি নাকি ভাতের থালায় থাবা মারতাম, তখন তিন মাস বয়স, বাবা বলত তাঁর যে ভাইরা মরেছিল তখন, তাদের কেউ আমি—

বিজন বলেছিল, আমরা তো কালিদাসের কেউ না।

কেউ না কেন আপনাদের ঠাকুর্দার বাবা রবিদাস তো ছিল কালিদাসের বাবা, রবিদাসের ছেলে কালিদাস দুর্গাদাস, বোঝা গেল?

হুঁ, আমরা দুর্গাদাসের বংশধারা।

কালিদাসের বংশধারা লুপ্ত করেছিল ব্রহ্মশাপ, না হলে থাকত, আপনি বলুন আমি কী করে উঠি?

বিজন বলল, আপনার কোনো কথাই সত্যি না।

যদি মনে করেন তবে তাই, আরো কথা বলব?

কী বলবেন?

আপনাদের বোস বংশের আরো কীর্তি।

গল্পগুলো বানাচ্ছে কে, আপনি বাড়ি না ছাড়লে আমি ছাড়াব।

আমি গেলে তো, আপনার বাপ ঠাকুর্দার রেখে দেবে তো আপনি কে, দেখুন ছোটবাবু, আমি সব লিখে রাখছি, আমার পরে ওতে আমার ছেলে লিখবে, সে যা মনে করবে তাই হবে, সে যদি চায় তার ছেলেকেও বলবে ওই খাতায় লিখতে...।

কী লিখছেন?

ওইসব কথা, কালিদাস বোসের কথা আরো শুনবেন, বাগদিপাড়া থেকে

একটা ছেলে আসত—

থামবেন আপনি।

সত্যি কথায় দোষ হয়, সেই বাগদিদের বংশ তো এখানে এসে উঠেছে, আপনার ঠাকুর্দা তাদের নিয়ে এসেছিল ওপার থেকে।

কী সব জটিলতার কথা বলছে লোকটা। ওফ্! খুব ভুল করে গেছে বিজনের বাবা অনন্তকুমার। এ লোক যে এমন সাপের ঝাঁপি নিয়ে বসে থাকবে তা কে অনুমান করতে পেরেছিল? একটা করে ঝাঁপি খুলছে আর বিষধরের ফণা দেখাচ্ছে। সন্তোষ চক্রবর্তী বলছে, চলুন না দেখিয়ে আনি, ব্রহ্মশাপটা দেখুন, কালিদাসের ঘরে কোনো পুত্রসন্তান হল না কিন্তু বাগদিবউ পেটে ধরল অ্যাত্তোখানি ছেলে, তার অবশ্য জন্ম থেকে পা খানা বাঁকা ছিল, পোলিও টোলিও হয়েছিল নিশ্চয়, তখন কালিদাস কপাল চাপড়াচ্ছে, বাগদিবউ ছেলে কোলে করে আসত ধারের জন্য, ভাতের জন্য।

বিজন জিজ্ঞেস করেছিল, এসব লিখছেন আপনি?

হ্যাঁ লিখে রাখছি, এই বাড়ি বসেই লিখছি, না লিখে রাখলে হারিয়ে যাবে সব, এমনিই তো মানুষের ভুলতে সময় লাগে না বেশি।

কিন্তু এসব কথা মনে রেখে হবে কী?

মনে রাখতে হবে, দুর্ভিক্ষের ইতিহাস কি না, সেই বাগদি বউ-এর ছেলের নাম ছিল ভিখারি, ভিখারিচরণ বাগদি, ভিখারিচরণের পাঁচ ছেলে, তাদের আবার তিনটে করে ছেলে, কালিদাস বোসের বংশ ছড়াচ্ছে এদিকে, কিন্তু কিছু করার উপায় নেই, যদি বলেন দেখিয়ে আনি তাদের, হ্যাঁ যে রিকশায় করে আসেন সে ও তো বাগদিদের ছেলে, আপনাদের রক্তধারা বইছে কি না কে জানে!

গা সিরসির করে ওঠে বিজনের। কীভাবে নিজের দখল পোক্ত করে ফেলেছে সন্তোষ চক্রবর্তী। বিড়ি নিভে যাওয়ায় নতুন বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া উড়োচ্ছে আর বিজনকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কেন সে উঠবে না। কথাটা তার তো জানা ছিল না, আসলে তার শ্বশুর মশায় লিখেছিলেন এসব কথা। তা থেকেই তো সব জানতে পারে। তখনই ঠিক করে বোসদের বাড়ি দখল করে নেবে। কী করে নেবে? সন্তোষ হাসল, বলল, আপনার ঠাকুর্দা যেদিন বলবে সে দিন ছেড়ে দেব, ওই যে কালিদাস বোস সে যে কোথায় গেছে সে খোঁজ কেউ পায়নি, লোকটা তো ওপারেই থেকে গিয়েছিল সম্পত্তি নিয়ে, শেষে রোগে পচে গলে মরেছিল—

বিজন বলেছিল, সব সব মানলাম, কিন্তু আমরা তো কালিদাস বোসের বংশধর নই।

তা নন, কিন্তু তিনি আপনাদের পূর্বপুরুষ তো নিশ্চয়ই।

তা সত্য, কিন্তু আপনার তো ওদেশে গিয়ে দখল করা উচিত।

তার আর উপায় আছে ছোটবাবু, থাকলে তাই হতো, এমন কপাল আমার যে শেষে এখেনে এসে বিয়ে করলাম আর জেনে গেলাম সব।

বিজন থম মেরে বসে থাকল। লোকটা সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে তা জানার কোনো উপায় নেই। তবে মিথ্যে যদি বলে, কাহিনি ফেঁদেছে চমৎকার। এই যে বলছে, তাঁরা মায়া ছেড়েছেন বটে এ বাড়ির, কিন্তু তাঁদের বাপ ঠাকুর্দা যে সন্ধে বেলায় ঘোরেন, এঘর থেকে ও ঘরে যান, উঠোনে পায়চারি করেন। কেন করেন? কেন বলেন, খবদ্দার তুই ছাড়বিনে এ বাড়ি, আমরা আমাদের বংশের পাপ দূর করছি।

ফেরার সময় শেষ বিকেলে লোকটা তাদের রিকশায় তুলে দিতে দিতে বলল, আবার আসবেন, এ হলো আপনাদের বাপ ঠাকুর্দার ধূলিহর, আসবেন দেখে যাবেন কেমন আছি আমরা।

মুখ গম্ভীর করে ছিল কবিতা, একটু এগিয়ে যেতেই সে ফুঁসে উঠেছিল, আমার শ্বশুরের ভিটে, এভাবে চলে যাবে, ওর সব মিথ্যে।

জানি কিন্তু করব কী?

কালিদাস বোস বলে ছিল কেউ?

ছিল জানি।

তিনি এই রকম ছিলেন?

হতে পারে নাও হতে পারে, আমি কোনো খোঁজ রাখি না কবিতা।

ফিরতে ফিরতে ইরফানের কথা মনে পড়েছিল। ইরফান পৌঁছে গেছে। ঢুকে পড়েছে তাদের জগৎপুরের ধূলিহরে। তারপর! ইরফান ও কি অমনি বানাবে? কবিতা বলল, না না তা হবে না।

কবিতা ফিরে এসে বলল, তুমি বৃথা ভাবছ।

দেখলে তো সন্তোষ চক্রবর্তীর কাণ্ড।

ওকে চাবি দিয়ে ছেড়েই দিলে, ও আর যায়।

বাড়িটা গেল!

কবিতা বলেছিল, মাঝে মধ্যে যেতে হবে, আবার চিঠি দাও উঠে যাওয়ার কথা লিখে, আমরা থাকি লোকের বাড়িতে ভাড়া দিয়ে, আমাদের দুটো বাড়িতে অন্য কেউ থাকে, বিজন এ তোমাদের ফ্যামিলির অভ্যাস।

কেমন অভ্যাস?

ত্যাগ করতে পার তোমরা।

আমি তো ত্যাগ করতে চাই না কবিতা, চলো আমরা জগৎপুরে চলে

যাই, না গেলে যে ও বাড়ির কী হবে?

কবিতা বলেছিল, যাব না তো বলিনি, এখনই কেন, পিছনে কী হাঁটা যায় বিজন, তুমি তো পিছনে হেঁটে ভুল করেছ।

এখন!

জগৎপুরকে কলকাতার দিকে টানো।

ইরফান কোনো খবর দিচ্ছে না। একটু হেঁটে বাস স্ট্যান্ডে তো ফোন বুথ পেতে পারে। ইরফান একটা মোবাইল ফোন অন্তত সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারত। আসলে ইরফানকে তার দরকার। একটু কথা বলা দরকার। না হলে নিজেই বিজন চলে যাবে জগৎপুর। কবিতাকে বলেইনি। কবিতার কেন যেন বিতৃষ্ণা এসেছে জগৎপুরে। বিজনকে কথা প্রসঙ্গে বলেছে, ইরফান উঠে যাবে, কিন্তু একটা ভাল দেখে ভাড়াটে বসাও, টাকা উঠে আসবে।

ভাড়াটে উঠবে না।

সে যদি সন্তোষ চক্রবর্তী মতো কেউ জোটে তাহলে তাই হবে।

কী করে বুঝব সে কেমন হবে, জমি মাটি এই রকম কবিতা, কেউ দখল পেলে আর ছাড়তে চায় না, গাঁয়ে দু ছটাক জমি নিয়ে কী মারামারি হয় জানো না?

কবিতা বলল, যা ভাল বোঝো করো, এখনই কি গিয়ে থাকতে পারবে?

দু দিন পরে ভোরে ইরফান হাজির। ফার্স্ট বাসে এসেছে জগৎপুর থেকে। কী ব্যাপার ইরফান? বুকটা ধক করে উঠল বিজনের। চাদ্দিকে যা আরম্ভ হয়েছে! গৌড়েশ্বর মুখে বললেও কি সহ্য করবে ইরফানকে? কে জানে! খুচখাচ দুই সম্প্রদায় তো লেগেই আছে। অফিসে ইরফানের অনুপস্থিতিতে বিজনকে কি কথা শুনতে হয় না? রায়টের সময় তোমাকেই ওকে রক্ষা করতে হবে বিজন। ছিহ্ বিজন, তোমার কী মাথা খারাপ! এমনি ভাব ভালবাসা ভাল, তাই বলে মুসলমানকে নিয়ে থাকতে হবে? ওদের সঙ্গে আমাদের মেলে! তোমার অতটা ইয়ে ভাল না। মাঝে মধ্যে রায়ট লাগা ভাল, তাতে ওরা টিট হয়।

কী হয়েছে ইরফান?

ইরফান অন্ধকার মুখে করে বসে আছে। কবিতা বলল, বসো, থির হও, চা খাও, আজ খেয়ে যাবে ইরফান।

না না বউদি, আমি আবার জগৎপুরে ফিরব।

জগৎপুরে সব ঠিক আছে তো?

আছে বউদি আছে।

গৌড়েশ্বরটা গোলমাল করছে না তো?

না বউদি না, ওদের অষ্টপ্রহর হচ্ছিল, তার প্রসাদ এনে দিল সেদিন, দই

চিঁড়ে আর কলা সন্দেশ মাখা, অমৃত।

বাঁচলাম, আমি চা করে আনি।

ইরফান সিগারেট ধরাল, বলল, বিজনদা আমার বোধ হয় জগৎপুরে থাকা হবে না, ডিসিশন নিচ্ছি।

কেন কী হয়েছে, লোকাল পিপল কিছু বলেছে?

না বলেনি, দেখুন বিজনদা, শহুরে লোক আর গাঁয়ের গরিব লোকে তফাত অনেক বেশি, জগৎপুর তো গ্রামই বটে, সব তো মেছুড়ে আর চাষিবাসী মানুষ, তারা অত শত নিয়ে মাথা ঘামায় না, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান, এসব কোনো ম্যাটারই করে না, আসল সমস্যা অন্য জায়গায়, আগে বুঝিনি বিজনদা।

সাত

ইরফান বলল, রেহানা থাকতে চাইছে না।

সে কী কেন? রেহানারই তো জায়গাটা পছন্দ হল।

হলো, কিন্তু এখন বলছে থাকবে না।

বিজন অবাক হলো না। হতে পারে। ইরফান যতই বলুক প্রতিবেশী নিয়ে অসুবিধে হয়নি, আসলে অসুবিধেটা প্রতিবেশী নিয়েই। ইরফান তো সমস্ত দিন বাইরে থাকবে, রেহানা কী করবে? গৌড়েশ্বরের বউ, ছেলের বউ, এদের সঙ্গেই তো মিশতে হবে তাকে? এরা কি রেহানাকে তাদের ঘরে উঠতে দেবে? নাকি রেহানার ঘরে এসে তার সঙ্গে গল্প করবে?

কী হয়েছে, কেউ কিছু বলছে ওকে?

না না তা নয়।

চেপে যেও না ইরফান, ওসব গায়ে মাখতে বারন করো, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে, জমি কিনেছ, বাড়ি করে থাকবে, এদেশের নাগরিকের সে অধিকার আছেই।

আমার সে মনের জোর আছে বিজনদা, তারপর আপনার সঙ্গে থাকব, কথাটা অন্য, রেহানাই বলছে সে টিকতে পারবে না।

কেন, খুলে বলো দেখি।

রেহানা বলছে! আমারই বলতে কেমন লাগছে বিজনদা, ক'দিন ধরে খুব বুঝিয়েছি ওকে, কিন্তু ও বলছে, না পারবে না, ওর কোনো অসুবিধে হবে না তবু পারবে না, একভাবে বড় হয়েছে, ওর পাড়ার একজন গুজরাতে ছিল, সব খুইয়ে ফিরতে পেরেছিল একা, তার ফ্যামিলির সবাই কাটা পড়েছিল—।

একথা তুমি আগেও বলেছ ইরফান।

বলেছি, বলেছি দুই ক্রিকেটার ইরফান আর ইউসুফ পাঠান ও তো গুজরাত থেকে এসেছে, কিন্তু ওর এখন ওই সব মনে পড়ছে, তাও না হয় মেনে নিত থাকতে থাকতে, আশপাশের কেউ তো খারাপ না, দুধকুমার দু'বেলা এসে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না।

জোর করে থেকে যাও ইরফান, তুমি না থাকলে ধূলিহর পল্লী কমপ্লিট হবে না, আমি তো একটা মিশন সামনে রেখে ওখানে জমি কিনে বাড়ি করেছি, তোমাকে নিয়ে গেছি।

না বিজনদা, আসলে রেহানা বলে জায়গাটা যেন মরুভূমির মতো লাগে, বলে কবরের মতো।

বিজন যেন শক খায়। কী বলছে ইরফান! কবিতা তখন চা এনেছে। চা টিপয়ে রেখে বসতে বসতে বলল, কবরের মতো কী?

ইরফান বলল, বাড়িতে তো থাকত, প্রহরে প্রহরে আজান শুনত, ওইটা ওর অভ্যেস বিজনদা, সেই খুব ভোরে, ফজরের আজান, সন্ধেয় মগরিবের আজান, তা তো শুনতে পাচ্ছে না, পরের দিনই বলল, কী নেই যেন এখানে, কী নেই, বড্ড থমথমে, নিঃশব্দে জায়গাটা, কী নেই বলো দেখি, কী নেই!

কী নেই? কবিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আজান নেই বউদি।

কবিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ইরফানের দিকে, তারপর একটু থেমে থেমে বলল, আমরা তো ফজরের আজান শুনতে পাই ইরফান।

জানি বউদি, আগেও বলেছেন।

কবিতা বলল, খুব ভোরে, তখন সব নিস্তব্ধ থাকে তো, হাওয়ায় ভেসে আসে ওই ওপার থেকে, আমার ঘুম ভেঙে যায়।

হুঁ। বিজন বলল, সুরটা কী চমৎকার লাগে, ভাল লাগে ইরফান।

ইরফান বলল, ও বাড়িতে আজান শুনেই ঘুম ভাঙত তো, তারপর রেহানা এফ এম চালাত, রবীন্দ্রনাথের গান, তারপর ক্লাসিকাল, শুনত বিছানায় শুয়ে, জগৎপুরে আজানের ডাক নেই বিজনদা!

বিজন চুপ করে থাকে। এদিকটা তো তার ভাবা ছিল না। আর এ নিয়ে যে ভাবতে হবে তাও মনে করেনি কখনো। সে থমথমে হয়ে বসে থাকল। কবিতা বলল, আমাদের এখানে মধ্যরাতেও শোনা যায়।

যায়। বিজন মাথা দোলাতে থাকে।

কবিতা বলল, সত্যিই শোনা যাবে না?

না, তবে শুনতেই হবে এর কোনো মানে আছে? ইরফান বলল।

এ তুমি কী বলছ ইরফান, ছোটবেলা থেকে শোনা ওর অভ্যেস, অভ্যেসটা

ত্যাগ করবে! সুরটা ত্যাগ করবে, তা কী হয়?

ইরফান কুণ্ঠিত স্বরে বলল, ও খুব ধর্মপরায়ণ।

কবিতা বলল, আমি কি নই? আমি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ি সুর করে করে, ওই দিন তোমার বিজনদাকে বাড়ি ফিরতে বলি বিকেল বিকেল, উনি ফেরেন না, কিন্তু আমার তো পড়তে খুব ভাল লাগে।

ও বলছে মসজিদ নেই, আজান নেই, কী করে থাকবে?

ওকি মসজিদ যায়? বিজন জিজ্ঞেস করে।

যায় না, কিন্তু মসজিদ না থাকলে আজান তো থাকবে না, আজান না থাকলে ওর মনে হবে কেউ ডাকছে না, কারো কথা শোনা যাচ্ছে না, মনে হবে..., আসলে এটা বেড়েছে সেই গোলাম সারোয়ার সুরাটে সবাইকে হারিয়ে ফিরে আসার পর।

চুপ করে বসে থাকল তিনজন। অনেকটা সময়। কবিতা পরে বলল, আমি একটা কথা বলব, আমার ছোটবেলায় আমি বর্ধমানে এসেছি মাসির বাড়ি, মাসির শাশুড়ি আমাকে খুব ভালবাসতেন, ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা, একদিন সন্ধেয় আমরা গল্প করছিলাম, কাছের মসজিদ থেকে মগরিবের আজান দেওয়া শুরু হল, সেই ঠাকমা বলে উঠল, ও বউমা, সন্ধে হয়ে গেল, দাও দাও প্রদীপ দাও—আজানের ডাকে প্রদীপ দিতেন তিনি সন্ধেয়, কী সুন্দর বলো দেখি।

বিষণ্ণ বিজন বলল, তা হলে রেহানা থাকবে না জগৎপুরে?

আমি তো বোঝাচ্ছি, ও বুঝছে না।

কবিতা বলল আমি যে তোমার মেয়েকে ভরত নাট্যম শেখাব বলেছি ইরফান।

ইরফান বলল, গোলমাল হয়ে গেল, কিন্তু রেহানা আপনাদেরও খুব ভালবাসে বউদি, নাচের কথা শুনে বলেছে কী হয়েছে, ওয়াহিদা রেহমান শিখেছিলেন, আমার মেয়েও শিখবে, শিল্পীর ধর্ম তা শিল্পই।

কিন্তু আজান না শুনলে থাকতে পারবে না? কবিতা জিজ্ঞেস করে।

না বউদি, ওর দম আটকে আসবে তাহলে।

কবিতা বলল, সেই যে বর্ধমানের ঠাকমা বলেছিলেন না, আমার এমন সুন্দর লেগেছিল, আমি ভেবেছিলাম আমাদের বাড়িতে গিয়েও তাই করব, কিন্তু আমাদের কাছে তো মসজিদ ছিল না, আজানও ছিল না তবে হ্যাঁ, এ বাড়িতে তা হয়।

হয়। চমকে উঠল বিজন, হয়, আমি তো জানি না।

বিকেলে কোনো কোনোদিন শোনা যায়, হাওয়া যদি তেমনি আসে, যে দিন শোনা যায় আমি সন্ধ্যা দিতে যাই সেই ডাক শুনে।

আমি জানি না কেন?

তুমি জানবে কী করে, তোমরা সব জানো?

ইরফান বলল, জানি না বউদি, রেহানা তো কোনোদিন মুখ ফুটে বলেনি, ও জানত সব জায়গায় আজান শোনা যায়, পার্ক-সার্কাসের বাড়ির কাছেই তো মসজিদ, আর গ্রামে তো আছেই, ওটা মুসলমান গ্রাম।

কবিতা বলল, কিছু কিছু জিনিস মেয়েদের নিজস্ব থাকে বুঝলে ইরফান, আমার খুব খারাপ লাগছে, আমি ভাবছি ধূলিহর কী করে ধূলিহর হয়ে উঠবে যদি না রেহানা থাকে, রেহানা থাকবে, রেহানার মেয়ে নাড়া বাঁধবে আমার কাছে আমি শুধু ওকেই শেখাব কাউকে না পেলে, এই যে আমি এইটা জানি, না শেখালে মরে যাব ইরফান, আমার সব যাক কিন্তু নাচটা থাকুক, আমি যেটুকু শিখেছি সেটুকু কাউকে কাউকে দিয়ে যেতে পারলে আমি তো বুঝি আমার শেখার কোনো মানে হল, আর আমার কাছে থেকে যদি এটা চলে যায়, আমি কী নিয়ে বাঁচব?

ইরফান বলল, যাবে কেন?

থাকবেই কী করে, এখানে জনা পনের শেখে আমার কাছে, আরো কতজন এসেছিল, আমি তো সিনেমার নাচ শেখাব না, চলে গেছে তা শুনে, আমি ধূলিহর গেলে একা হয়ে যাব, ভেবেছিলাম কুসুমহিয়া, তোমার মেয়েকে নিয়ে শুরু করব—বলতে বলতে মুখ থম থম করতে লাগল কবিতার। বিজনের মনে হল চোখ ফেটে জল এসে যাবে।

ইরফান বলল, বউদি ধূলিহরের বাচ্চারা শিখতে পারে না?

কেন পারবে না, কিন্তু শিখবে নাকি, কেউ আসবে না, এখন সবাই চায় অন্যরকম, তুমি টিভি দ্যাখোনা ইরফান, ফুলের মতো বাচ্চাগুলোকে নকল র‍্যাম্পে হাঁটাচ্ছে, টু পিস পরিয়ে বড়দের নাচ করাচ্ছে, সেই সব নাচের ভিতরে শুধু আদি রস, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, ওফ দেখতে দেখতে বমি এসে যায়, আমি চ্যানেল ঘুরিয়ে দিই, ওখানে ভরতনাট্যম শেখার মতো কেউ আছে, থাকবে?

ইরফান বলল, সেই মন তৈরি করবেন আপনি।

তোমরা তো থাকবে না, আমি একা হয়ে যাব যে।

জানি বউদি, আমার কিছু করার নেই, আসলে একটা কথা সত্য, আজানটা উপলক্ষ, ও ভাবেনি এমন কোথাও যাবে যেখানে আর কোনো মুসলমান থাকবে না, আত্মীয়স্বজন কেউ থাকবে না, তাহলে যদি কখনো দাঙ্গা লাগে ও যাবে কোথায়?

এটা আমরা কেউ ভাবিনি, বিড়বিড় করল বিজন, তারপর বলল, আমরা কি নেই, দুধকুমার লোকটা কি খারাপ?

কেউ খারাপ না বিজনদা, কিন্তু দাঙ্গার সময় আমিও খারাপ হয়ে যাই, আপনি ও।

আমি তুমি নই ইরফান। কবিতা বলে ওঠে।

কথার কথা বলছি, যখন সেই কতদিন আগে গুজরাতে চলছিল দাঙ্গা, তখন এখানে কি কথা শুনিনি, বিজনদা কতবার তার প্রতিবাদ করেছে বউদি, বিজনদা যে আমাকে নিয়ে একসঙ্গে জমি কিনে একজায়গায় থাকার ব্যবস্থা করেছিল সেও তো ওই প্রতিবাদে, ধূলিহর নামটা দিল বাড়ির সেই প্রতিবাদে, আমি বোঝাতে পারছি বউদি, কিন্তু এখনো আমরা পরস্পরের যোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি—ধুর আমার বলতে ভাল লাগছে না, কী খারাপ লাগছে আবার সবাইকে নিয়ে ধূলিহর ছেড়ে চলে আসব, রেহানা কাঁদছে তোমাদের পাশে থাকতে পারবে না বলে, আবার আজান না শুনে বুকটা যে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে সেই কথা বলছে ও ঘুরে ঘুরে, ছোটবেলা থেকে আজান শুনে শুনে বড় হয়েছে।

কবিতা বলল, ঠিক আছে ইরফান আর বোঝাতে হবে না।

বিজন বলল, তোমার বউদিকে এখন ধূলিহরে গিয়ে নাচ ছাড়তে হবে, কুসুমহিয়াকে দিয়ে আরম্ভ করলে প্রথা ভাঙা হতো, তুমিও ভাঙলে ও নিজেও ভাঙত, ধূলিহর গোপনে গোপনে খুব বড় হয়ে যেত, বিখ্যাত এক গ্রাম, বিখ্যাত এক নগর যে নগরের মতো নগর আর কোথাও নেই, আজান শুনে প্রদীপ জ্বালাত বাড়ির বউরা, আর ইরফানের মেয়ে জয় জয় গণপতি শুনতে শুনতে পা ফেলত নাচের মুদ্রায়, নৃত্যের দেবতার পায়ে নিজেকে সমর্পণ করত, এ দেবতা ধর্মের না ইরফান, শিল্পের।

হয়েছে হয়েছে, একই কথা বারবার বলছি আমরা, ইরফান সব জানে রেহানাও জানে, আমিও জানি, দ্যাখো ইরফান আমি এটাও জানি কী করে বাঁচতে হয়, তুমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী গল্পটা পড়েছ— সেই যে মদন তাঁতি বেনারসি বুনবে, গামছা বুনবে না!

জানি বউদি জানি।

আমি যদি কাউকে না পাই, একা একা...। বলতে বলতে কথা থামিয়ে দিল কবিতা, বলল, হাতে পায়ে খিঁচ ধরে যাবে যে ধূলিহরে, ঠিক আছে একা হবে সব, একা হবে।

একা কি হয় বউদি, অভ্যেসটাই রাখা হবে শুধু।

তাই রাখব।

তাতে আর কতটা কী হবে, মদন তাঁতির জন্য বেনারসির বোনার সুতোটা তো আনতে হবে, কত রাত্তির অন্ধকারে বসে ফাঁকা তাঁত চালিয়ে অভ্যেস

রাখবে সে? বলতে বলতে ইরফান উঠল, বলল, আমিই আসতে পারছি না, তোমরা আনবে কী করে বউদি, একা একা একাজ হয় না।

বিষণ্ণ ইরফান চলে যেতে বিজন আর কবিতাও চুপচাপ। অনেকক্ষণ বাদে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কবিতা, বলল, ভালই হয়েছে, আমাদের বাড়িতে ওরা এখন থাকলে অবিশ্বাস জন্মে যেত, ঘুম হত না তো সত্যি।

না না তা কেন?

কবিতা বলল, তাই ই, আমারই চিন্তা হয়েছিল সন্তোষ চক্রবর্তীর ব্যাপার দেখে, আমি তোমাকে বলিনি, আর তোমার তো হবেই, এটা তোমার ধূলিহর।

তোমার কি নয়? বিজন জিজ্ঞেস করল।

আমার যেটুকু তা তোমাকে ঘিরে, নিজস্ব তো কিছু নেই বিজন, আমার পৈতৃক ভিটে তো আমি তোমার মতো করে হারাইনি, আমার বাপের বাড়ি আছে, আমার দেশটা আছে, তোমার দেশটা বিদেশ হয়ে গেছে, তোমার কষ্ট আমার হবে কী করে বিজন?

বিজন বলল, আমার কোনো নিজস্ব গ্রাম নেই, নিজস্ব শহর নেই কবিতা, এক বন্ধু কাকদ্বীপে বাড়ি, কী রকম গর্ব করে বলেছিল, তার নিজস্ব এক ভূখণ্ড আছে, নিজস্ব এক দেশ আছে, নিজস্ব নদী আছে, আমার কী আছে? আমি তখন ধূলিহর গড়ার স্বপ্ন দেখি, বুঝতে পারছ তুমি, আমার ধূলিহর ওপারের ধূলিহরের মতো যে ধূলিহরকে আমি দেখিইনি, শুধু তার কথা শুনেছি, সেখানে কোনো দাঙ্গা হয়নি তবু আমার বাবা ঠাকুর্দা কাকারা চলে এসেছিল, ধূলিহরটাই তো পূর্ব পাকিস্তান ছিল না, পাশের গ্রামেই তো দাঙ্গায় মরেছিল কতজন, ধূলিহরের মানুষ দাঙ্গা প্রতিরোধ করেছিল এক সঙ্গে বসে।

কবিতা হাত রাখল বিজনে পিঠে, তাহলে কি হবে না?

কী জানি, আমি ধরতে পারছি না কাল একবার যেতে হবে জগৎপুর, বাড়িটা একা হয়ে যাবে ইরফানরা চলে এলে, কোনো বাড়ি কি একা থাকতে চায় কবিতা, মানুষ চায় মানুষ।

আট

দুধকুমার বলল, তোমার বন্ধু চলে গেল, এখন বাড়িতে কে থাকবে?

তাই তো ভাবছি।

আমার তো বাড়ি আছে, না হলে আমি থাকতাম দা'বাবু, কিন্তু তোমরা আসবা কবে, তোমাদের বাড়ি তোমরা তো আসবা।

আসব।

গিহো প্রবেশ হলো অথচ মানুষ এলনি, এডা কি ভাল হল?

কী জানি!

রেহানা বাড়িটা কী সুন্দর পরিষ্কার করে রেখে গেছে। বিজন আর দুধকুমার বসে ছিল বারান্দায় বেতের চেয়ারে। গৌড়েশ্বর ওদিক কোথায় গেছে, আসবে এখনই। বিজনের আসা তো সবার সঙ্গে একটু কথা বলে যাওয়ার জন্য। এই যে সে এসেছে, নিজের বাড়িতে বসে, ধূলিহর-এ বসে কথা বলছে এতে তার খুব তৃপ্তি। বুক ভরে যাচ্ছে। দুধকুমার বলল, তোমার বন্ধুটা ভাল, কই মুসলমান বলে আলাদা তো কিছু না।

আলাদা হবে কেন?

আমি সব সকালে এসে চা খেয়ে গেছি, তোমার বন্ধুরে একদিন এক পাত্তর খাইয়েও দিয়েছিল কী রকম গান গাইতে লাগল, কী যেন গানটা, হ্যাঁ হ্যাঁ যদি মনে পড়ে সেদিনের ও কথা, আমারে ভুলিয়ো প্রিয়ো—এ কার গান দা'বাবু?

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

বামুনের গান!

হেসে ফেলল বিজন, সব তো বামুন, কিশোর কুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা কে নয় বলো।

কেন মান্না দে, মহম্মদ রফি!

গান শোনো?

ওই রেডিওতে, এখন আমার চাঁদমণি নেই, গান শুনি, গান শুনলে ওর কথা মনে পড়ে দাদাবাবু।

যাও নিয়ে এস।

ভগবান দিলে তো আনব।

ভাল করে ডাক ভগবান কে, এসে যাবে।

ভাল করে ডাকব, ভগবান বেটারে আমি খুন করব, খুন করে জেলে যাব দা'বাবু আমি দুধকুমার মণ্ডল, আমি শুধু দেখছি আমার বউ সে ফেরত দেয় কি না।

দুধকুমার হাল্কা নেশা করে আছে। নেশা করে থাকলে খারাপ না। বেশ কথা বলে। বলল, দা'বাবু তোমার ফোন নম্বরটা দাও, তোমারে ফোন করে খবর দেব, আমার চাঁদমণিরে আমি চাই। ও কোনো অন্যায় করতে পারে না, ও বড় সোন্দর, সেদিন এমন গেয়ে উঠল তোমার বন্ধু, আমারে ভুলিয়ো পিয়ো, তারপর থেকে শুধু চাঁদমণি চাঁদমণি করছে বুকটা, তুমি কবে যাবা বলো।

কোথায় যেতে হবে?

ভগবানের বাড়ি, ভগবান মণ্ডল, আমি খবর পাচ্ছি সব, আমার চর ছড়ানো আছে, চাঁদমণি নাকি আসতে চায়, ভগবান ওরে আটকে রেখেছে।

তুমি থানায় যাও।

তা হয় না, ঘরে কেচ্ছা পুলিশ জানবে!

তাহলে নিজে যাও।

যাব তো, তোমারে নিয়েই যাব, এই জগৎপুবে একটা লোক নেই যারে মনের কথা সব বলা যায়, গৌড়ারে বলতে যাও, হারামিটা শুধু হাসবে, বলবে বউ রাখার মতো মরদ নাকি আমি নই।

বিজন বলল, ঠিক আছে আমি যাব।

বাঁচলাম, এই যে তুমি বললে এতে আমার সব হয়ে গেল, আর এক পাত্তর খেয়ে ঢোল হয়ে মাঠে পড়ে থাকব সারাদিন, এট্টা গান আছে শুনবা, শুনেছ কোনোদিন, চাঁদ মেরা দিল, চাঁদনি হায় তুম—?

শুনেছি।

আমার খুব ভাল লাগে, মনে হয় আমার গান, আবার ধরো 'শাওন রাতে যদি'—ও গান শুনলে চোখে জল এসে যায়, আবার ধরো ওই যে আকাশের গায়ে দূরের বলাকা ভেসে যায়—শুনেছ এ গান?

বাহ্! এ তো ভারি মজার লোক। আনন্দময় লোক। বলে যাচ্ছে যে গানই শোনে মনের ভিতরে চাঁদনি—চাঁদমণি ভেসে আসে। চোখে জল এসে যায়, ওই যে ধরো 'মৌ বনে আজ মৌ জমেছে...'।

এত গান শোনো।

না শুনে উপায় কী, আমার বউ চাঁদনি, চাঁদমণি তো আমারে গানই দিয়ে গেছে, রেডিওটা ওর জন্যে কেনা, ও তো নিয়ে যেতে পারত, কেন নিয়ে যায়নি, না জানত গান শুনে শুনে আমি ওর কথা ভাবব, ধরা যাচ্ছে দা'বাবু আমার কথা?

যাচ্ছে।

রেডিওটা যে রয়ে গেছে এর মানে চাঁদমণি আমার ভালবাসে, আমি কত ভালবাসি তা জানে, ভগবান ওরে বশীকরণ করেছে, বশীকরণ বোঝো, রুমাল আছে, হাজার এক টাকায় একটা, তা দিয়ে তুমি সবারে বশ করতি পারো, তবে চেরকালটা হবে না, ওর শক্তি তো ক্ষয় পায়, যখন একেবারে ক্ষয়ে যাবে তখন কোনো ভগবানের সাধ্যি নেই ওরে আটক করে রাখে।

তাহলে অপেক্ষা করো।

না, বুক হু হু ওঠে, দা'বাবু কবে যাবা?

তখন গৌড়েশ্বর এল। লুঙ্গির উপর হাফহাতা পাঞ্জাবি। তির্যক দৃষ্টিতে দেখল দুধকুমারকে, বলল, তুই এখেনে কী করছিস?

আলাপ করছি।

কীসের আলাপ?

তা তোমারে বলব কেন, তুমি কেডা?

গৌড়েশ্বর বলল, তুই নেশা করে বাড়ি ঢুকেছিস কেন?

তাতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হল?

তা তুই বুঝবি কী করে, তোর নেশার জন্য বউ চলে গেছে, যা নিজের বাড়ি যা, দাদার সামনে নেশা করে আসবিনে দুধে।

সে দা'বাবু বোঝবে, তুমি বলার কেডা গৌড়কা'?

দা'বাবু, দাদা কী বোঝে, কতটুকু জানে, তুই তারে যা বোঝাবি তাই বোঝবে, যা যা এখান থেকে ভাগ।

থমথমে মুখে বসেই তাকল দুধকুমার। একে বলে গোঁজ হয়ে বসা। তাতে গৌড়েশ্বর বেশ বিরক্ত তা ধরা যাচ্ছে। বলল, এরে এত লাই দেবেন না দাদা, দিন ভর নেশা করে থাকে।

বিজন বলল, থাক, ও তো বেশ গল্প করছিল।

গল্প করুক, কিন্তু নেশা করে এ বাড়িতে উঠবে কেন?

দুধকুমার গরগর করে বলল, বাড়িটা কি তোমার গৌড়কা?

হ্যাঁ আমার।

তোমার মানে, এডা আবার বুন ভগ্নীপতির বাড়ি।

আরে যা যা তোর বুন ভগ্নীপতি, আমি নিজে দাঁড়িয়ে বাড়িটা ওঠালাম, তখন তুই ছিলি কোথায়, এখন যে বড় বুন ভগ্নীপতি পাতাতে এয়েছিস, তাড়ি খেয়ে পড়ে থাক গে বাড়িতে।

দুধকুমারও ঠেঁঠা কম নয়। সে উঠছে না। নড়েচড়ে বেতের চেয়ারে নিজেকে আরো ভালো করে সেট করল, বলল, তুমি যদি আসতি পার, আমিও পারি, যার বাড়ি সে বলছে না, যত মাথাব্যথা তোমার।

হবে তো, সে অধিকার আমার আছে।

কী করে হল?

হল কী করে পরে বুঝবি, তিন রাত্তির আমি ভাল করে ঘুমোইনি, কেন ঘুমোইনি তা জানিস?

বুড়ো হয়েছ, ঘুম কমেছে।

চোপ শুয়ার, তুই বেরো তো এখান থেকে।

মুখ সামলে কথা বলবা গৌড়কা', আমি তোমার বাড়িতে বসে নেই, তুমি

দাদার বাড়ি দাঁড়িয়ে, দাদার মেঝেতে পা রেখে আমারে খিস্তি করছ কী করে?

বিজন এবার মাথা গলায়, থামুন না গৌড়বাবু।

না না থামব কেন, এ নেশা করে আপনার মতো মানুষের সামনে চেয়ারে বসে কথা বলছে, ওর এত সাহস, এতে কার মাথা ঠিক থাকে বলুন, আপনি ভাল মানুষ, ধুলিহরের মানুষ তাই সব সহ্য করে যাচ্ছেন, কিন্তু এটা সহ্য করার মতো ঘটনা নয়।

ও তো কিছু করেনি।

করেনি মানে, আজ যদি আপনার ফেমিলি থাকত, কী হতো ব্যাপারডা?

ও হয়ত আসত না।

আসত, ইরফান ভাইরে পর্যন্ত নেশা করিয়ে দিয়েছিল।

নেশা করা কি খারাপ? এবার আসল প্রশ্নটি করল দুধকুমার। তারপর বলল, তুমি যে ঘুমোওনি তে রাত্তির, কেন তা বললে না?

তা শুনে তুই কী করবি, যা বাড়ি যা।

কী মনে করে দুধকুমার উঠল। সন্ধে হয়ে আসছে। এই সময়টা হলো গোধূলি বেলা। কাঁধের উপর ফেলা ফতুয়ার মতো জামাটিকে পুটুলি পাকিয়ে ঘাড়ের কাছটা মুছে নিয়ে সে চলল। এক পা এগিয়েই বলল, নম্বরটা নিয়া হলনি।

বিজন তার ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে পরিষ্কার করে নাম আর ফোন নম্বর লিখে দুধকুমারের হাতে দিল। সমস্তটা দেখল গৌড়েশ্বর। দুধকুমার চলে যেতে বলল, এটা ঠিক করলেন না।

ও যে চাইছিল।

আমার কাছ থেকে নিতে বলতেন দাদা, ও এই নম্বর কতজনকে দেবে জানেন, আপনার নম্বর ছড়িয়ে যাবে।

তাতে কী হবে?

এখন বোঝা যাবে না, পরে বোঝবেন, হ্যাঁ যেটা বলছিলাম, ওই যে তে রাত্তির প্রায় ঘুমোইনি, কেন জানেন?

কেন?

গৌড়েশ্বর বলল, আপনার এই বাড়ি, এ বাড়িতে আপনার টাকা আছে বটে, কিন্তু আমি তো দাঁড়িয়ে থেকে করেছি, তার কী মূল্য নেই!

আছে। কথাটা ঠিক ভাল করে বলতে পারল না বিজন। বুঝতে পারছিল না লোকটা কোন দিকে যেতে চায়। তার কাছে অস্পষ্ট সমর্থন পেয়ে গৌড়েশ্বর বলল, আপনার ওই ইরফান চলে যাওয়ার পর আমি ঘুমোই কী করে, এমন জানালা দরজা, ভিতরে খাট, দাদা জানালাগুলো অত দামের কাঠের করলেন,

আমার ভয় যদি রাত্তিরে খুলে নিয়ে যায়, এ বাড়িতে যে কেউ থাকে না তা তো সবাই জানে।

হতে পারে?

হতে পারে মানে, তাই তো হয়, খালি বাড়ি কি নিরাপদ, মোটেই না, আমি ছয় সেলের টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাঝরাত্তিরে একবার করে পাক মারি, দেখেওছি।

কী দেখেছেন?

লোক, তাহলে কী বলছি। এত কষ্টের বাড়ি আপনার, আমারও কষ্ট ছিল, ওটা না হয় বাদই দিন, ভাবছি আমি থাকতে যদি কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে দাদার কাছে মুখ দেখাব কী করে?

বিজন চুপ করে থাকল। কথাটা মিথ্যে মনে হচ্ছে না। তার সহকর্মীরাই তো বলছে বাড়ি খালি ফেলে রাখলে নষ্ট হয়, আর দরজা জানালাই বা থাকবে কী করে? খুলে নিয়ে যাবে। সেই কথাই বলছে গৌড়েশ্বর। চোর তো ঘুরছে। আর একটা ব্যাপার হল বন্ধ জানালা দরজার ভিতরে বাড়িটা নিজে নিজেই নষ্ট হবে। প্রতিদিন খোলা জানলার হাওয়া দরকার। ও হল বাড়ির অক্সিজেন। মেঝে মোছার দরকার, মানুষের গলার স্বর দরকার—এসব না হলে বাড়ি যাবে।

আমি তো এখন আসছি না।

আসবেন কী করে, আপনি কি এসে থাকতে পারবেন, বউদি কী পারবে, পারবে না আমি জানি।

তাহলে বাড়িটা করলাম কেন গৌড়বাবু?

ধূলিহর করার জন্য, কী সুন্দর নাম ধূলিহর।

শুধু কী তাই, ধূলিহরে তো থাকতে হবে।

আসবেন, বড় লোকের তো বাগানবাড়ি থাকে।

না না তা নয়, আমাদের তো নিজস্ব কোনো বাড়ি নেই, গ্রাম নেই, শহর নেই, ভেসে বেড়ানো মানুষ, থাকব বলেই তো করা।

ধুস কলকাতা থেকে এখেনে আসা যায়?

যায় না?

না যায় না, বউদির নাচের মাস্টারি হবে এখেনে?

কে বলল গৌড়বাবু।

ইরফান ভাই, ওর কাছে আমি সব জেনেছি, নোতন বাড়িতে যখন মুসলমান তুলতে পেরেছেন, তখন আপনি সব পারবেন, বাড়ি করেও ফেলে রাখতে পারবেন, সেই জন্যেই করা।

তা হলে কী করব আমি?

কী করবেন, বাড়িটা করেছেন যখন রক্ষা তো করবেন।

কী করে রক্ষা করব, আমি তো প্রতি সপ্তাহে আসতেও পারব না।

দেখুন দাদা, গৌড়েশ্বর একটু থেমে থেমে বলতে লাগল, খালি বাড়ি যদি দখলও হয়ে যায়, তখন?

কে দখল করবে?

কেউ না, কিন্তু সব রকম তো মাথায় আনতে হবে, ওই দুধকুমার কী কারণে ফোন নম্বর নিল তাই বা কে জানে?

বিজন চুপ করে থাকল। গৌড়েশ্বরও। একটু পরে গৌড়েশ্বর বলল, চাবিটা যদি আমাকে দিয়ে যান, আমি তো রাত্তিরে শুতে পারি, আমিও নিশ্চিন্ত আপনিও, না হলে আমার ঘুম হবে না দাদা, এ বাড়ির কোনো ক্ষতি হলে আপনার যেমন আমারও তেমন, বুকে শোল বিঁধবে, আমিই সবদিন পরিষ্কার করাব, জানালা খুলব, আলো হাওয়া ঢোকাব, বুঝতে পারছেন দাদা?

নয়

কবিতা জানত না। বাড়ি ফিরে বিজন বলেনি। প্রস্তাব দিয়ে গৌড়েশ্বর বাড়ি থেকে চা বিস্কুট এনে বিজনকে দিল। তারপর দিল কী একটা সিগারেট যা কিনা বিজন আগে দ্যাখেনি। এই জগৎপুর ধূলিহরেই মেলে ন্যাশনাল সিগারেট। ফিল্টার টিপড বটে কিন্তু খুব কড়া। বিড়ি বিড়ি ভাব ভিতরে। হতেও পারে সেই মশলা দিয়ে পাকানো। সিগারেট টানতে টানতে খুব সুখ হলো বিজনের। মনে হচ্ছিল একশো বছর আগের ধূলিহরে বসে আছে, বলেছিল, গড়গড়া পাওয়া যায় এখন?

আপনার দরকার দাদা?

হলে তো খারাপ হত না, ভুড়ুক ভুড়ুক টানতাম।

সে ব্যবস্থা আমি করে ফেলছি, হাটগাছায় ভাল হুকো, অম্বুরি তামাক পাওয়া যায়, ছোটবউমা ভাল হুকো সাজতে পারে, ওর বাড়ি তো দখিনে, ওর ঠাকুর্দা এখনো গড়গড়া খায়, সব আছে দাদা, আপনি বললেই হয়ে যাবে, আজ না আসেন, ভবিষ্যতে তো আসবেনই, দেখবেন এই গৌড় কী ভাবে সেবা করে আপনার, বউমা, ও বউমা।

বউমা এসে দাঁড়ায়। রোগাটে ছোটখাট গাঁয়ের বউটি। তবে এর মাথায় ঘোমটা নেই, সিঁথিতে ভাল রকম সিঁদুর। মুখখানিতে সব সময় হাসি, বউমা বলল, গড়গড়া আমি এনে দেব আমার বাপের বাড়ি থেকে।

গৌড় বলল, ঘরগুলো একটু ঝাঁটায়ে দাও দেখি, তারপর জল ন্যাকড়া

দিয়ে টেনে টেনে মোছ, যত মোছা হবে মেঝে ততো চকচকে হবে।

করব, চাবিটা উনি দিয়ে যাক।

চাবি দাদা রেখে যাচ্ছে, এটা নিজের বাড়ির মতো মনে করবা, এমন একটা মানুষ তোমাদের সহায় হলো, শত জন্মের পুন্যি।

চা খেয়ে বিড়ির তামাকের সিগারেট টেনে চাবির গোছাটি সে তুলে দিল গৌড়েশ্বরের হাতে। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। তালা তো কম নয়। দুটো ঘরে দুটো করে তালা। পিছনের গেটে তালা সিঁড়ি আর ছাদের দরজায় তালা। মেইন গ্রিল গেট আর দরজায় তালা। গৌড়েশ্বর চাবি নিয়ে পকেটে ফেলে বলল, আজ থেকে আমার ঘুম হবে, আমিই শোব এ ঘরে, কেউ এ বাড়ির ধারকাছ মাড়াতে পারবে না।

কথাটা বিজন কবিতাকে বলেনি। জগৎপুর থেকে ফেরার পথে খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এটা সে কী করল? ইরফানকে চাবি দেওয়ার কথায় মত দিয়েছিল কবিতা, ইরফান নিশ্চিত সন্তোষ চক্রবর্তীর মতো হবে না। কবিতার অ্যাসেসমেন্ট যে ঠিক ছিল তা পরে বোঝা গেছে। কিন্তু গৌড়েশ্বর। নতুন বাড়ির চাবি ওকে দেবে কেন? ইস! এ ও কি আমতলির বাড়ির মতো হবে। ব্রহ্মশাপ! ব্রহ্মশাপে ভিটে বাড়ি চলে যাবে? ধুস! পরের সপ্তা'য় এসে চাবি নিয়ে নিতে হবে। কিন্তু তাহলে তো বাড়ি অরক্ষিত থাকবে। দরজা জানালা একটা একটা করে চলে যাবে।

কবিতা জানল দু'দিন বাদে সক্কালবেলায় দুধকুমারের ফোনে।

তখনো কলকাতা জাগেনি ভাল করে। তাদের ফ্ল্যাট বাড়ি তো নয়-ই। ভিতরের নীলচে অন্ধকার তখনো কাটেনি ভাল করে। বিজন রাত জাগে বই নিয়ে, তার দেরি করে ওঠা অভ্যাস। কবিতাও বিজনের সঙ্গে থাকতে থাকতে ওই অভ্যেস পেয়েছে। ভোরের দিকে আচমকা এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিয়েছিল। বর্ষা কলকাতায় ঢুকবে ঢুকবে করছে। বাতাসে বৃষ্টি বৃষ্টি গন্ধ ও লেগেছে প্রায়। বাজারে ওঠা হিমসাগর ফুরিয়েছে, বেনারস থেকে ল্যাংড়া আম আসতে আরম্ভ করেছে। লিচু নেই। ওল ওঠেনি। কচুরমুখী নিয়ে এসেছে বিজন গতকালই। ঠিক এমনি এক সময়, এমনি দিনের এক ভোরে ল্যান্ডলাইন এমন তারস্বরে ডাকতে লাগল দু'জনকে, ও দা'বাবু ও বড়দি!

কবিতা ফোন তুলল প্রায় আতঙ্কিত হয়ে। তুলতেই ওপার থেকে দুধকুমারের গলা, ও বড়দি, এখনো ঘুমাচ্ছ, এত বেলায়?

কে?

আবার কেডা দুধে, দুধকুমার, ভুলে মেরেছ!

দুধকুমার, জগৎপুর?

তাই ই বটে, তা দা'বাবু কই, তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।

ঘুমোচ্ছে।

কখন সকাল হয়েচে, এখনো ঘুমাচ্ছে, ঠিক আছে ঘুমুতিই দাও, বলছি এডা কী হল বড়দি?

দুধকুমার সব রিপোর্ট করল। গৌড়েশ্বর তার বাড়িতে ঢুকে খাটে শুয়ে পা নাচাচ্ছে, শালারে চাবি দে এয়েচে দাদাবাবু! আমারে একবার জানাল না, ওনার বাড়িতে গৌড় কেন ঢুকবে?

কবিতা ঠান্ডা মাথায় সব জেনে নিয়ে বলল, ঠিক আছে দুধকুমার আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।

হ্যাঁ নেও, কতবড় সাহস তোমার খাটে শোয়, হারামির বাচ্চা।

থাক দুধকুমার।

না না না, ও আমার সব্বোনাশ করেছে, দা'বাবুরে আমার যে দরকার বড়দি, না তোমারে বলা যাবে না, পেইভেট কথা।

কথা বলতে বলতে ফোনটা কেটেও গেল। বিজনকে তাই উঠতে হল না, কিন্তু কবিতা তাকে টেনেই তুলল, কী করেছ?

না না কী আছে, চাবি নিয়ে নেব এই সপ্তায়।

চাবি দিলে কেন, ও তো ঘরে ঢুকে পড়েছে।

ঢুকে পড়েছে মানে, ওর তো বাড়ি রয়েছে সামনে।

সেখেনে থাকুক, বাড়ি থেকে বের করে দাও, আজকেই যাও।

কিন্তু বাড়িটা পাহারা দেবে কে?

কবিতা বলল, দরকার নেই, বাড়ি তো তুলে নিয়ে যাবে না কেউ, তুমি ওকে বের করো আগে।

কী ব্যাপার যে ঘটল! না না হবে না, সন্তোষ চক্রবর্তীর তো থাকার জায়গা নেই, এ তো তার বাড়ি উল্টো দিকেই রয়েছে প্রায় দালান কোঠা নিয়ে। মাথাটিতে শুধু অ্যাসবেস্টসের ছাউনি, তা বাদে দেওয়াল মেঝে পাকা। ইলেকট্রিক আছে, গ্যাস আছে, টিভি আছে, বরং দুধকুমার সর্বহারা। তার থাকার মধ্যে আছে নাকি ওই একখানি রেডিও। আর কিছু জমানো টাকা, তার সুদ পায়। সে টাকা এসেছে ওপারের টাউনে জমি দিয়ে। সুদের টাকায় দিব্যি চলে যায়, খাওয়ার কেউ ও তো নেই ঘরে। কিন্তু তার ঘরে টালির ছাউনি। মেঝে পাকা নয়। দালানে ঢুকতে পারলে সে হয়ত বেরোত না।

না বেরোত! কবিতা বলল, লোকটা খারাপ না।

সেদিন আবার ফোন করল দুধকুমার। এবার ধরল বিজন। দুধকুমার বলল, তোমার পাঁঠা তুমি ন্যাজে কাটবা না ধড়ে কাটবা তা তুমিই বোঝ, ও নিয়ে আমার বলার কিছু নেই, তবে ওডা যে ঠিক হয়নি তা আমি দিদিরে বলে

দিইছি, এখন যাবা কবে?

কোথায়, জগৎপুর?

না না, ভোজেরহাট খোদহাটি, ওখেনেই আছে শুনা যায়।

যাব, গেলেই হয়।

গেলেই হয় না দা'বাবু, চলো, তুমি গেলে ভগবান বোঝবে কারে নে গেছি, ওর বশীকরণ ফুহ্ হয়ে যাবে।

কবে?

কাল চলো।

কাল, কাল তো অফিস।

অফিস কামাই করো চলো, তোমার তো গরমেন অফিস, গেলেও বেতন, না গেলেও বেতন।

আমি তো জগৎপুর যাব।

না একথা জগৎপুরে হবে না, তোমারে গৌড়া খেয়েচে, আমারে অডার করে, ওরে আমি ঘর থে বের করে দিচ্ছি একদিনেই।

না না ওতো পাহারা দিচ্ছে।

কী আছে যে পাহারা দেবে?

জানলা দরজা।

ফুহ্! ওসব খুলতে গিয়ে মরবে নাকি, ধরা পড়ে যাবে না, ওসব গৌড়ার ভোগলামি, থাক গে, আজ এস না, কাল কামটা সেরে আসি তারপর আমিই ব্যবস্থা করব তোমার।

কী ব্যবস্থা না বউ ফেরত আনলে গৌড়েশ্বর মণ্ডলও চুপ করে যাবে।

এখন তো ওই নিয়ে দিনরাত থেঁতো করে তাকে। চাঁদনি-চাঁদমণি ফিরে আসুক, তাড়ি ছেড়ে দেবে দুধকুমার। ইমারতির ব্যবসা করবে। দালান হাঁকাবে। শুধু চাঁদনি এলেই হবে। আসলে এটা কী দা'বাবু বুঝছে না, কোনো পুরুষ মানুষের বউ যদি আর একজনের সঙ্গে ভেগে যায় সে লোকের কী হয়? তার সব জোর চলে যায়। সব তাকত চলে যায়। মুখ তুলে কথা বলার ক্ষমতা চলে যায়। আর তা হয়েছে বলে গৌড়েশ্বর মণ্ডল তাকে অপমান করতে পারছে। তাকে দিনরাত লাথি মারতে পারছে। চাঁদনি ফিরে আসুক, সে কী হয়ে ওঠে গৌড়েশ্বরই দেখবে। আসলে দাদাবাবু কি জানে না মেয়েমানুষেই সব শক্তি।

শুনতে শুনতে বিজনের মনে হল সে জগৎপুর ধূলিহরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে সত্যি। ধূলিহরে ও কি এইসব হয়নি। মায়ের মুখে কি এক সময় শোনেনি যে তার ঠাকুর্দা সালিশিতে বসতেন। কার বউ রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়ে

উঠেছিল, সে এসে ঠাকুর্দাকে ধরলে তাঁকেই না যেতে হতো প্রতিবেশীর বউ উদ্ধারে। এসব এখন উঠে গেছে। এখন কোর্ট কাছারি থানা পুলিশ। আর যদি সালিশিও হয় তা হয় দালাদলির। সালিশি করে কাউকে ডাইনি সাজানো হয়— বিজন বলল, যাব।

সময় ঠিক হয়ে গেল। দুধকুমার চলে আসবে বেলা দেড়টা নাগাদ। বেলাবেলি যাওয়াই ভাল। তাকে তো খোদহাটির লোক চেনে। ভগবান মণ্ডলের সঙ্গে কতবার গেছে সেখানে। তখন তো ভগবান তার স্যাঙাত। একবার কী হল ভগবান তাকে নেমতন্ন করে নিজেই ভুলে মেরেছিল, কী হয়েছে শোনো দা'বাবু।

দাদাবাবু আর দুধকুমার এখন যাচ্ছে খোদহাটি। শিয়ালদায় এসে ভাঙড় বানতলা লাইনের বাসের জন্য দাঁড়িয়ে। বক বক করে যাচ্ছে দুধকুমার। তার গায়ে একেবারে টকটকে হলুদ রঙের শার্ট। তার কালো রঙের প্যান্টে সেই শার্ট গোঁজা। চোখে সানগ্লাস ছিল। এখন আকাশে মেঘ আসায় তা খুলে রেখেছে। দীর্ঘদেহী, সবল মোষের মতো মানুষটার পাশে আকৃতিতে বিজন খুব বেমানান। দুধকুমারকে সবাই দেখছে। কলকাতা শহরেই এমন মানুষ বুঝি বিরল। বিজন জিজ্ঞেস করল, তুমি গেলে নেমতন্ন খেতে, তারপর?

সে তো নেই, রাতি বাড়ি ফিরে বউ-এর কাছে শুনি সে এয়েছিল।

বিজন হাসল। কথা বলল না। দুধকুমার বলল, দা'বাবু, আজ আমার বউকে কি আনা যাবে?

সে যদি আসে।

না এলে জোর করে হবে না?

কী করে হবে, অন্য জায়গায় যাচ্ছ। বলে বিজনের ভয় ভয় করে। কোন কাজে কী করতে যাচ্ছে সে? এসব কাজে জড়িয়ে পড়লে কি তার মান থাকবে? সে হল কলকাতা শহরের নাগরিক। তার আচার-আচরণ প্রকৃত নাগরিকের মতো। তার গায়ে সুভদ্রতার চিহ্ন নানাভাবে জড়িয়ে। সে কিনা দুধকুমারের বউ উদ্ধারে যাচ্ছে। দুধকুমার বলছে, বউটা তার, বিয়ে করার সময় চাঁদমণির বাপের কাছ থেকে এক পয়সাও নেয়নি। নেবেই বা কী করে? ওর বাপের যা ছিল সব নদী খেয়েছে। নদী খেয়েছে মানে? হোগল হোগল, হোগল-কর্তালের নাম শোনেনি দা'বাবু।

না তো? সে কোথায়?

কেন বাসন্তীর হোগল নদী, এখন বিরিজ হয়ে গেছে শুনেছি, হোগলের সঙ্গে জুড়েছে কর্তাল নদী, তারপর বিদ্যে নদী। সে কত বড় গাং দা'বাবু, গাংই খেয়েছে ওদের ভিটে, কুমিরে টেনেছে ওর মারে, মীন ধরত কিনা, কেষ্টপুর খাল পাড়ে তিন মেয়ে নিয়ে ওর বাপ এসে উঠেছিল, আমি ছোটটারে যখন

উদ্ধার করি, বাপ ঘরে শুয়ে, ও সললেকে পাঁচবাড়ি কাজ করে বাপরে খাওয়ায়।

বোঝা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে সব। কবে ভেবেছিল বিজন এহেন দুধকুমারের সঙ্গে চাঁদমণি-চাঁদনিকে উদ্ধারে যাবে। আজ দুধকুমার পণ করেছে তার জিনিস সে নিয়েই আসবে। ওর বাপের হাতে কিছু টাকা দিয়ে তবে মত করিয়েছিল। তারপর রুগ্ণ শ্বশুরকে মৃত্যু অবধি রেখেও ছিল। তবে তা দিন পনেরো মাত্তর। যে টাকা নিয়েছিল সে টাকা আবার দুধকুমারই পায়। দুধকুমার চাপা গলায় গরগর করছে, আমার বউ আমি ফেরত আনব, ভগবান কী করে দেখি।

সে কি আসবে?

আসতিই হবে, সে তো আমার বউ, আমার ঘরে থাকবে।

যখন ভোজেরহাটে নামল তারা, বিকেল। এবার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল দুধকুমার। পথ সে ভাল চেনে। কিন্তু পা যেন সরছে না। কাঠের ব্রিজ দিয়ে খাল পার হয়ে সরু পথ দিয়ে এগিয়ে বড় একটা খোয়া ফেলা রাস্তায় পড়ল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে, দুপাশে গাছগাছালি, ঝোপঝাড়, মানুষজন, ঘরে ফেরা গরু বাছুর, গাছে ফেরা পাখপাখালির ডাক ফেলে রেখে একটা সময় পৌঁছল। পৌঁছতে তো হবে, নইলে আসা কেন? সে গেরস্তবাড়ির চারপাশে লতাগুল্মের ঝাড়। উঠোনটাও পরিষ্কার নয়। সেখানে তুলসীমঞ্চ আছে, তার উপরে তুলসী গাছটি জল না পেয়ে পেয়ে মরেই গেল প্রায়। দেখে বিজন বসুর মনে হল জল দেয়। তাদের ধূলিহরের পৈতৃক ভিটে প্রায় এই রকম ছিল হয়ত। বিজন আকাশে তাকায়। সন্ধে হয়ে আসছে। আকাশ খটখটে পরিষ্কার। জল নামার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাহলে এ গাছের কী হবে?

দুধকুমার তার গা টিপল, ডাক দেও দা'বাবু।

তুমি ডাকো।

আমার ভয় করে, তুমি ডাকো না চাঁদনি বউ বলে।

আমি কী করে ডাকি?

ডাকতে হল না। ভিতর থেকে যে বেরিয়ে এল, সে তো কালো ভ্রমর। নিকষ কালো রঙের ভিতরে রূপখানি যেন দাউ দাউ আগুনের মতো জ্বলছে। লাল ব্লাউজ, ডুরে শাড়ি, মাথায় কাপড় নেই। সে আঁতকে উঠে বলল, তুমি!

হ্যাঁ আমি রে চাঁদনি, আর কতকাল থাকবি এভাবে?

তুমি এলে, আসতে পারলে। সে কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে। আঁচল চাপা দিল মুখে। বিজন থমথম করছিল। দুধকুমার এগিয়ে যাচ্ছিল। বউ আঁচল থেকে মুখ নামিয়ে বলল, লোকটা তার পাপ ভোগ করছে, দেখবা? এই ইনি কেডা, এ বাবুটি?

দশ

বারান্দায় বসে আছে বিজন। তার ভিতরে এলোমেলো বাতাস উঠেছে। আহা কী দেখিলাম, জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না। বিজন মনে মনে বলে, ছিঃ! সে কি না দুধকুমারের বউ ফেরাতে এসেছে, এখন এসব কী হচ্ছে মনের ভিতরে? সে রাম রাম রাম করতে থাকে। রাম নামে মনের বিক্ষেপ যায় বুঝি? বাইরে এসেছে চাঁদনি। এমন মেঘের মতো রঙ, ভরা মেঘের মতো ঢলো ঢলো শরীর, এমন মেঘের মতো সজল মুখখানি, সে এতসব নিয়ে তার কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি কী করব বলুন দেখি দাদাবাবু, আমি এখন কী করব?

বিজন হকচকিয়ে গেল। দাঁওয়ার বাঁশের খুঁটিতে পিঠ লাগিয়ে কালো চাঁদের আলো চাঁদনি বলল, আপনের পরিচয় পেয়েছি, আপনি ছাড়া গতি নাই।

বিজন কোনোক্রমে বলল, দুধকুমার কই?

ভিতরে দুই স্যাঙাতে হাত ধরে কানছে, কিন্তু আমি কী করব দাদাবাবু?

বিজন মনে মনে বলল, যদি ক্ষমতা থাকত তোমায় কিছু করতে হাত না কালো শশী, আমিই সব করতাম। মুখে বলল, যা করবে ঠিক করো, জগৎপুরে চলো, দুধকুমার তোমাকে এত ভালবাসে।

চাঁদনি বলল, তা কি আমি জানি নে! কিন্তু ওর স্যাঙাত ভগবান ও যে আমাকে ভালবেসে পাগল, আমি এখন কোনদিকে যাই দাদাবাবু?

বিজন দেখছিল অন্ধকার নামছে। ভোজেরহাট থেকে শেষ বাস সাড়ে আটটায়। অনেক দেরি। ভিতরে দুধকুমারের গান। চাঁদনি বলল, ওর স্যাঙাৎ ভগবান এক্সিডেন্টে হাত পা ভেঙে বিছানায় পড়ে আছে দাদাবাবু, প্রাণে বেঁচেছে আমার কপালে, না হলে বাঁচার তো কথা না, চলন্ত বাস খালে পড়েছিল, এবার বোঝো।

বিজন শুনছিল দুধকুমার গাইছে ব্যান্ডের গান, তোমার দেখা নাইরে তোমার দেখা নাইরে..। অদ্ভুত! এখন তো ভগবান নড়তে পারবে না, এখন চাঁদনিকে নিয়ে জগৎপুরের উদ্দেশে রওনা হলেই হয়।

চাঁদনি বলল, তুমি কিছু বলো দাদাবাবু।

আমি কী বলব?

বলতি হবে, ইদিকে এস, আমি তুমারে সব বলি, আমি তুমার পাকা দালানের কথা শুনেছি দাদাবাবু।

কে বলল?

কেন তোমার দুধকুমার।

কবে বলল?

আগের দিন, তুমি ইদিকে এস, ওরা কথা বলুক, বারান্দায় ভাল করে বলা যাবে না আমার দুঃখ।

বিজন ভাবল কেন উঠবে? অমন বজ্র বিদ্যুৎ ভরা মেঘ, চোখে চোখে রুপোলি রেখা কাটছে। কখন যে ডেকে উঠবে আকাশ মাটি কাঁপিয়ে। সে উঠল, বলল, তুমি দুধকুমারের বিয়ে করা বউ, ফিরে যাও।

তুমি এস না এদিকে দাদাবাবু, আগে কথাগুলো কয়ে নিই।

বিজন উঠল। তার মাথা শূন্য হয়ে গেছে। এমন চাপা গলায় কে কাকে ডাকে?

ডাহুক ডাহুকিকে ডাকে, বাঘিনী ডাকে বাঘ। এ ডাক সে চেনে। উঠোনে নেমে হাতছানি দিচ্ছে। বিজন উঠোনে নামতেই সে চলতে লাগল। ঘুরে ভিটের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, আস দাদাবাবু, তুমি নতুন দালানের মালিক, কলকেতার লোক, আমি কী করি দাদাবাবু?

ওর সঙ্গে ফিরে যাও।

আর লোকটা! এর কী হবে?

সবার কথা ভাবতে হবে না, এই কথা বলার জন্য ডাকলে?

আরো কথা শুনবা? ঝপ করে তার সামনে মেঘের নিঃশ্বাস পড়তে লাগল, বলল, দাদাবাবু, তুমার কথা কত শুনিচি, তুমার বাড়ি উঠার সব খবর আমি জানি, কতটা উঠল, জানালা দরজা ফিট হলো, মেঝে মোজাইক হলনি, লাল হলো, কালো বর্ডার হল, তোমার বাড়ি করার সময় ওই ইট সিমেন্ট আর বালি নিয়ে গৌড়াকা' তার বাথরুম করে নিল, তুমার বাড়ির ছায়া পড়েছে মোদের জমিনে।

বিজন অবাক। শিহরিত। কী করে জানল সব? ওই যে বলছে বাড়ির নাম হল ধূলিহর। মানে ধুরোল, ধুরোল সে জানে। কী করে জানে? না তার মায়ের বাপের বাড়ি ছিল, মানে তার মামা ঘর। মা শুধু ধুরোল ধুরোল করত। ধুরোল-ধূলিহর কটা থাকতে পারে? সাতক্ষীরের কাছে একটাই তো ধুরোল। বলে সে আরো এগিয়ে এসে ঝপ করে তার হাত ধরে ফেলল, আমি কী করব দাদাবাবু?

হাতটা ছাড়িয়ে নিল বিজন, জিজ্ঞেস করল, দুধকুমার আসে এ বাড়িতে?

না এসে পারে, দশদিন, বিশদিন পরে পরে কখনো আসে।

ভগবান জানে?

জানে, এখন জানে তো দেখছ।

আগে জানত না?

জানত, বলত তুই ওরই তো বউ, আসুক না, তবে ওরে কিছু দিবিনে,

এসে বসে বসে ফিরে যাক, বলো দাদাবাবু তা কী হয়?

কান গরম হয়ে গেল বিজনের। শরীরে ঝিলিক মারল। সে পিছিয়ে গিয়ে বলল, তখন কথা শুনতে আমার বাড়ির?

হাঁ যত শুনি তত ভাবি দাদাবাবুরে কবে দেখব।

কী দেখলে?

যেমন ভেবেছিলাম, তার চেয়ে বেশি, ও দাদাবাবু দাদাবাবু! বলতে বলতে তার গায়ে এসে পড়ল চাঁদনি, কালো চাঁদ, বলল, ওরা দুটোতে কথা বলুক, আমরা পলায়ে যাই।

পাগল! আমি তোমাকে কোনোদিন দেখিইনি, পালাব কেন, আমার ফ্যামিলি নেই, বউ বাচ্চা?

সব রেখে চল। তার হাত ধরে ফেলল চাঁদনি।

ওফ! কেন এখেনে নিয়ে এল আমাকে! বিজন বিড়বিড় করে বলল।

দাদাবাবু কিছুতেই তোমার আনবে না এখেনে, শেষে আমি বললাম তুমার দাদাবাবুর কাছে শোনবো তুমি কেমন হয়েছো, সে যদি তুমার পক্ষে কথা বলে আমি যাব, দাদাবাবু যেমন ভেবিছিলাম তুমি তার চে' বেশি।

ঠিক আছে যাও।

যাব তো, তুমি এত ডরাও কেন?

দুধকুমার বেরিয়ে আসবে।

কিছুতেই না, আমি বলি আলাম দাদাবাবুর কাছে সব জানি, তুমি যদি বলো ফিরতে আমি ফিরি, দাদাবাবু ফিরব? চাপা গলায় ফিসফিস করল দুধকুমারের কালো বউ। কালো ভ্রমরা।

ফেরো।

তুমি আমার গা ছুঁয়ে বলো।

হাত স্পর্শ করল বিজন, ফেরো।

না, না, গা ছুঁয়ে বলো।

বিজন বলল, না, বলেছি তো।

না বলছি, ও টুকুনে হবেনি, ভালো করে বলো, কতদিন ধরে ভেবেচি এই সন্ধে কবে আসবে, আমি তুমার বাঁশি শুনেছি কালা, তুমি আমারে এই দেখা দিলে হে কিষনো, ওরা দুটাতে গলা জড়াজড়ি করে থাকুক, তুমি আমারে লিয়ে পলাও, যমুনা পার হঁই যাও, বেন্দাবন থেকে চলি চলো হে কিষনো, তুমার ধুরোলে চলো কেউ খুঁজে পাবেনি।

বিজন বলল, থাক হয়েছে, যাও ঘরে যাও।

না যাবনি, তুমার ভয় করছে?

ভয় করবে কেন?

করছে, তুমার সাহস নাই মরদ, কিন্তু ধুরোল বসাতি যাচ্ছ জগৎপুরে, এই দাদাবাবু মোর গা ছুঁয়ে বলো।

গা না ছুঁলে হবে না?

না হবে না।

গা ছুঁলে কী হবে?

যা হবার তা হবে।

বিজন ডাকছিল, দুধকুমার।

ঝপ করে এসে তার মুখে হাত চাপা দিল দুধকুমারের বউ, বলল, তুমি বেটাছেলে না পুরুষমানুষ, দাদাবাবু আমি তোমার জন্যি মরব।

কী বলছ তুমি!

যা বলছি সত্যি বলছি, যেদিন বাঁশি শুনেছি দাদাবাবু, ওই দুধে, দুধকুমার যেদিন থেকে ধুরোল তাঁর দাদাবাবুর কথা শুনাল, সেদিন থেকে মন নাই ঘরে, ভগবানে মন নাই, ভাবি তুমি কবে আসবা, দুধকুমাররে বলে বলে এই আনা করালাম, এসেছ যখন দাদাবাবু আমি তুমারে ছাড়বনি।

কী সব্বোনাশ! সব্বোনাশ যে হয়ে যাচ্ছ তার তা বিজন টের পাচ্ছে। কুল নেই মান নেই চেনা নেই জানা নেই, কোনোদিন এর কথা দুধকুমারের কাছে তেমন শোনেওনি, আর যা শুনেছে তা অন্য কথা। স্বামী ছেড়ে পর পুরুষের হাত ধরে যে, সে আর কীসের ভাল? তো সেই চাঁদনি, চাঁদমণি কিনা বলছে দুধকুমারের কাছে যেদিন শুনেছে কলকাতার বাবু বিজন বসু ধূলিহর নামে এক বাড়ি করতে জগৎপুরে আসছে, সেদিন ওই ধূলিহর আর বিজন দুইই তার কাছে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো আছড়ে পড়েছে। সমুদ্রের জল ফিরে যায়, এ আর ফিরছে না। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাবু সম্পর্কে সব জেনেছে দুধকুমারের কাছে। বাড়ির কথাও জেনেছে। কোন ভাঁটার ইট তাও জানে সে। কিন্তু বিজন তো বুঝতে পারছে না দুধকুমার এখানে এল কবে? আবার জিজ্ঞেস করে, আসে? যোগাযোগ আছে?

আছে, আছে, খুব আছে।

ভগবান তা জানে?

জানে জানে খুব জানে।

কখন আসে দুধকুমার?

কেন সকালে বেরিয়ে দুপুরে, তারপর বিকেলে চলে যায়।

এটাও ভগবান জানে?

কেন জানবে না, আমিই তো বলি।

তুমি তাহলে কার বউ?

এগিয়ে এল চাঁদমণি, কালো ভ্রমরা, বলল, বলব?

বলতেই তো জিজ্ঞেস করেছি।

সত্যি করে বলব?

আহা সরে দাঁড়াও।

বলছি বাবু, আমি তোমার ছোট—

বিজন ছিটকে সরে গেল। শেষ শব্দটা শুনেছে কি? নাকি ও উচ্চারণ করতে গিয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখে নিজের কথা নিজেই আত্মসাৎ করেছে। বউ! বিজন বলল, তুমি যাও, যাও বলছি।

কোথায় যাব বলো, আজ তোমারে প্রথম দেখে আমার খুব সাধ হয়েছে তুমি আমার মাথায় ঘোমটা তুলে দাও, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে?

বিজন শিহরিত হচ্ছে। ঘনায়মান সন্ধ্যা তাকে যেন আবিষ্ট করেছে। বিজন বলল, না, আমি চলে যাই, তুমি বলে দিয়ো।

না যাবে না। বলে তার হাতটি ধরে ফেলল দুধকুমারের বউ, বলল, আমি যে তোমার কথা বলে বলে ওরে দিয়ে তোমারে আনা করালাম এখানে তা ওরা জানে, হে কিষনো, হে কালাচাঁদ তুমি চলে গেলে আমি মরব, মরবই।

বিজন বসু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল দুধকুমারের বউ। তার গা দিয়ে বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ ফুটে বেরোচ্ছে। তাদের মাথার উপর একটি দুটি করে তারা ফুটছে।

অনেক বাদে বিজন বলল, এভাবে হয় না বউ, দুধকুমার আর ভগবান কি ছাড়বে?

আমি যা বলব ওরা তাই শোনবে।

তবু হয় না বউ, আমি পারব না।

তুমি আমারে রাখনি করে রাখ।

তার মানে?

বাবুরা রাখে না, মেয়েমানুষ পোষে না?

বিজন বলল, কোথায় রাখব?

কেন তোমার ধুরোলে, শুনেছি তুমি এখন আসছ না ফেমিলি নিয়ে, কেন আসবে, কলকাতা ছেড়ে কেউ ধুরোলে আসে? তোমার বাপ ঠাকুদ্দা তো ধুরোল থেকেই কলকাতা এয়েছিল দাদাবাবু, তুমি কেন কলকাতা থেকে ধুরোল গাঁয় যাবে, বরং মাঝে মধ্যে ঘুরে যেও, আমারে রাখ তোমার দালানে, রাখনির জন্যি তো এমন করত বাবুরা।

শুনতে শুনতে বিজন বসুর মুখমণ্ডলে পাকানো গোঁফ জেগে উঠল। মাথায়

চুল গজাল, সেই চুল বাবরি হলো, বেশ ঘাড় অবধি নেমে অতি মনোহর করল মুখখানি। বিজন অন্ধকারের আয়নায় তা দেখতে পেল পরিষ্কার। গায়ে এল্ আর্দির বেনিয়ান, চওড়া পেড়ে শান্তিপুরী ধুতি, পায়ে পাম্প শু। বিজন কচর মচর পান চিবোতে লাগল, বলল, তুই আমার দালানে থাকবি?

থাকব কালাচাঁদ, থাকব গোপাল, হে কিষনো এতকাল ধরে খুঁজে খুঁজে তোমার পেয়েছি।

গান জানিস?

জানি, হার্মনিও বাজাতে পারি, কোন গান শুনবে বলো।

এবার মলে সুতো হবো, তাঁতি বাড়ি চলে যাব...

শুনে খিল খিল করে হাসল দুধকুমার ভগবানের বউ, ও বাবা, বাবুর তো জানা আছে, কিন্তু ওটি বেটা ছেলের গান, ও গান আমি গাই কী করে, আমি যে গান শুনাব সে গান তুমি শোনো নাই এ জেবনে, তুমার বউও তোমারে শুনায়নি, গুনগুন করে উঠল দুধকুমারদের বউ, আমার আছে কত রকম/ রকম সকম দেখ গো...। দু'কলি গেয়ে চাপা গলায় বলল বউ, বাবু সব রকম গান জানা আছে, কত রকম কত কিছু জানা আছে, তুমি শুধু আমার রাখনি করো।

আর দুধকুমার ভগবান?

ওরা মেনে লিবে।

তিনটে পুরুষ নিয়ে থাকবি?

না বাবু আমি তোমারই থাকব, বাড়িটা করলে কেন রাখনি যদি না রাখ, ফুর্তি যদি না করো।

বিজন বলল, ভেবে দেখি, ও দুধকুমার দুধকুমার।

দুধকুমার ঘরের ভিতর থেকে অন্ধকারে পা দিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে বিজনকে খুঁজে নিয়ে বলল, সব শুনলে দা'বাবু, কথা হল?

এগারো

ফিরতে ফিরতে দুধকুমার বলল, ভগবান মরে যাবে চাঁদনিরে আমি নিয়ে গেলে।

তোমার বউ কী বলছে?

এখনই জগৎপুর ফেরবে, ভগবান তাকে বশ করেছিল, এখন আর তার শক্তি নেই, বশীকরণ কেটে গেছে।

তাহলে নিয়ে এস।

আনব তো দা'বাবু, কিন্তু ভগবান যে মরে যাবে।

যাবে যাবে তোমার কী? বিজন হঠাৎ রেগে গেল।

আমি তো বউ আনতেই গিছিলাম, সে ও তো এক কাপড়ে চলে আসবে বলে রেডি, আমি বললাম দুটোদিন থাক, ভগবান রে এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া ঠিক না, অধম্মো হবে।

বিজন অবাক। বিকেল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে রাত, সবটাই কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে। তার চোখের সামনে বজ্রবিদ্যুৎ ভরা মেঘের শরীর নিয়ে দুধকুমারের বউ ভেসে উঠেছিল বারবার। সে বুঝেই উঠতে পারছিল না একটা মেয়েমানুষ আর তিনটে পুরুষ কোন সুতোয় জড়িয়ে গেছে। তৃতীয় পুরুষটি সে নিজে। তার কাছে রাখনি হয়ে থাকার প্রস্তাব তো দিয়েছে দুধকুমারের বউ। দুধকুমার তা জানে? নাকি সবই জানে? এসব হচ্ছে ছক। সে এতকাল বাদে ধূলিহর নির্মাণ করতে গিয়ে সেই ধূলিহরের সঙ্গে কীসে জড়িয়ে যাচ্ছে?

বাস ছুটছে কলকাতার দিকে। বাইরে নিবিড় অন্ধকার। এই রাস্তা গিয়ে সায়েন্স সিটির কাছে ই, এম, বাইপাসে পড়েছে। এখনো সে পথ অনেক দূর। জানালার ধারে বিজন। তার পাশে তার গায়ে গা লাগিয়ে দুধকুমার। দুধকুমার একটু চুপ করে থেকে আলতো গলায় জিজ্ঞেস করল, কী বুঝলে দা'বাবু?

কী বুঝব?

আমার বউটি ভাল?

বিজন ঘুরল, বলল, সে তো তুমি জানো।

দুধকুমার বলল, ভাল, ও না থাকলে আমরা বাঁচতাম!

আমাকে নিয়ে গেলে কেন?

তখন তো জানিনে ভগবানের এই অবস্থা।

জানলে কী করতে? বিজন জিজ্ঞেস করল।

আসতাম না।

ঘাড় ঘুরিয়ে বিজন বাসের ডিম আলোয় দুধকুমারের ভরাট মুখ দেখল। কী রকম উদাসীন ভাব তার ভিতরে। কী রকম নিশ্চিন্ত! বিয়ে করা বউকে ছেড়ে কেমন নিশ্চিন্তে ফিরে যাচ্ছে নিজের বাড়ি। বিজন জিজ্ঞেস করল, তুমি কি তোমার বউকে ফেরাতেই গিছিলে?

তাছাড়া কেন যাব?

তুমি তো প্রায়ই যাও ও বাড়িতে, দুপুরে যাও, ভগবান ফিরবে না এমন খবর থাকলে রাতও কাটিয়ে আসো।

হ্যাঁ আসি, ও আমারে চায়, না গেলি রাগ করে।

তাহলে তো নিজেই ফেরাতে পারতে।

না ওটি হচ্ছিল না, বলছিল কলঙ্ক নিয়ে জগৎপুর যেতি তার সরমে লাগঁবে।

বিজন চুপ করে থাকল। দুধকুমার উসখুস করতে লাগল। বিজন ভাবছিল ওই মেয়ের মাকে খেয়েছিল কুমিরে! ও নাকি জলে নেমেছিল মায়ের সঙ্গে। ওকে খেয়ে নিলে ল্যাঠা চুকে যেত। ইস! এ আবার কী কথা? কী ভাবছে সে ওই মেঘের মত দুধকুমারী সম্পর্কে। দুধকুমারীই বটে। কালো দুধ। মেঘের দুধ।

বিজনের ভিতরটা আবেগে ফুলে উঠতে লাগল। চোখ বুজে সে দেখতে লাগল চাঁদনিকে। সব উল্টে যাচ্ছে। কোনো কিছুর সঙ্গে কোনো কিছু মিলছে না। চাঁদনি-চাঁদমণি যেন কালো চাঁদের আলো। কালো চাঁদের জ্যোৎস্না যাতে কিনা নিশীথ রাত্রি গভীর হয়। নিশীথের গা থেকে আলো ফুটে বেরোয়। কী দেখেছে সে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে? গ্রহণের চাঁদের মতো বুক দুটি উত্তেজনায় দপদপ করছিল। কালো আলো ঠিকরে বেরোচ্ছিল ব্লাউজ আঁচল ভেদ করে। কী পুরুষ্ট দুটি বাহু, কী গভীর তার নিতম্বদেশ। দুচোখের কী কটাক্ষ! বিদ্যুতের ঝলক দেখতে পাচ্ছিল, বিজন। বহুদিন এমন রমণীর মুখোমুখি হয়নি সে। তাকে সে ধূলিহরে রেখে দেবে? সময়ে অসময়ে গিয়ে বলবে পান সাজো দেখি দুধকুমারী চন্দ্রমুখী। তাম্বুলরাঙা মুখখানি মেলে ধরো দেখি, আমি দেখি তোমায়, শুধু দেখি।

দুধকুমার ডাকল, দা'বাবু ঘুমোলে?

না, কেন?

আমি কি দু'জনারে নিয়ে আসব আমার ঘরে?

তার চেয়ে তুমি এসে থাক না এখেনে।

তাকি হয় দাদাবাবু, ওর সললেকের চা দোকান ক্যান্টিন আমারে চালাতি বলল ভগবান।

তারপর?

আমি কী দুজনারে এনে ঘরে তোলব দা'বাবু?

একই কথা জিজ্ঞেস করছ কেন, যা করার তাই করো।

নাকি চাঁদনি থেকে যাবে যতদিন না ভগবান সেরে ওঠে।

আমাকে এনেছিলে কেন?

তুমি তো সবটা জানলে, এখন বলো আমি কী করব?

বিজন রেগে উঠল, কী করবে তা তুমি জানো, তোমার তো বিয়ে করা বউ, তোমার বউ অন্যপুরুষের ঘরে রয়েছে, তুমি কি পুরুষমানুষ!

ও তো আমারে ভালবাসে, সেডা জানি।

তবে পালিয়েছিল কেন?

বশীকরণ করেছিল বললাম না।

থাম তো। রেগে উঠল আবার বিজন, আমাকে এর ভিতরে জড়িয়ো না।

জড়াব না, কিন্তু আপনি ধুরোল বসিয়েছ শুনে বউ এর কী আহ্লাদ, ও ধুরোল জানে, আপনারে দেখে খুব খুশি, মরদের মতোন মরদ বটে এই কথা বলতে লাগল, না হলি ওপারের ধুরোল এপারে এনে বসান যায়!

হয়েছে, থামো।

না গো দা'বাবু, শুধু বলত দা'বাবুরে আন একবার।

এসব কথা তো আগে বলনি।

কী বলব, বলার কী আছে?

তোমার বউকে ঘরে ফেরাও দুধকুমার।

দুধকুমার বলল, তা হলি ভগবানের কী হবে, কে ওরে সেবা করবে, আমার বউ এর অবিশ্যি দয়ামায়া কম, ভগবান আতান্তরে পড়েছে ও এখনই জগৎপুর ফিরতে চায়, কিন্তু সেটা কি অন্যায্য হবে না?

বিরক্ত হয়ে ওঠে বিজন, বলে, তবে কেন বউ ফেরানোর জন্য আমাকে ডাকলে?

আনলাম, চাঁদনি ও দেখতি চেয়েছিল তোমারে। বলে নির্বিকার চোখে বিজনের মুখে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

বিজন আর এ বিষয়ে কথা বলল না। এখন তো মনে হচ্ছে দুধকুমার অতি ধুরন্দর। বউ রেখেছে ভগবানের ঘরে, বদলে ভগবানের কাছ থেকে টাকা নেয় কিনা কে জানে? আবার ভগবান না থাকলে নিয়মিত যাতায়াত ও করে। কিন্তু তার এই গোপন জীবনের সঙ্গে জগৎপুরের জীবন তো মেলে না। তাড়ি খেয়ে মাঠে পড়ে থাকে বিরহে। ট্রানজিস্টার খুলে বিরহের গান শোনে আর চোখের জল ফেলে—কী করে হয়? দুধকুমার বলল, তোমার মোবাইল নম্বর আমি দিয়ে দিয়েছি।

কাকে?

কেন চাঁদনিরে, দা'বাবু তুমি তারে উদ্ধার করতি পার।

শুনেই বিজন বলল, তুই কি মানুষ?

রক্তমাংসের বটে, না হলে তোমারে ও কথা বলি।

তুই তোর বউকে খাওয়াতে পারিস না?

পারি, কেন পারব না?

তবে?

ওরে ফেরত আনলিও আবার যাবে।

কোথায় যাবে?

কাউর না কাউর সঙ্গে, ওর হয় না দা'বাবু, এক পুরুষি হয় না।

বিজন শিহরিত হল। তার চোখের সামনে আবার কালো চামড়ার ভিতরে টকটকে লাল আগুনের শিখা ভেসে উঠল। দুধকুমারের ঘাড়খানি ঝুলে পড়েছে দুঃখে। ব্যর্থতায়। এত বড় একখানি দেহ, দুঃখে যে এইটুকুনি ছোট হয়ে গেছে। বিজন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, কী হয়েছিল দুধকুমার?

কী হবে, হাত নাতে ধরা পড়ি গেল দিনে দুপুরে।

তারপর?

তারপর কী, আমি রাগের মাথায় বললাম যা ভগবানের সঙ্গে যা।

তারপর?

আমি তো পারিনে দা'বাবু, রাগের মাথায় বললাম বটে, কিন্তু ওর যৈবন যে আমারে কাঙালের মতো ডাকে।

বিজন জিজ্ঞেস করল, তোমারে নেয়?

নেয়।

ভগবানরেও নেয়?

নেয়।

ও থাকুক ভগবানের ঘরে, এন না।

না এনে পারি কী করে, ওর গা শুঁকতি ভাল লাগে দা'বাবু।

তাহলে এনে রাখ।

ভগবান থাকবে কী করে?

এন না দুধকুমার, আনলে তোমার আরো সব্বোনাশ হবে।

আমি জানি।

বিজন জিজ্ঞেস করল, কী জান?

গৌড়ার অত রাগ কেন, এমনি রাগ হারামির বাচ্চার, ওরে আমি খুনই করতে গিয়েছিলাম, বউ আটকে দিল।

এ তোমার কেমন বউ?

দুধকুমার বলল, ভাল দা'বাবু।

কী করে ভাল হয়?

হয় দা'বাবু হয়, সব কথা তো তুমি জানো না।

বিজন বলল, অমন মেয়েমানুষ ঘরে থাকলে বাইরে থাকলে সমূহ বিপদ, তুমি ওরে ভগবানের কাছ থেকে এন না।

চলে আসবে।

চলে এলে বলো না থাকতে, ফিরে যেতে, বলতেই পার, তোমার বউ পর-পুরুষের ঘর করেছে, তাকে কেন নেবে? বলতে বলতে বিজন হাঁপায়।

বুঝতে পারে তার ভিতরে ভয় ঢুকেছে। কার কাছে গিয়েছিল সে? দুধকুমার তাকে খুব ফাঁসিয়েছে। অত উত্তাপ সে সহ্য করতে পারবে? তার মধ্যবয়স হয়ে গেছে। চরিত্র নিয়ে ভালই সুনাম। তার বউ কবিতা ও স্বামীর চরিত্র গর্বে গর্বিত। নিশ্চিন্ত ও বটে। যা একটু আধটু কারোর কারোর সঙ্গে কথা বলে সুখ হয়, দেখে সুখ হয় অফিসে, তা ওইটুকুই, বেশি এগোয়নি। একবার নবদ্বীপের ললিতা নামের এক তরুণী এগিয়ে এসেছিল অতি দুঃসাহসে। বিজনকে ডেকেছিল এক কেবিন ভরা রেস্তোরাঁয়। বিজন তাকে উল্টোদিকে বসিয়েছিল, ওই পর্যন্ত। এখন দুধকুমারের বউ, অমাবস্যার চাঁদনির যে পরিচয় পাচ্ছে তাতে বিজনের ভিতরে ভয় এসে বাসা বাঁধছে। সে কী করে একটা মেয়েমানুষ রাখবে? রক্ষিতা রাখা কি তার পক্ষে সম্ভব? পারবে? সে সাহস তার আছে? পারবে?

দুধকুমার বলল, পেথম দিনেই ও বশ করে নেয় দা'বাবু, বশীকরণটা ও জানে।

হুঁ, আর বলতে হবে না।

তোমার সঙ্গে কী কথা হল?

হয়নি। বিজন এড়িয়ে যেতে চায়।

দুধকুমার আবার থেমে গেল। বাস ছুটছিল। বাসের অধিকাংশ যাত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে। কন্ডাক্টর ও ঝিমোচ্ছে খালি সিটে বসে। দুধকুমার ডাকল, ঘুমিয়ে পড়লে?

না, কেন?

ঘুম তোমার গেল, আমি জানি ও ঘুম কেড়ে নেয়।

ও কী করে পারে?

কেন পারবে না, দোপদি কি পারেনি?

সে তো অন্য কথা।

বেটা ছেলে কি পারে না, ঘরে বউ থাকতি আর পাঁচটা মেয়েমানুষ দ্যাখে না?

তুমি মেনে নিচ্ছ?

না মানলে উপায় নি দা'বাবু, বলবে তুমি যাও, আর এসনি, আমারটা আমি বুঝে নেব, কিন্তু ওরে ছাড়া থাকতি পারিনে আমি, পারব না তাও জানে ও, বশীকরণ জানে দা'বাবু।

বিজন বলল, ও ওখানেই থাকুক, এনো না।

আনতি হবে, বলল তো ভগবানরে সমেত নিয়ে যেতে।

বিজন বুঝতে পারছিল এ বড় সহজ হবে না। তার বাড়িতে যখন ঢুকবে

বলেছে হয়ত ঢুকেই পড়বে। এখন আছে গৌড়েশ্বর, তাকে বের করতে ওর কত সময়? কিন্তু সে কি পারবে? কবিতাকে গিয়ে বলতে পারবে? এখন তো যাচ্ছ না, তো বাড়িতে একটা মেয়েমানুষ রেখে দিলাম। বিজন বুঝল তাকে লুকোতে হবে সব। ধূলিহর থেকে এসে কলকাতায় দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে এইটুকু লাভ হয়েছে তার, দুধকুমারের মতো পস্টাপস্টি বলার ক্ষমতা আর সাহস দুই-ই গেছে। কলজের সে জোরও নেই। সে বলল, বউ আর বউ-এর প্রেমিক-লাভার নিয়ে তুমি থাকবে?

আঁজ্ঞে ভগবান আমার স্যাঙাত।

যা বলছি তার জবাব দাও।

আজ্ঞে বউ যা বলবে তা করতি হবে, ও অমন বউ, ও যা বলবে ভগবান ও তা করবে, করতি বাধ্য।

তাহলে কোনো সমস্যা নেই?

নেই আবার আছে ও দা'বাবু, ও তোমারে কী বলল?

বিজন ভাবে বলে দেয়। তারপর কী মনে করে মাথা নাড়ে, কিছু বলেনি।

কিছুই না?

না কিছু না।

দুধকুমার চিন্তিত হল দেখে বিজন ভাবল, আবার ভাবল, আসলে কি এটা কোনো ছক। তার দালানকোঠা দখল করে নেওয়ার—সে আচমকা সরে গেল দুধকুমার থেকে।

বারো

সে বিজনকুমার বসু পিতৃপুরুষের আদি নিবাসে ধূলিহর, পূর্ববঙ্গ, সাতক্ষীরা শহরের সন্নিকটে, এখন তা আলাদা দেশ, বাংলাদেশ। সে তার পিতৃভূমি দ্যাখেনি, শুধু কানে শুনেছে। ছোটবেলা থেকে মা ঠাকুমার কাছে শুনে শুনে ধূলিহর, ধুরোল সম্পর্কে তার ভিতরে টান হয়েছিল গভীর। মনে মনে কল্পনা করত তার পিতৃপুরুষ এখনো ওখানেই বাস করেন। তার পিতৃবিয়োগ হয়েছে এদেশে, বিজনের মনে হয় মৃত্যুর পর বাবা ধূলিহরে চলে গেছেন। সেখানে এখনো হেরিকেনের আলো, উঁচু পোতার মাটির বাড়ি অনেকগুলি। সেখানে এখনো কপোতাক্ষ বেতনা দুই নদী বয়ে আনে নতুন কুটুম, নতুন বউ। তার মা কপোতাক্ষ নদেরই তীরবর্তী গ্রাম বাঁকা-ভবানীপুর থেকে বিয়ের পর নৌকোয় করে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন ধূলিহরে। মায়ের কাছে শুনতে শুনতে ধূলিহর তার মনের ভিতরে ঢুকে পড়েছে এত বছর ধরে। তাই জগৎপুর বেছে

নেওয়া ধূলিহর নামের গৃহটি নির্মাণে। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়—বিজন জেগে আছে তার ভাড়াটে বাড়ির বড় জানালার ধারে। যেমন ভেবেছিল তেমন কি হয়েছে সত্যি?

হবে? ধূলিহর আর একবার নির্মাণ করতে গিয়েছিলেন বাবা। সেই বাড়িটি এখন সন্তোষ চক্রবর্তীর হেফাজতে। সন্তোষ সেখানে সন্ধেবেলায় বসে বিজনের বাপ ঠাকুর্দার সঙ্গে কথা বলে। কালিদাস বসুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হচ্ছে। ও বাড়ি সন্তোষ ছাড়বে না। জগৎপুরের বাড়িতে ঢুকে বসে আছে গৌড়েশ্বর। তার কাছে চাবি, সে শুধু ভয় দেখায়, না থাকলে জানালা দরজা লোপাট হয়ে যাবে। এখন বিজনকে প্রস্তাব দিয়েছে দুধকুমারের বউ, তার পোষা মেয়েমানুষ, রক্ষিতা হয়ে থাকবে। বিজন তো আর সত্যি সত্যি ধূলিহরে যাচ্ছে না, তাহলে অসুবিধে কোথায়?

বিজনকে ডাকল কবিতা, কত রাত জেগে থাকবে?

এই, ভাল লাগছে না।

কী হল আজ?

কিছুই হল না।

বউটা ফিরবে না?

বিজন বলল, না।

কবিতা একটু দূরে অন্ধকারে মেঝেতে বসে, বলল, একবার গেলে কি ফেরে?

হুঁ। বিজন সিগারেট ধরায়। এত রাতে কোনোদিন সিগারেট ছোঁয় না সে। আজ এখন ভিতরটা যে চঞ্চল হয়েছে তা টের পাচ্ছে। কী রূপ সেই কালো মেয়ের। পুরো শরীর নিয়ে সে অন্ধকারের ভেসে উঠছিল। কালো আগুন। অমন আগুন দ্যাখেনি বিজন। এত টাকা দিয়ে বাড়িটা তৈরি করল, তা কি গৌড়েশ্বরের ভোগের জন্য? ভাড়া দিয়েও বা লাভ কী? ভাড়াটে ভোগ করবে। ক'টা টাকা আসবে? তাতে কি মনের খোরাক মিটবে? নিজের পিতৃপুরুষের ভিটে ভাড়া দিয়ে আয় করার ভিতরে কি কোনো মহত্ত্ব আছে? আবার সে ভিটে তার চোখের সামনে আর একজন ভোগ করবে, ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে আয়েশ করতে করতে তাকে ডাক দেবে, আসুন দাদা, কতদিন আসেননি, আমাদের কী ভুলে গেলেন? তাও কি সহ্য করা যায়? তার চেয়ে ওই দুধকুমারী কালো চাঁদের আলোর প্রস্তাব মন্দ কী? সে থাকবে তার বাড়িতে। রাঁধবে বাড়বে খাবে, ঘর গুছিয়ে রাখবে। আর হপ্তাশেষে বাবু বিজন বসু কোঁচা দুলিয়ে উপস্থিত হলে তার জন্য পানপাত্র সাজাবে। তাকে সেবা করবে। দরজার গোড়ায় দুই মাতাল ভগবান আর দুধকুমার বসে থাকবে একটুখানি 'পেসাদের' আশায়।

মন্দ কী? কালিদাস বসু কোন বাগদি বউ-এর পেটে অ্যাত্তোখানি ছেলের জন্ম দিয়েছিল। সেই ছেলের পা বাঁকা, সেই ছেলে কোলে নিয়ে বাগদি বউ ধানের জন্য ভাতের জন্য বোস বাড়িতে আসত। কে না জানত কার বাচ্চা? অথচ কালিদাসের সংসার ছিল ধু ধু। বিজন এই কথাটি সত্য জানে। অনেকদিন আগে শোনা কিন্তু আবছা আবছা। তার যত কথা ছিল মায়ের সঙ্গে। মা সবটা নয় যতটুকু বলা যায় সন্তানের কাছে তাই ই বলত। বিজন ভাবল দুধকুমারের বউ তার কাছে গর্ভ চায়। তাই কি? নাকি অভাবে ভাত-কাপড়ের জন্য জোয়ান পুরুষ ছেড়ে আধবুড়ো বিজন বসুকে ধরেছে।

বিজন বলল, কী করি বাড়িটা নিয়ে?

জায়গাটা ডেভলপ করুক, আমরাই যাব। কবিতা বলল।

তোমার নাচ বন্ধ হয়ে যাবে।

হবে না, হতে দেব না।

ইরফানের মেয়েকে তুমি শেখাতে পারবে না।

ওইটা আমার দুঃখ থেকে যাবে।

কিন্তু এখন আমার ধূলিহর নিয়ে কী করব?

আগে ওই লোকটাকে বের করো।

বিজন ভাবল বলে দুধকুমার, ভগবান, আর চাঁদনির কথা। এতে কি খুব খুশি হবে কবিতা? না হওয়ার কী কারণ? শুধু রাখনি হওয়ার কথাটা না হয় বলবে না। তখন তার নিজস্ব সম্পত্তি, নিজের পুরুষের বেহাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু ভগবান আর দুধকুমার মিলে যে একটা মেয়েমানুষ পালন করছে মৌমাছি পালনের মতো করে তা শুনলে কবিতা অখুশি হবে কেন? ওরা একজনে পারে না, তাই দু'জনে। একজনের কাছে থাকলে ভাতের অভাব হতো, কাপড়ের অভাব হতো, শেষে অভাবে অভাবে ভালবাসার অভাবও হতো, এখন সে ভয় নেই। এখন যদি বিজন ওর ভিতরে জুড়ে যায়, তাহলে তা কি সুন্দর হবে? কবিতা কি জানবে?

কবিতা বলল, গৌড়েশ্বরকে বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দেবে না, ওর চোখ ভাল না, বাড়ির উপর ওর লোভ হয়েছে।

লোভ হলেই হবে।

হবে, লোভ বাসনা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় জানো না?

জানি।

এত যে খুন-জখম কেন হচ্ছে, ওই ওতে।

বিজন বলল, অতটা হবে না।

হতে অসুবিধে কোথায়, ওকে হটাও, বরং দুধকুমারকে বসাও।

বসাব কেন?

না কথার কথা বলছি, ওই লোকটা ভাল।

বিজন চুপ করে থাকল কিছু সময়। ভাবছিল বলবে কি না, তার চেয়ে বরং দুধকুমারী চাঁদনিকে রাখে। দুটো পুরুষ ব্যতীত তার ঘর কোথা? একটু না হয় আরো নিরাপত্তা পেল। একে তো কুমিরে টানার কথাই ছিল। জলের ভিতরে কুমিরের ভুল হয়ে গিয়েছিল, বিভ্রমে পড়ে ক্ষয়ে যাওয়া মানুষটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ওর মা'র শরীরে কিছু ছিল না, ওর শরীর তখন উপচোন গাং। সেই যে বেঁচে গেল, তারপর বুঝেছে এক একবার ওভাবে বেঁচে যাওয়া যায়, বারবার বাঁচতে হলে নিজেকে নিজের ব্যবস্থা করতে হয়। না করলে কেষ্টপুরের খালপাড়ের ঝোপড়িতে ঢুকে তার বুড়ো বাপের সামনেই তার কাপড় খুলে দেয় মোটরবাইকের দুই দাদা। তারপরই নিরুপায় হয়ে দুধকুমারের ঘরে। সেখেনে এসে ও টের পেয়েছিল আসলে ওর দেহখানিই আছে। আর কিছু নেই। বিজন বসু টের পাচ্ছিল অভাবে যেমন বাগদি-বউ সেই কোন অতীতে কালিদাস বসুর বাচ্চা গর্ভে ধরে সেই রুগ্‌ণ বাচ্চা কোলে তার বাড়িতেই এসে বসে থাকত ভাতের জন্য, সেই কাহিনিই বোধ হয় আবার ঘটতে যাচ্ছে। তার কাছে ভাত-কাপড়ের আশায় রাখনি হতে চেয়েছে দুধকুমারের বউ। তার দুটো পুরুষের একটা হাড়গোড় ভেঙে বিছানায়, অন্যটা নেশা খেয়ে বিজন বসুর বাড়ির নতুন ছায়ায় চিত হয়ে পড়ে থাকে। বউ আনবে কী করে দুধকুমার, বউ নিয়ে সংসার করার সামর্থ্যই নেই। আনবে তার পরামর্শে নাকি? বিজনের মাথা ভোঁ ভোঁ করে।

কবিতা বলল, কী ভাবছ?

বাড়িটা ওখানে করা কি ভুল হয়ে গেল?

কবিতা সরে এসে তার পিঠে হাত রাখল, করে যখন ফেলেছে, উপায় কী?

তোমরা যাবে শহর ছেড়ে গ্রামে?

তুমি নিয়ে গেলে যাব।

তোমার নাচ! তোমাকে তো আমি কিছুই দিতে পারিনি কবিতা।

কী দেবে?

খুব বড় একটা হলঘর, সেখানে তোমার ছাত্র-ছাত্রীরা তোমার কাছে শিখবে জীবনের নানা মুদ্রা, তবলচি থাকবে, সেতার বাজিয়ে থাকবে, গায়ক-গায়িকা গাইবে জীবনের বন্দনা, তুমি শুধু ছোটদের নিয়ে বিভোর হয়ে থাকবে, তা তা ধিন তা...।

কবিতা খিলখিল করে হেসে ওঠে, ইস। ওসব স্বপ্নেই থাকে, হয় নাকি?

তুমি তবু নিজের চেষ্টায় যেটুকু করেছ তা আমি বন্ধ করে দেব জগৎপুর ধূলিহর নিয়ে গিয়ে, তুমি শূন্য মনে বসে থাকবে।

কবিতা বলল, বসে থাকব না, সেই যে তোমার সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী মদন তাঁতি, তার মতো একা একা শূন্যঘরে তাঁত চালিয়ে যাব, আমি একা একাই অভ্যেস রাখব, তবে ওই ভরত নাট্যম, অন্য কিছু না, ফিল্মি ডান্স শেখালে কত স্টুডেন্ট হতো, আমি তো তা শেখব না, তা শেখালে ওই জগৎপুর ধূলিহরেও অনেক পেয়ে যাব, ওসব পৌঁছে গেছে ওদিকেও, টিভিতে দ্যাখো না দিন রাত কচিকাঁচাগুলো কোমর নাচাচ্ছে, কী ভুলভাবে শরীর দোলাচ্ছে, শরীরের একটা ছন্দ আছে, সেই ছন্দই তো নাচ।

বিজন হাত রাখল কবিতার পিঠে, বলল, একটু বুঝিয়ে দাও।

কবিতা হাসল আবার, এমা, তোমাকে আমি শেখাব!

হ্যাঁ শেখাবে।

এ কি শেখানো যায়, মানুষ নিজে নিজে শেখে তাই না?

তাই তো। বিজন কি জানে না এখনো বীজ বোনা, রোপণে গান হয়, নাচ হয়। ধান রোয়া দেখেছে বিজন জমির ধারে বসে, গান গাইতে গাইতে রোপণের সময় মেঘের নীচে কীভাবে আন্দোলিত হয় মানুষ-মানুষীর শরীর, ওইভাবে শরীর না দুললে কাজটাই হয় না।

সেই যে কবে থেকে, কোন আদিমকাল থেকে মানুষের শোকে, আনন্দে, নিবেদনে, মানুষের চলনে বলনে ছন্দে তৈরি হয়ে আছে, সেই ছন্দ যেদিন ভেঙে যাবে যেদিন কী মানুষ তার সৃষ্টিশীলতা থেকেই দূরে সরে যাবে না! বিজনের মনে পড়ল নারী-পুরুষের মিলনেও কী আশ্চর্য ছন্দ। ছন্দ না থাকলে মিলন আর মিলনের মত থাকে না। কবিতা ডাকল, কী ভাবছ?

বাড়িটা নিয়ে কী করব, আমরা যে ধূলিহর থেকে চলে আসতে পেরেছিলাম সে আমাদের ভাগ্যই, আমরা কী পারতাম তাস পাশা খেলে পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকতে, তাই তো ছিলাম, আমাদের জমি চষত চাষিরা, আমরা সেই ফসল, ভোগ করতাম।

জানি তো, এসব কথা আগেও বলেছ।

আবার বলছি, কবিতা আমি কি আবার পিছিয়ে যাচ্ছি?

তার মানে?

ধূলিহরকে ত্যাগ করতে পারলাম না, ওল্ড ইজ গোল্ড ভেবে জগৎপুরে মন্দিরের মতো একটা ধূলিহর নামের বাড়ি প্রতিষ্ঠা করলাম, ও বাড়িতে গৌড়েশ্বর ঘুমোয়, আমাদের আমতলির বাড়িতে সন্তোষ চক্রবর্তী আমার বাপ ঠাকুর্দাকে নিয়ে বসবাস করে, ও বাড়িটাও তো করা হয়েছিল ধূলিহরের মতো করে, পুকুর মাছ গরু, ধান জমি নারকেল গাছ, আমগাছ, উঠোনে পাটক্ষেত,

আমাদের ভিতরে সভ্যতা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার রোগ আছে নাকি কবিতা?

কবিতা বলল, তা কেন, কেউ কেউ তো এমন চায়, আর এসব কি পিছিয়ে যাওয়া, তাতো নয়।

এ চাওয়ার মানে কী, এই কলকাতা শহর ছেড়ে আমি আবার ধূলিহরে যাব, যাওয়া যায়! গেলে তো আমাকেও কালিদাস বসুর মতো একটা...।

কী বলছ কী, সবাই কি অমন ছিল?

ছিল না, তবু আমার ভয় করে, আমাদেরই রক্তের প্রাচীন ধারা তো।

কবিতা বলল, বকবক করতে হবে না, ঘুমোবে চলো।

আমি আজ ঘুমোব না।

সে কী কেন?

আমি ধূলিহরকে নিয়ে কী করব কবিতা, যেভাবে আরম্ভ করেছিলাম, ইরফান থাকবে, ইরফানের মেয়ে কুসুমহিয়া তোমার কাছে নাড়া বেঁধে ভরত নাট্যম শিখবে, আমরা সবাই মিলে পঁচিশে বৈশাখ করব, সে সব কিছুই তো হবে না, গৌড়েশ্বর ঘর দখল করে থাকবে আর বাগদী বউ ছেলে কোলে করে আসবে ভাতের জন্য।

আবার সেই কথা! সে ছিল দুর্ভিক্ষের কাল তেতাল্লিশের মন্বন্তরের কথা শোননি?

শুনব না কেন, এখনও যে তার রেশ রয়ে গেছে। বিড়বিড় করল বিজন। মনে মনে বলল, না হলে ভাতের জন্য রাখনি হতে চায়, দুই পুরুষ নিয়ে ঘর করে তৃতীয় পুরুষের দিকে ঝোঁকে!

কবিতা, বলল, ঘুমোতে চল।

বাড়িটা আমাকে ভাবাচ্ছে।

ভাবতে হবে না।

চাবিটা কেন যে দিলাম। বিড় বিড় করে বিজন।

চাবি চেয়ে নিয়ে তালা বন্ধ করে এস।

ও যদি সন্তোষ চক্রবর্তীর মতো হয়ে ওঠে!

সন্তোষ চক্রবর্তীর তো একটা গ্রাউন্ড আছে, ওর কী আছে?

বিজন বলল, গ্রাউন্ড তৈরি করতে কতক্ষণ?

তাই তো হলো। ক'দিন পরে রোববার বিজন গেল জগৎপুর ধূলিহর-এ। তারই খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল গৌড়েশ্বর। বিজন ডেকে তুলতে তুলতে সে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল, কখন এলেন?

বিজন তার খাটের এক কোণে বসে বলল, গৌড়েশ্বরবাবু, আমি বলছি কী—

কী বলবেন তা আমি জানি, ঠান্ডা হন দাদা।

না মানে, বাড়িটা খালি থাকলেই—। কথা শেষ করল না বিজন। করতে পারল না। গৌড়েশ্বর বলল, এ পরামর্শ তো আপনাকে দুধকুমার দিয়েছে, হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে, আপনি কি ওর সঙ্গে গিয়েছিলেন?

কে বলল?

গৌড়া জানে না এমন কিছু হতে পারে না।

বিজন বলল, হ্যাঁ কিন্তু তাতে কী হল?

যাবেন যে তা আমাকে তো বলেন নি।

কী বলব?

ওটাই বলবেন, দেখুন দাদা আপনি জগৎপুরে নতুন, জগৎপুর নিয়ে আপনি জানেন না কিছুই, তাই আমার বলা, কাজটা ঠিক হয়নি।

কেন গেলে কী হয়েছে?

সে পরে বুঝবেন, দেখুন না বউটাকে তার ভগবান সমেত ফেরত এনেছে দুধকুমার, আপনি যে আমাকে উঠতে বলছেন, ওদের বসাবেন বলে তো?

না তা কেন হবে, আমার বাড়ি আমার থাকবে।

আপনারই তো থাকবে, আপনার থাকবে না তো কার থাকবে, কিন্তু দুধকুমারের বউ এসে উঠবে তো! বলে গৌড়েশ্বর খাটের উপর ফেলা তার তেলচিটে মাথার বালিশের নীচ থেকে বিড়ির বান্ডিল বের করে লাইটার জ্বালিয়ে ধরায়। সুখটান দেয় চোখ বুজে, তারপর বলে, ঠিক তাই হবে, দুধের তো একটা ঘর, তাতে একটা অসুস্থ লোক, আর একটা পুরুষমানুষ নিয়ে একটা মেয়েমানুষ থাকতে পারে?

বারান্দা আছে তো?

গৌড়েশ্বর জিজ্ঞেস করে, কে বারান্দায় শোবে, ওই ভগবান! সে নড়তে পারে না, কবে ওর হাড় জোড়া লাগবে ঠিক নেই, সে তো ভিতরের তক্তপোষে বিছানা করে নিয়েছে, ভিতরে ছাড়া শোবে না।

তা কী করে হবে?

ওই করেই হবে, ভগবান তো আসবে না বলছিল, বউটা বলছিল জগৎপুর আসবে, তখন তারে ফেলে আসে কী করে? দুধে দুধকুমারডা হলো বোকার হদ্দ, মাথামোটা, মাথায় ঘিলু বলে কোনো পদার্থ নেই দাদা।

সব ও বলেছে?

তাড়ি খাওয়ালাম ভাল করে, ঝরঝর করে সব বলে দিল, এখন ওর সমস্যা ঘরে কোন দু'জন থাকবে।

বিজন হাঁ করে, তাকিয়েছিল গৌড়েশ্বরের দিকে। হিমস্রোতে নেমে এল মাথা থেকে মেরুদণ্ড ধরে পা অবধি। আর কী জানে গৌড়েশ্বর? উদাসীন গৌড়েশ্বর বলছে, দাদা যখন বলবে তখন সে বেরিয়ে যাবে। সে তো হাঘরে নয়। তার ভিটেয় পাঁচখানা ঘর। সব ছেলের একটা করে, তার আর তার বউ এর একটা। একটা ফালতু পড়ে আছে। তার ঘরে টিভি আছে। আয়না লাগানো আলমারি আছে। গৌড়েশ্বর বলছিল সে দাদার মুখ চেয়ে এ বাড়িতে আছে। এখনই বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তারপর কী হবে? তিনজনের কোন জন আসবে এখানে?

বিজন অন্ধকার মুখে ভয় ভয় ভাব নিয়ে গৌড়েশ্বরের কথা শুনতে লাগল। আর কী জানে লোকটা? দুধকুমারের বউ এর কথাও। অসম্ভব কিছু না।

কথাটা হয়ত দুধকুমারেরই। দুধকুমার তার বউকে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছিল তার কাছে। এখানে কোন লোকটা কেমন তা ধরা যাচ্ছে না।

গৌড়েশ্বর, বলল, বউটারে দেখলেন?

হুঁ।

আপনারে কেন নিয়ে গিয়েছিল তা জানেন?

মাথা নাড়ল বিজন, তারপর বলল, বউ ফেরাতে বোধহয়।

বউ তো ফিরেইছে, দাদা ওরে তাড়ি খাওয়ান, সব বলে দেবে, বলেন তো আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এরপর যদি তিনজনের যে কোনো দু'জন ঘুমুতে আসে এখেনে, তখন?

বিজন টের পেল সব জানে লোকটা। তাকে শুধু বাজিয়ে দেখে নিচ্ছে। কে বলল, দুধকুমার? নাকি ওর কালো বউটা? কুমিরের কাছ থেকে বেঁচে দুই মোটরবাইক দাদার হাতে ভাল করে নষ্ট হয়ে শেষে দুধকুমার। তারপর সঙ্গে ভগবান। ওর কি কোনো ভয় আছে না সংকোচ? তার কাছে সাড়া না পেয়ে হয়ত গৌড়েশ্বরকে ধরে পড়েছে, বাবুর রাখনি করে দাও গৌড়া কাকা, তাহলে এই দুই লোকের হাত থেকে বাঁচি, ভগবান আর কাজ করতে পারবে বলে মনে হয় না, আর তোমার ভাইপো দুধে তো তাড়ি খেয়েই পড়ে থাকে, ওর জমানো টাকা প্রায় শেষ, এরপর আমাকেই খাওয়াতে হবে দুটোকে।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই। গৌড়েশ্বর বলল, ছাদে যাবেন, ভাল করে কথা বলি।

কী কথা?

চলুন না, এখেনে কে এসে যায়।

বিজনকে প্রায় টেনে ছাদে তুলল গৌড়েশ্বর। পুবদিকটায় মাঠ আর মাঠ,

প্লটিং করা হয়ে গেছে। বিক্রিও হচ্ছে। ওই মাঠের কোণেই দুধকুমারের টালির চাল। বিজন দূর থেকেই স্পষ্ট দেখল। সে। সে দাঁড়িয়ে আছে এদিক পানে চেয়ে।

তেরো

গৌড়েশ্বর বলল, ওই দেখুন।

হ্যাঁ।

গৌড়েশ্বর বলল, বাড়িটি করলেন, আপনি রাজি?

কী বলছেন। বিজন কাঁপছিল।

না মানে বাড়ি তো পড়ে থাকবে, কলকাতা ছেড়ে কেউ আপনার ধূলিহরে থাকতে আসবে, বউদি কোনোদিন আসবে না।

বিজন চুপ করে থাকল।

আপনার ইরফান পর্যন্ত থাকল না, আমাকে বলে গেছে ওর জমির খদ্দের দেখতে, আমি দেখছি, কিন্তু এ বাড়ি নিয়ে আপনি কী করবেন?

জায়গাটার উন্নতি হোক, আসব। বিজনের কথা ঢেকে গেল চাকা বের করে ফেলা বিমানবন্দরে ল্যান্ডিং করতে যাওয়া এক বোয়িং বিমানের শব্দে।

এ জায়গার কোনো উন্নতি হবে না।

তাই কী হয়?

হয়। এসব হল মেছোদের জায়গা, আমরা ও ভেড়ি আর মাছের কারবার করতাম, আমাদের জন্য উন্নতি হয়?

বাড়ি ঘরদোর হলে?

আমার কথা মিলিয়ে নেবেন, কিন্তু দাদা আপনি কী করবেন, ওই ভগবান আর দুধকুমারকে টানতে হবে ওকে, ভাল গতর, যদি বলেন তো, না না আমি যেমন আছি থাকব, দুটো বেটাছেলের যে কেউটা এখেনে এসে শুতে পারে এক একদিন, আর আপনি যেদিন আসবেন, আপনার জন্য ও বসে থাকবে, সেদিন আপনিও থাকবেন আপনার বাড়িতে।

এসব কী বলছেন গৌড়াবাবু?

গৌড়েশ্বর বলল, আকাশের নীচে দাঁড়িয়েই তো বলছি দাদা, আমার মন বলছে আপনি রাজি হয়ে যাবেন, না হলে এ বাড়ি করা কেন, আবার ধূলি হর নাকি ধুরোলে ফেরা কেন?

আপনাকে এসব কে বলল?

তাড়ি খাইয়ে জেনে নিয়েছি।

দুধকুমার বলেছে?

দুধকুমার ছিল ওর বউটাও, নাহলে ওর উপায় নেই, মাস মাইনে দিয়ে রাখবেন, হপ্তায় একদিন দুদিন আসবেন, এক একদিন থেকেও যাবেন।

বিজন বসু বলল, আমি তো এমন ভাবিনি।

এখন কেমন লাগছে?

বিজন বলল, বুঝতে পারছি না।

আরে দাদা, গৌড়া থাকলে আপনার কোনো চিন্তা নেই, গৌড়া কোনোদিন ওর গা ছোঁবে না। ভাইপোর বউ তো, বউমা, তবে ভাইপো নিজির না, সে সব কথা থাক, ওরে রাখলে ও বাঁচে, দুধকুমার আর ভগবানও বাঁচে, ভগবানের ঝুপড়ির দোকানও ভেঙে দিয়েছে সললেকে।

বিজনকুমার বসু দেখছিল ওই দূরে দুধকুমারের বউ একটি কালো বলয়ের মতো বসে আছে খোলা মাঠে। তার চারপাশে কেউ নেই। সে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করে, এতে আপনার লাভ?

আমার আবার লাভ কী?

লাভ নেই অথচ ওর হয়ে বলছেন?

আমি আপনারে ভালবাসি দাদা?

ভালবাসেন কেন?

তা তো বলতে পারব না, আমার কোনো স্বার্থ নেই, শুধু বাড়িটা পাহারা দেব, না হলে যদি দরজা জানালা চলে যায়, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করা তো।

শুধু এইটুকু! বিজনের কণ্ঠে বিস্ময়। সে আবার তাকায় দূরে। দেখল জগতের গায়ে কালো বলয়টি যেন লেগে আছে। গ্রহণ হয়েছে। এইখানে সূর্যের সব আলো ঢেকে দিয়েছে চাঁদ চাঁদমণি। চাঁদনি। দুধকুমারী। সে ঝপ করে গৌড়েশ্বরের হাত ধরে ফেলল, আপনি কত পাবেন?

সে আপনাকে ভাবতে হবে না আপনি তো দেবেন না।

কত চায় ও?

দেবেন যা মনে হয়, আপনি এলে সেবা করবে, অমন গতর দেখেছেন আর, এ হলো আপনার ধুরোলের খাঁটি মেয়েছেলে, এসব রাখতে হয় দাদা, না হলে আপনি কীসের পুরুষমানুষ!

কিন্তু আপনি?

আমি ওর কাছে বুঝে নেব।

ভাগ নেবেন?

সব ব্যাপারে আপনি মাথা গলান কেন, আমার পা ধরে বলল, বাবুটি বড় সোন্দর, বাবুটিরে বলো মোরে রাখনি করে রাখতি, দুটো পুষ্যি।

দুধকুমাররা কই?

আছে একটা ঘরে শুয়ে, দুধকুমার ওধারে কোথাও পড়ে আছে, আমি জানি এ বাড়িতে আপনি আসবেন না, তবে আপত্তি কেন, বাড়িটা কাজে তো লাগুক, ধূলিহরের লোক কি সব ধোয়া তুলসিপাতা ছিল, নাকি আপনি নিজে ধোয়া তুলসীপাতা, আমি বুঝিনে?

না গৌড়াবাবু, আমার এমন কখনো হয়নি, কবিতা যদি জানে, দুঃখে মরে যাবে।

জানবে না, কাকপক্ষীটিও টের পাবে না।

আমার মুখ দেখলে ও ধরে ফেলবে।

না দাদা তা হবে না, ও তো শুধু সেবা করবে—মাসে হাজার দিতে পারবেন, হাজার দিন, বড় দুঃখী, আপনার বাড়ি পাহারা দিতে ও তো ওটা লাগত, গার্ড কি ওর কমে হবে?

বিজন বলল, ডাকো ওকে।

বলল বটে কিন্তু বিজন ধরতে পারছিল না কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে। কোন কাজে এসেছিল কোন কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে। দুধকুমার, ওর বউ আর গৌড়া মিলেমিশে যুক্তি করে এসব ঘটাচ্ছে কি? বিজন কি ধরতে পারছে না? আগে ঝগড়া ছিল দু'জনের। ঝগড়ার কারণ তো এই বাড়ি। এখন মিলে গেছে দু'পক্ষতে। তার কারণও তো এই বাড়ি। গৌড়েশ্বর বলল, আমি হাঁক মারছি, আপনি নীচে যান।

বিজন নামল না। গৌড়েশ্বর হাঁক মারল, অ্যাই অ্যাই, চাঁদমণি, অ্যাই দুধে কই, অ্যাই চাঁদমণি এদিকে আয়, চাঁদমণি এই।

বিজন দেখল সে উঠে দাঁড়াল। আঁচল উড়িয়ে আসতে লাগল এদিকে। বিজন দেখতে লাগল।

সেদিন বিজনকুমার বসুর কলকাতা ফিরতে রাত হয়েছিল। তার মুখ দেখে কবিতা জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তোমার?

কিছু না।

চাবি পেলে, এনেছ?

বিজন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ধূলিহরে ফেরা যায় না কবিতা, হয় না, কবিতা হয় না।

তবে কী করবে?

ভাবছি।

ভাবছিল বিজন সমস্ত রাত ধরে। কবিতা ঘুমিয়ে পড়লে জানালার কোলে বসে ভেবেছিল কালো আলোর রূপটি। অন্ধকারের মতো গায়ের রং কিন্তু

সমস্ত অঙ্গে দ্যুতি। বিজনকে সে দেখিয়েছে—এই দ্যাখো বাবু, আমার এই আছে দাদাবাবু, আমারে রাখবা না? বলতে বলতে ঝপ করে গায়ের ব্লাউজ খুলে ফেলে বলেছিল, দ্যাখো বাবু, আমার রাখলি ক্ষতি হবেনি। তারপর কোমরের আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে বলেছিল, রাখার আগে সব দেখে নিতে হবে তো বাবু, সব দেখে নাও।

মাথা নামিয়ে শিহরিত বিজন বলেছিল, ঠিক আছে ঠিক আছে, পরে জানাব।

জানিয়ো বাবু, নাহলি আমার অন্য বাবু খুঁজতি হবে।

ঠিক আছে, এবার যাও।

সায়ার দড়িতে গিঁট দিতে দিতে কোনোরকমে গায়ে কাপড় ফেলে সে বলেছিল, তাড়াতাড়ি খপর দিয়ো বাবু, তুমি যেভাবে বলবা সেভাবে আমি সেবা করব, মাথায় দুটো মদ্দ পুরুষ ভাত দিতে হবে তো মুখি।

জানাব, তাড়াতাড়িই! বিজন কোনোরকমে বলেছিল।

সে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাইরে তখন ঘন তমিস্রা। অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে গৌড়েশ্বর বলেছিল, রাখুন চিন্তা নেই, কেউ কোনো খোঁজ দেবে না, কাজের লোকও তো লাগে।

জানাব পরে।

তাড়াতাড়ি জানাবেন, না হলে ওরে অন্য লোক দেখতে হবে, ঘাড়ে দুটো পুষ্যি, খেতে পাচ্ছে না, আমার কাছে ধার করে চাল নে গেছে আজ।

পরে আর কবে জানাবে বিজন? এখন সে ধূলিহর ত্যাগ করবে হয়ত আমতলির মতোই। পিতৃপুরুষের পাপ কি এত সহজে ছাড়ে? অন্ধকারে জেগে থাকল বিজন। কীভাবে ধূলিহর ছেড়ে আসবে তা ভাবতে ভাবতে রাত কাবার। এমনই তো হয়েছে চিরকাল।

দ্বিতীয় পর্ব

বিজন ছ'মাসের ভিতরে লাল মেঝে ভেঙে পাথর বসাল গৌড়েশ্বরের প্ররোচনায়। টাইলস বসাল বাথরুমে। ধূলিহরকে সুন্দর করতে হবে না? এখন এ বাড়ির উপরে গৌড়েশ্বরের লোভ হয়েছে খুব। এমন পাকা দালান, টাইলস বসানো বাথরুমে স্নান, মেঝেতে পাথর, হবে না? সে হলো ধীবর বংশ। মাছ ধরাই ছিল জীবিকা। এখন ভেড়িগুলো ক্রমাগত মাটি চাপা পড়ছে। জল উধাও হয়ে যাচ্ছে। মাছ আর ধরবে কোথায়? তার ছোট ছেলেটা অবশ্য চাঁদের ভেড়িতে কাজ করে। কাজ মানে ভেড়ি ম্যানেজমেন্ট। মাছ চুরি রোখা। রাতে ছয় সেলের টর্চ নিয়ে ভেড়ির ধারে টং-এ বসে থাকা। সে নাকি চেম্বার রাখে সঙ্গে। চেম্বার হলো পিস্তল। যেমন পাহারা দেয় ভেড়ি, তেমনি দরকারে জলে নামে ও। মাছ ধরাতেও দড়। জাল টানে কী!

এসব কথা গৌড়েশ্বর তার ঘরে বসে তারই খাটে শুয়ে পা নাচিয়ে যখন বলে, বিজনকুমার বসু ভাবে সত্যি সত্যি ফিরে যাচ্ছে নাকি ধূলিহর-এ? সে হলো কলকাতার বাসিন্দা। মেট্রো রেল, কম্পিউটার আর টিভি সিরিয়ালের যুগে বসবাস করে। এ কোথায় ফিরছে? মনে হচ্ছে সে নয়, বসে আছে তার ঠাকুর্দা দুর্গাদাস, অথবা তাঁর পিতাঠাকুর অনন্তকুমার। আর গৌড়েশ্বর সেই একশো বছর আগে থেকে হেঁটে এসেছে এই একবিংশ শতাব্দীতে। বিজনের পূর্বজন্মের মানুষ সে। তার কাছে ঋণ করে শোধ দেওয়ার সময় পায়নি। অথবা শোধ দেয়নি, সেই ঋণই শোধ করছে এখন। তার ঘরে গৌড়েশ্বর আরাম করছে। সে বসে আছে কলকাতার আধো অন্ধকার ফ্ল্যাট বাড়িতে। এই মুহূর্তে সে দেখতে এসেছে তার নিজ হাতে গড়া পাকা দালানখানি। গৌড়েশ্বর বলছে, দাদা, আপনিও নিশ্চিন্ত আমিও নিশ্চিন্ত, বাড়িটা থাকবে ভালো ভাবে, জানালা দরজা খোলা হবে বন্ধ হবে, ঘরে হাওয়া খেলবে, ঘরদোর বন্ধ করে রাখলে ভালো থাকে না।

বিজন আজ ঠিকই করে এসেছে বলবে, গৌড়াবাবু, আর না, আমার বাড়ি আমার হাতের তলায় বন্ধ থাকুক, আপনি আপনার বাড়িতে গিয়ে থাকুন।

গৌড়াবাবুর বাড়ি তো ওই। বারোফুট রাস্তার ওপারে। অ্যাসবেস্টসের

ছাউনি। লম্বাটে এক জমির উপর লম্বাটে বাড়ি। বিজনের যখন বাড়ি হয়, তার সিমেন্ট ইট বালিতে ওইবাবুর বাথরুম গড়া হয়েছিল যে তা সে নিজের চোখে দেখেছে। গৌড়াবাবুর ভাঙাসিঁড়ি সংস্কার হয়েছিল তাও বিজন জানে। একবার মিস্ত্রিদের বলতে গিয়েছিল, তারা কী বিস্ময়েই না সব অস্বীকার করেছিল, না বাবু, মালমেটিরিয়াল উনিই কিনে দিয়েছেন, আমরা শুধু বানিয়ে দিয়েছি তাও রাত্তিরে আলো জ্বালিয়ে।

গৌড়াবাবু, গৌড়েশ্বর মণ্ডল বলল, ছোটছেলেটাকে নিয়ে ভয় করে দাদা, এর ভিতরে দুবার হাজত বাস করেছে।

কেন, কী করল?

ওই ভেড়ির গোলমাল, ভেড়ি বোজানো হচ্ছিল জোতভীম মৌজায়, ওদিককার লোক বাধা দিয়েছিল।

আপনার ছেলে জলরক্ষা করে না?

এখন তাই করে!

তখন কী করত?

ভেড়ি বোজাচ্ছিল, ওখানে বাবুদের ফুর্তির গ্রাম হবে, বেদের গ্রাম, মানে রামায়ণ মহাভারতের যুগে যেমন গ্রাম ছিল।

ছেলে দুই কাজই করে?

গৌড়েশ্বর বলল, হ্যাঁ করে, কিন্তু ওর যে অন্য দোষও হচ্ছে, কী করি দাদা, ও যে রাতে ভেড়ি পাহারায় থাকে, সঙ্গে একটা মেয়েমানুষ রাখে।

কী করবেন যুগ এমন।

না না রাখুক না, কিন্তু আড়ালে আবডালে তো থাকবে, ঘরে তোর বউ সে জানতে পারলে কি ভাল হয়?

কী করে জানল?

ওর ব্যাগে ইয়ে মানে ওই জিনিসের প্যাকেট পেয়েছে বউমা, তিনটের প্যাকেটে একটা পড়ে আছে, বাড়িতে বড় অশান্তি, সেও তো খুব মুখরা মেয়ে, দজ্জাল, সাহসী, তাকে নিয়ে তো আমার ছেলে ভূতেশ্বর পালিয়ে এসেছিল মথুরাপুর থেকে ও তো আসল কেস্তান।

বিজন ভাবছিল বলে, থাক গৌড়াবাবু থাক, আপনার ফ্যামিলির কথা শুনে আমার কী লাভ, কীই বা করব। কিন্তু বলা তো হলোই না, বরং সে নিজের কৌতূহল প্রকাশ করছে একটু একটু। ধূলিহরবাসীর যা হওয়ার দরকার ছিল, তাইই হয়ে যাচ্ছে বিজন। তার গড়ে তোলা এই পাকা দালানের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে ধূলিহর লিখে সে পূর্ববঙ্গের সেই গ্রামকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে যখন, এসব তো শুনতে হবে। এসবেই তো দিন কাটবে।

খ্রিস্টান মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন?

ও আমি দেখিছি দাদা, কেস্তান হলেও লক্ষ্মীপুজো করে, কালীসাধক ওর বাবা, আবার বড়দিনে যীশুর গানও গায়, কেমন সোন্দর।

ওদিকে অনেক খ্রিস্টান আছে?

হ্যাঁ ওদের গাঁয় প্রায় সব কেস্তান, বড় গির্জে আছে, যীশুর নাম গান হয়, বোশেখ মাসে তাঁর নামে অষ্টপহরও লাগায়, যীশুর কেত্তন।

বিজন বলল, আপনাদের এদিকেও তো আছে।

আছে, কেষ্টপুর যান, দুখানা গির্জে, আমার মতো লোকের নাম সব আবরাহাম, যোশেফ, চার্লস এইসব।

বউমার নাম কী?

ওর নাম ছিল সারা, আমি সরস্বতী করে দিইছি, সরো বলে ডাকি, কিন্তু ছেলে ডাকে সারা বলে।

বিজন বলল, খুব ভালো খুব ভালো।

একদম ভালো না, কেস্তানের চোপা কী, সব গুছোয় নিয়ে হাঁটছিল ছেলে মেয়ে নিয়ে, আমি আটকেছি অতিকষ্টে, নাতি-নাতনি ছাড়া জীবনে কী আছে বলুন, ওদের নিয়ে এ ঘরে শুই।

বিজন বোস পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়, বলে আমার এ বাড়ির কী হবে, মানে বাড়িটা করলাম কেন?

সে তো আপনি জানেন।

ধূলিহর স্থাপন করতে চেয়েছি তো এখেনে।

তা তো করেছেন দাদা। বাকিটা তো করলেন না, রাখনি রাখলেন না।

আমি যদি না আসি কী করে হলো ধূলিহর?

গৌড়েশ্বর হেসে বলে, সে আপনার ইচ্ছে, আসতে হলে আসবেন, না আসতে হলে আসবেন না, বাড়ি থাকবে যেমন আছে, আসলে আপনাদের কত আছে, এটুকু একখানা বাড়ির জন্য কি মায়া থাকবে?

বিজন গুম হয়ে গেল। মায়া কি তার নেই, আছে। কিন্তু এ মায়া কতদিন থাকবে? দু চার-বছরেও যদি না আসতে পারে, মায়া কি ছেড়ে যাবে না তাকে? তার বাবার তো গিয়েছিল। কী সুন্দর বাড়িটা প্রায় দান করে দিলেন সন্তোষ চক্রবর্তীকে। আমতলির নাম করতেন না কখনো।

বিজন প্রসঙ্গ বদলায়। না বদলালে এখান থেকে যখন ফিরবে অন্ধকারে, মন হয়ে থাকবে ভার। সে জিজ্ঞেস করল, দুধকুমারের খবর কী? আর সেই ভগবান মণ্ডল?

গৌড়েশ্বর হাসল, বলল, আসলে তো ওদের বউটার কথা জিজ্ঞেস করছেন তাই না, ঘুরিয়ে নাক।

না না এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

এমনি কিছু হয় না দাদা, আপনি তো শুধু শুধু ভয় পেলেন, আমি থাকতে কেউ আপনার সামনে গলা তুলে কথা বলতে সাহস করত না।

বিজন ঢোঁক গিলল, বলল থাক ওসব কথা।

থাকবে কেন, অমন ডাঁটো একটা মেয়েমানুষ, বাড়িটা করেছেন কেন, কাজে তো লাগাবেন। এটা আপনার বাগান বাড়ি করুন। মেহফিল বসুক, দুধকুমারের বউ তো নিজে বলল আপনাকে।

ও হয় না গৌড়াবাবু।

খুব হয়, আমি আপনার ঘরে ঢুকিয়ে দেব, রাত্তিরে থাকুন।

বিজনকুমার বসু মাথা ঝাঁকাতে লাগল। গৌড়েশ্বর বর্ণনা দিচ্ছে দুধকুমারের বউ চাঁদনির।

আপনার যদি দুধকুমারের কালো বউকে পছন্দ না হয় আমি অন্য দেখতে পারি।

সে কে?

এলে দেখবেন, তেমনই আনব।

বিজনের তখন মনে পড়ে যায় তার পূর্বপুরুষ কালিদাস বসুর কথা। সে কি সেই পথে যাচ্ছে? না হলে গৌড়েশ্বর মণ্ডল তার ঘরে বসে তাকে এইসব প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছে আর সে কিনা শুনে যাচ্ছে মন দিয়ে। কালিদাস বসুর ডাইরেক্ট বংশধর সে নয় বটে, কিন্তু তার ঠাকুর্দা দুর্গাদাসের সঙ্গে সেই মানুষটার রক্তের সম্পর্ক তো ছিল। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই। তারপর দুই নদী দুই দিকে প্রবাহিত হয়েছে। একটা সময় তো এক ছিল। একজায়গা থেকেই তো এসেছিল কালিদাস আর তার ঠাকুর্দা দুর্গাদাস। একরক্ত। সেই রক্তের ছিটে ফোঁটা কি তার ভিতরে আসেনি? এসেছে বলেই না গৌড়েশ্বর বলে যাচ্ছে মেয়েমানুষের কথা, আর সে দিব্যি শুনে যাচ্ছে। অথচ এতদিন তো এসব কথা মাথায়ও আসেনি। তার সহকর্মীরা কতরকম কথা বলে সমস্ত দিন ধরে, কতজন কতজনের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত গোপন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে সেইসব বিবরণ দেয়। প্রদীপ তো ঘুরেই এল মল্লিকাকে নিয়ে সমস্ত দিন ডায়মন্ডহারবার। কই তেমন ইচ্ছে তো তার কখনো হয়নি। তার দিকে কি কেউ আসেনি? এসেছে এসেছে। বিজন বদলি নিয়ে সরে গেছে। সরে আসার পরও কি সে আসেনি? বিজন নির্বিকার থেকেছে। অথচ এই ধূলিহর গড়ে তোলার পর থেকে যেন সে এইপথে পা বাড়াচ্ছে একটু একটু করে। না হলে সে কী করে দুধকুমার নামের ওই তাড়িখোর অকম্মা লোকটির সঙ্গে তার ঘর পালানো বউ-এর খোঁজে ভোজেরহাট গিয়ে সেই বউটির বজ্র ও বিদ্যুৎ প্রত্যক্ষ করে মাতাল হয়।

গৌড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করল, কী ভাবছেন?

কিছু না।

কিছু না কেন, কিছু তো বটে।

আমি একটা কথা নিয়ে এসেছিলাম।

কোনো কথা আমি জানি।

বিজন বলল, না জানেন না।

গৌড়েশ্বর মণ্ডল বলল, বলছি তো জানি, আপনার কোনো চিন্তা নেই দাদা, যেদিন বলবেন সেদিনই ঘর ছেড়ে দেব, আমার তো বাড়ি আছে, তবে পাকা ছাদ নেই সত্যি, তাতেই বা হলো কী, আমার যা আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

কথাটা আরো পরে শেষ করল গৌড়েশ্বর। আর বিজন একটু লজ্জাই পেল। সত্যিই তো গৌড়েশ্বর আছে বলে সে কত নিশ্চিন্ত। তার দরজা-জানালা ঠিক আছে। তার ঘরে সমস্ত দিন হাওয়া খেলে। ওর ছোট ছেলের বউ পাথর বসানো শাদা মেঝে জল ন্যাকড়া দিয়ে মুছে তকতকে করে রাখে। ঘরে ঝুল নেই একটুও। ঠিক যেভাবে নিজের বাড়ি রাখে সেইভাবে রেখেছে। দেওয়ালে ক্যালেন্ডারও ঝুলিয়েছে শিব-পার্বতীর, গোপিনীদের বস্ত্রহরণের ছবি সমেত। এখন সুতোয় লেখা 'সোনার হরিণ কোন বনেতে থাকো' ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলে এ বাড়ি গৌড়েশ্বর মণ্ডলের ছাড়া আর কারো হবে না। কিন্তু ও যা বলছে তারপর আর কিছু বলা যায় না। বিজন বলল, না না তা নয়, আসলে আমি তো ফ্যামিলি নিয়ে কখনো সখনো আসতে পারি।

আসবেন, আগের দিন ফোনে বলে দিলে সব বের করে নেব, বউদি টেরও পাবে না, ঘর ধুয়ে রেখে দেব দাদা, আর যদি সত্যি চান আমি আজই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আমার কী, এ খাটের বদলে ও খাটে গিয়ে শোব।

না না তা বলছি না, থাক এসব কথা। বিজন কথাটা থামাল।

হ্যাঁ দাদা থাক, আসল কথাটা হয়েও হচ্ছে না, বলছি আসুন না কোনো শনিবারে, আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব, এখেনে সব পাওয়া যায়, হুইস্কি, রাম, ভদকা, জিন একেবারে আসল মাল, আবার দিশিও পাবেন।

বিজন বলল, আমি ও রসে বঞ্চিত।

সত্যিই বঞ্চিত! এমন একখানা বাড়ি করে তার নাম দিলেন ধূলিহর, এমন ভাবে জড়িয়ে দিলেন বাড়ির গায়ে, কী করে বঞ্চিত হবেন?

কেন? তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

এ কাজ তো মাতালে করে, না হলে কলকাতার লোক এই এখেনে এসে বাড়ি করে, এ কাজ নেশাখোর মাতালের।

আগে তো বলেননি?

আগে কী বলব দাদা, মাতাল মানে খারাপ বলিনি, বলছি আর পাঁচজনের থেকে আলাদা, আনন্দে আপনি আপনার দেশের বাড়ি, পূর্ববঙ্গের ধূলিহরকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এখেনে, লোকে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে না, মন্দির প্রতিষ্ঠা করে না, এ হয়েছে সেই কাজ, এখন ধূলিহরকে নিয়ে আনন্দ করবেন না?

বিজনকুমার বসু অবাক হয়ে শুনছিল গৌড়েশ্বরের কথা। কথাগুলি তো বেশ লাগছে! মনের মতো লাগছে। গৌড়েশ্বর বলছে কলকাতা থেকে কেউ এই জগৎপুরে আসে? শহর তাও আবার কলকাতার মতো সিটি ছেড়ে এমন প্রায় পাড়া গাঁয়ে কেউ ফেরে? মন খারাপ হতো না সত্যিকারের ফিরলে?

বিজন বলল, ওই যে ওই মাঠের ধারে প্লটিং করে জমি তো বিক্রি হচ্ছে, লোক তো আসছে, আমি তো একা আসিনি।

গৌড়েশ্বর বলল, কোথা থেকে আসছে, না আরো গ্রাম থেকে, ওই বাসন্তী, সোনাখালি, ভাঙড়, মসজিদ বাড়ি, এমন কী সুন্দরবনের নানা দ্বীপ থেকে আসছে, তারা তো শহরেই আসছে, ওসব জায়গার তুলনায় জগৎপুর তো বড় শহর বলা যায়, কিন্তু কলকাতা থেকে লোক আসবে কেন?

বিজন চুপ থাকল। গৌড়েশ্বর লোকটা একদম ভালো নয়। ওর কথাবার্তা, ওর চোখ কোনটাই ভালো নয়—একথা কবিতার। কবিতাই বিজনকে বারবার বলছে কৌশলে ঘর পাহারা দেবার নামে লোকটা ঢুকে পড়েছে তাদের ধূলিহরে। অবিলম্বে ওকে বের করে নেওয়া দরকার। কিন্তু যে কথা বলছে গৌড়েশ্বর তাতে তো ওকে খুব খারাপ মনে হচ্ছে না। বলছে নিজের বাসনাকে পূরণ করতে এই ধূলিহরের প্রতিষ্ঠা। এখন বিজনের উচিত পূর্বপুরুষের গাঁয়ে ফিরে পূর্বপুরুষের মতো জীবন কাটানো। তাঁদের কাজ করতে হতো না। জমির ধানে, জমির ফসলে সব হত। সারাবছর তাস পাশা আর মাঝে মধ্যে ওসব কি হত না? ঠিক হতো। বিজনবাবু আপনি ধূলিহরের বাসিন্দা তো হতেই পারেন সপ্তাহে একবার। আপনার কল্পনা সার্থক হয়েছে। এবার আর এক জীবন আরম্ভ হোক।

দুই

ঘরে আর ভালো লাগছিল না। বিজন সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল। এখন গোধূলিবেলা। ওই যে দূরে দুধকুমারের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ির সামনের মাঠে কেউ নেই। ঘর আছে বটে। পারলেই সবাই বাইরে থাকে তাই দেখেছে বিজন। ভিতরটা তো গুমট। ও বাড়িতে আলো পাখাও নেই। বিজনের

পাশাপাশি উঠে এসেছে গৌড়েশ্বরও। যেন তাকে চোখে চোখে রাখছে। ইস! এখন তো বিজন একা হতে চায়। ছাদে দাঁড়িয়ে দূর বহুদূর জগৎপুরের সীমার দিকে তাকিয়ে অসীম হতে চায়। সে বলল, আমি একটু একা থাকি।

কেন, ফোন করবেন মোবাইলে?

না না ফোন কেন?

বলছি দাদা দোতলাটা তো করবেন?

করব, সেই রকমই তো ভেবেছি।

কবে আরম্ভ করবেন?

পরে কথা হবে।

এবার তো আমি আছি। বলে গৌড়েশ্বর তার গা ঘেষে দাঁড়ায়।

বিজন সরে গেল। লোকটা যেন তার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। দূরে কাউকে না দেখে বিজন ছাদের উপর ঘুরতে লাগল। যে তিনদিন তারা এখানে ছিল গৃহপ্রবেশ করে, সেই সময় সন্ধের পর তারা ছাদে উঠে আসত। গল্প করতে করতে আচমকা আকাশে তাকিয়ে চুপচাপ। মনে পড়ে যাচ্ছে বিজনের। লক্ষ তারার ক'টাই বা সে চেনে? তার ছেলের তখন খুব কৌতূহল হয়েছিল, বছর দশ বয়স। তাকে বলেছিল, বাবা আমি তারা দেখলে কেমন যেন হয়ে যাই। কী রকম যেন হয়ে যায় ভিতরটা!

কী হয় রে তোর? জিজ্ঞেস করেছিল কবিতা।

কী জানি কী হয়, মা রাতটাই সবচেয়ে সুন্দর এখানে।

হ্যাঁ রাতই সুন্দর এই জগৎপুরে। সন্ধে হতে না হতে সব কেমন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এই যে গৌড়েশ্বর দিনে যার এত দাপট, সেও কেমন এলিয়ে পড়ে অন্ধকার নামলে। ঘরে বসে টেলিভিশনে উত্তম সুচিত্রার সিনেমা দ্যাখে। আর যদি তাও না থাকে ঘুমিয়ে পড়ে। এখন তো তার খাটেই ঘুমোয় চিত হয়ে। তাদের ধূলিহরেও কি এমনি হত না? সারাদিন তাস পাশা খেলে, কূটকচালি করে নিষ্কর্মারা সন্ধেয় ক্লান্ত হয়ে যেত ঠিক। তবে কেউ কেউ, মা বলতেন, তার বাবার ছিল পড়াশোনার নেশা, কত রাত অবধি হেরিকেনের আলোর সামনে বসে রবীন্দ্রনাথ পড়তেন। বঙ্কিম পড়তেন। বাবার পড়া থেকে মায়ের ভিতরেও ওই নেশা জড়িয়ে গিয়েছিল। পোস্টে ভারতবর্ষ আসত। বিচিত্রা আসত। শনিবারের চিঠি। মায়ের কাছেই ধূলিহরের গল্প শুনেছে বিজন বেশি। মা খুব সুন্দর কথক ছিলেন। কথার ভিতরে অদ্ভুত এক জাদু ছিল। মা তাঁর বাবার মানে বিজনের দাদামশায়ের মৃত্যুর কথা এমন হৃদয়বিদারক করে তুলতেন তাদের কাছে, যে চোখে জল এসে যেত। কোনো অখ্যাত রেল স্টেশনের মাস্টারবাবু একা একা বিদেশ বিভুঁয়ে মারা যাচ্ছেন কালান্তক

ম্যালেরিয়া জ্বরে। মা চমৎকার ভূতের গল্প শোনাতেন। সেও তাঁর বাবাকে জড়িয়ে। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়েছিলেন কিনা। সেই বিদেহী আত্মা তাঁর বাবাকে পাহারা দিত রাতভর। জ্বরের রাতে বসে থাকত দরজায়। ইতনা রাতমে কৌন পানি দেগারে, হামি লিয়ে আসি—!

ঘুরে বিজন জিজ্ঞেস করল, এখেনে ভূত আছে?

চমকে ওঠে গৌড়েশ্বর, ভূত! আপনি কি বিশ্বাস করেন?

আপনি?

করি দাদা, তবে এখন আর দেখি না।

নেই!

আছে, ওই জন্যেই তো বললাম খালি ঘর না রাখা ভালো, বউমা সন্ধে দেয়, ধূপ দেয়, লক্ষ্মীর পট রেখেছে ভিতরে, দেখেছেন?

না তো।

জল মিষ্টি দেয়, আবার যীশুকেও রেখেছে, তারেও দেয়।

বিজন বলল, কোন ঘরে?

ভিতরে তো আজ যাননি।

কথা শুনছিল যখন বিজন তখন শাঁখ বেজে উঠল। খ্রিস্টান বাপ মায়ের মেয়ে হিন্দু শ্বশুরঘরে এসে আনন্দে শঙ্খধ্বনি করছে। সন্ধে হল। দিনমণি অস্ত গেছেন। আঁধারে ঢেকেছে জগৎ। রাতের সময় বড় ভয় লাগে। কী রকম একা একা মনে হয়। তাই শঙ্খধ্বনি করে সাড়া নিচ্ছি। জেগে আছ তো। শৃগাল ব্যাঘ্রেরা ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠছে, দুয়ারে আগল দাও, ঘরে ঘরে দীপ জ্বালাও—বিজন বলল, চলুন নীচে যাই, দেখি কী করছে আপনার বউমা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গৌড়েশ্বর বলল, ওর খুব ইচ্ছে যতদিন আপনি না আসেন, স্বামী-পুত্তুর নিয়ে এ বাড়িতে সংসার পাতে।

তা কী করে হয়?

হয় না দাদা, তবে কিনা রাত্তিরে শোয়া করতে পারে, বাথরুমে চান করতে পারে, দরকারে কিচেনে এটা-ওটা।

না।

জানি আপনি না করবেন, কেনই বা হাঁ করবেন, তবে কিনা বাড়ি তো খালিই পড়ে আছে, আমি একটা বুড়ো মানুষ, এ বাড়ি বুড়ো মানুষের বাসস্থান হতে জন্মায়নি, বাড়ির অন্য সাধ থাকে, বাসনা থাকে।

শঙ্খধ্বনি থেমে গেছে। নীচে নেমে বিজন দেখল সব ঘরে আলো জ্বলছে। একটু উগ্রগন্ধের সস্তার ধূপের ধোঁয়া ছড়িয়ে গেছে ঘরে ঘরে। ভিতরের ঘরে ঢুকে বিজন অবাক। দেওয়ালের গায়ে পেরেক মেরে লক্ষ্মীনারায়ণ, যীশু আর

তাদের মাথার উপরে জটাজুটধারী শিবঠাকুর। দেবদেবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ধূপ ঘুরিয়েই যাচ্ছে মণ্ডলের পুত্রবধূ সারা নাকি সরস্বতী। ছোটখাটো বছর তেইশ চব্বিশের সারা এর ভিতরেই দুই সন্তানের মা। তার স্বামী ভূতেশ্বরের হাত ব্যাগে ওই জিনিসের প্যাকেটে দুটি ছিল না, একটি ছিল, এটি দেখার পর সারা এখন হিন্দু-খ্রিস্টান দুই মতেই মন দিয়েছে বেশি। বুঝতে পারছে যীশু ঠাকুর কিংবা লক্ষ্মীনারায়ণ, মহাদেব ছাড়া তার স্বামীর পুরো দখল কেউ দিতে পারবে না তাকে। স্বামী যে চলে গেছে তাও নয়। স্বামী কোনওদিন তাকে বুঝতেই দেয়নি সে আর একজনের সঙ্গে ভেড়িতে রাত কাটায়। ব্যাগ থেকে টাকা সরাতে গিয়ে হাতে পড়েছিল ওই প্যাকেট। তারা যা ব্যবহার করে তা হেলথ সেন্টারের এক আয়া দিদি ফ্রি-তে এনে দেয় সারাকে। স্বামী ভূতেশ্বরের ব্যাগে যা পেয়েছে তা বিলিতি। কী বাহারি প্যাকেট, উপরে আদম ইভের ছবি, ইস! আদম ইভ পিতামাতা—আদি পিতা আদি মাতা—তাদের গাঁয়ে এসেছিল মগরাহাট থেকে এক কীর্তনিয়ার দল—

আদি নারী আদি পুরুষ
আদম ইভ নাম।
যেমতি ছিল রাধারানি
তাহার সহিত শ্যাম।

ও প্যাকেট কেন?

বাড়ির জন্য এনেছি, মানে আমাদের জন্য। ভূতেশ্বর কুঁকড়ে গিয়েছিল।

গৌড়েশ্বর তার ছেলে বউমার কাহিনি চাপা স্বরে বলল, সেই প্যাকেট ছুঁড়ে দিল বউমা রাস্তায়। পড়বি তো পড় আমার পায়ের সামনে। পায়চারি করছিলাম ওখানে। খুব ঠেঁটা বউ। কেস্তানরা কি অমনি হয়? ছাড়ে না কিছুতে। মেনেও নেয় না। আচ্ছা এসব কি পাড়া জানানোর কথা! স্বামী দিনের পর দিন নাইট ডিউটি করে। সোমত্ত পুরুষ, তার লাগতে পারে। যদি তা হয়েও থাকে তা নিয়ে শোরগোল কেন?

এসব কথা বলতে গিয়েছিল গৌড়েশ্বর, শুনে বউমা বলেছিল, কেন ও শুধু একা থাকে রাত্তিরে, আমি একা থাকিনে?

আহা ও তো পুরুষমানুষ।

ইস! ছেলের দোষ মোটে দেখতি পাও না বাবা, সেই জন্যে ছেলের এত সাহস, আমি যাব এবার সঙ্গে।

কোথায় যাবি?

কেন সোয়ামীর সঙ্গে।

ভেড়িতে নাইট গার্ডে? গৌড়েশ্বর অবাক হয়েছিল।

তাই যাব।

তোর মাথাটা গেছে!

বুঝিয়েছিল গৌড়েশ্বরের বউও। অনেক রকমভাবে বোঝাতে চেয়েছিল পুরুষ মানুষের ওরকম দোষ থাকে একটু আধটু। সব দেখলে চলে না। সংসার তাতে অচল হয়। শুনতে শুনতে সারা হালদার বিয়ের পর সারা মণ্ডল বলেছিল, তোমার সোয়ামির ছিল এমন, জানতে তুমি?

কী সব বলছিস, শ্বশুর না গুরুজন!

দুজনায় গুরুজন তোমরা, আমার ভূতেশ্বর সোয়ামীও গুরুজন, কিন্তু পারব না সোয়ামির ভাগ দিতে, ওর বিষ ঝেড়ে দেব আমি।

ক'দিন ধরে খুব গর্জেছিল সারা। কম বয়স তো, খুব তেজ। কখনো রোখ ছেড়ে কেঁদেছে, কখনো আঁচড়েছে ভূতেশ্বরকে দিনের বেলায়। দিনদুপুরে তাকে টানতে টানতে এ বাড়ি এসে ঢুকেছে। ভিতরে তার শ্বশুর গৌড়েশ্বরকে দেখে বলছে, বাবা তুমি ও বাড়ি যাও, আমার সঙ্গে ওর বোঝাপড়া আছে।

ওই মূর্তি দেখে গৌড়েশ্বর বেরিয়ে যেতেই দরজায় খিল তুলে দিয়েছে তার বউমা। জানালা টেনে দিয়েছে ফটাফট। কোনওরকম রাখঢাক নেই। চাপা গলায় কথা বলছিল ভিতরে, কানে আঙুল দিতে হয়, তবে আমি কি কম আছি, আমার চেয়ে সে ভাল, এমনি পারবে?

থাক গৌড়াবাবু।

গৌড়েশ্বর উঠল, বলল দেখি চা হল কিনা, ছোট বউমা তো এখেনে ধূপ ধুনো দিচ্ছে, আরে দাদা কিছু কিছু মেয়েছেলে আছে যারা সবসময় এক একটা গোলমাল পাকিয়েই রাখে, আমার ছেলের কী দোষ! দিনের পর দিন রাতে ডিউটি দিতে হবে, পারে কেউ?

হয়েছে, আর না।

কী বলব দাদা, এসব কেস্তানদের রোখ 'বেশি, তুই ঘরে বসে ছেলেমেয়ে বড় কর, সব ব্যাপারে মাথা গলাবি কেন?

গৌড়েশ্বর কথা শেষ করেই আর থাকল না। দ্রুতপায়ে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর সে মিলিয়ে যেতেই জ্বলন্ত ধূপ হাতে সারা ঢুকল ভিতরে, কাকাবাবু সব শুনলেন?

বিজন দেখল দুটো চোখ জ্বলছে যেন। অথচ মুখখানি কী ঢলঢলে!

সারার রূপ আছে। গায়ের রংটি তামাটে হয়ে যাওয়া ধবল। ঢলঢলে মুখের যে ভাবটি তা একটু আলাদা। ছিপছিপে যুবতী শরীর। ঠিকঠাক পোশাক, জিনস, স্কার্ট পরিয়ে চুলে পনিটেল করে একে দিব্যি সিটি সেন্টার, শপিং মল-এ ছেড়ে দেওয়া যায়। হাইহিলে খটখটু হাঁটবে। বিজন বলে, কী শুনব?

আমার নিন্দা শোননি তুমি?

কেন শুনব, তুমিতো আমাদের ছোট বউ।

টেলিং লাই কাকাবাবু, বাবা কী বলেছে আমার নামে?

কিছু বলেনি।

না বলেছে, আমি তখন ওঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সব শুনেছি, বলি বেটাছেলে বলে তোমাদের সাতখুন মাপ।

না, না তা কেন হবে?

হচ্ছে তো, অমন বেটা আমার হলে ত্যাজ্য করে দিতাম।

তাতে তোমার কী হতো?

সুড়সুড় করে ফিরে এসে ক্ষমা চাইত, বলে কিনা মেনে নিতে, উনি কেন রাতে যান দিনের পর দিন এতদিনে বুঝলাম, আমার রাতটা রাত নয়, আরে আমি তারে দেখেছি, আমার নখের যুগ্যিও নয়, কিন্তু ওই যে সর্পরূপী ভগবান বিষাইল সে জনে, আদম ইভের গান।

বিজন বলল, ওয়েট করো ফিরে আসবে।

নাহ! বিষ না ঝাড়ালি হবে না কাকা, বেটাছেলে হল নেমকহারাম জাত, মেয়েমানুষ পেলেই হল, হামলে পড়বে, যেমন বাপ তেমনি তার বেটা।

থাক, তুমি তো আমার ঘরটাকে মন্দির বানিয়ে দিয়েছ।

দিয়েছি, ও বাড়ি অপবিত্র তাই এ বাড়িতে।

ও বাড়ি তো তোমার শ্বশুরবাড়ি।

তা হোক, আমার ঘেন্না করছে, সেই প্যাকেটে ল্যাংটো মেয়ে পুরুষের ছবি, সোয়ামি বলে আদম ইভ! ইস আদম ইভ ভগবান, তার সঙ্গে তুলনা! আমার ধম্মো গেছে, এবার সব যাবে, আঙ্কেল যদি এ ঘরে থাকি?

এখানে তো তোমার শ্বশুরমশায় থাকেন।

থাকবে না, নিজের বাড়ি নিজের ঘরে চলে যাবে, দেখুন না, এমন নোংরা করে রেখেছে বিছানাটাকে, সেই আমি পরিষ্কার করলে তবে হবে, আমি করছিনে, আমি তোদের দাসী না বাঁদী, আমার সোয়ামী আমারে ছেড়ে অন্য মেয়ে ধরবে, আর আমি তোদের বিছানা ধোব, পারব না।

বিজন বুঝতে পারছিল রাখঢাক নেই একদম। যেমন বাইরে থেকে শান্ত মনে হয়, আসলে তা নয়। খুব একরোখা, কিন্তু রোখ যে রাখতে পারছে না তাও ধরা যাচ্ছে অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দেখে। মেঝেতে বসে পড়েছে সারা। বলছে, কাকাবাবু আঙ্কেল, আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই নোংরা, ওরা কেউ ভাল না, আমার সোয়ামি ভাল ছিল, সেও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একদম এদের বিশ্বাস করবেন না। জগৎপুরের গৌড়া মণ্ডলের সব দিক দিয়ে খ্যাতি, বিয়ের পরও

আমার মা বাপের কাছ থেকে তিরিশ হাজার দাবি করেছিল, আমি বলেছিলাম গলায় দড়ি দিয়ে তোমাদের ফাঁসিয়ে দেব, তখন থেমেছিল।

শ্বশুরবাড়ির কথা এভাবে বলতে নেই, এটা এখন তোমারও বাড়ি।

না, আমি আমার সোয়ামি নিয়ে উঠে যাব, জমি দেখতি বলেছি ওই দিকে, হ্যাঁ, কাকাবাবু আপনি বাবারে বলুন ঘর ছেড়ে দিতে, আমি থাকব এখেনে, আপনারা তো আসছেন না এখন।

বিজন এই ভয়ই করছিল। ছোটছেলে ছোটবউ তার দুটো বাচ্চাকে ঢুকিয়ে দিয়ে গৌড়েশ্বর মণ্ডল নিজের ঘরে ফিরে যাবে। একটা ঘরে হচ্ছে না। পুরো বাড়িটা দখল করতে চায়। তাহলে সারা ভূতেশ্বরের কাহিনি কি বানানো? ওসব কিছুই হয়নি। মেয়েটি অভিনয় করছে? মোটেই না। বলছে, সব তো শাশুড়ির দোষ, ছোটছেলে বলতে অজ্ঞান, যখন আসবে তুমি কাকাবাবু আমরা ছেড়ে দেব, এ বাড়ি ধোয়া মোছা সব তো আমি করি। শাঁখ বাজাই ধুপধুনো দিই। প্রদীপ দিই, কে বলবে এখেনে লোক থাকে না।

বিজন বলল, ভেবে দেখি।

ভেবে দেখি বললে হবে না কাকাবাবু। বলে উঠে এসে বিজনের হাত ধরে ফেলল সারা মণ্ডল, ভূতেশ্বরের বউ, বলছে, কথা না নিয়ে সে ছাড়বে না।

তিন

বাড়ি ফিরতে কবিতা বলল, চাবি পেয়েছ?

চাবি তো বাড়িতে রয়েছে।

উঁহু আর এক সেট, বাড়ি খালি করে তালা দিয়ে এসেছ?

বিজন চুপ করে থাকল। ফিরতে ফিরতে মনে হয়েছিল তার একটু কঠিন হওয়া দরকার ছিল। বাড়িটা তো তার। সম্পূর্ণ তার। রীতিমতো জমি কিনে ঠিকেদার লাগিয়ে ঠিকেদারের কাজ দেখে দেখে বাড়িটা নির্মাণ। বাড়ির পুবদিক খোলা, পশ্চিমে গাছ-গাছালি। বাড়ির জমি চৌকোনো। বাড়ি করার পক্ষে আদর্শ। জমিটা উঁচু। এর চেয়ে ভাল হয় কী করে?

কবিতা জিজ্ঞেস করল, পারনি, না?

না পারিনি।

কেন বলো দেখি?

ও তো বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে।

পাহারার দরকার নেই, তুমি কি কিছুই বুঝবে না?

বিজন ভাবল কথা তো সত্যি। অথচ সে পারল না। না পারার কারণও ধরতে পারছে না। জানালা দরজা যাবে? হ্যাঁ যেতেই পারে, ওই গৌড়েশ্বরই লোক দিয়ে চুরি করাবে বাড়িতে না থাকতে পারলে। তখন কবিতা অভিযোগ নিয়ে থানায় যাবে। লোকটা খুব চালাক। কিন্তু কত চালাক! কতটা পারবে?

বিজন বলল, প্রথমদিনই বলতে পারলাম না, তবে বুঝিয়ে এসেছি।

হা হা করে হাসল কবিতা, বুঝিয়ে এসেছ মানে, কী বুঝিয়ে এসেছ?

বাড়িটা আমার।

কী কপাল, এও বোঝাতে হবে, তোমার বাড়ি তা কি ও জানে না?

অপ্রতিভ হয়ে গেল বিজন। সত্যিই তো, কী বলতে কী বলছে সে কবিতাকে? কবিতা একটু রেগে গেছে, বলছে থাক তুমি লোন নিয়ে বাড়ি করেছ, তুমি যা ইচ্ছে করবে, ও বাড়ি থাকবে না।

কেন থাকবে না?

গৌড়েশ্বর নিয়ে নেবে, আমতলির বাড়ি নেয়নি সন্তোষ চক্রবর্তী!

বিজনের মনে হল কবিতার কথা ঠিক। সন্তোষ চক্রবর্তীকে তো বের করতে পারেনি তারা। অথচ সন্তোষ যে বাড়ি দখল করেছে তা বলা যায় না, 'জেঠামশায়, আমার ছয় মেয়ের পর একটি পুত্র সন্তান পেয়েছি, তার জন্য তো কিছু করা দরকার।'

করো, মেয়েগুলোকেও দেখ, ভেসে না যায়।

কবিতা বলল, তোমাদের কপালে বাড়ি নেই।

তা কেন হবে?

হবে, ওই যে ওই বাড়িতে থাকতে পারলে না, আর পারবেও না, সন্তোষের বাড়ি হয়ে গেছে ওটা, আর নতুন বাড়ি গৌড়েশ্বরের হাতে যেতে কত সময়।

বিজনের বুকটা কেঁপে গেল। ভয় হল, তাহলে কি সন্তোষের কথা ঠিক? তাদের পূর্বপুরুষ, ঠাকুর্দার ঠার্কুদা, তার বাবা পূর্ববঙ্গে জমি নিয়ে থাকতেন। মামলা মোকদ্দমা নিয়ে থাকতেন। লোকের জমি আত্মসাৎ করতেন। সেই সব ঋণ এখন শোধ করতে হচ্ছে। এ বাড়ি গেল। গৌড়েশ্বর কোনদিন বেরোবে না। নিজে বেরোলেও ছোট ছেলে ভূতেশ্বর আর বউমা সারাকে ঢুকিয়ে দেবে। ঢুকিয়ে তো দিয়েইছে। এখন সে কী করে? কবিতাকে তো সব গুছিয়ে বলতে পারছে না। বললে কালই জগৎপুর যাওয়া বন্ধ করে দেবে। সারা মণ্ডলকে কথা দিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। থাকবে। সারা বলছে পাকা দালান নতুন ঘরে এলে তার স্বামী আবার তার দখলে ফিরে আসবে।

উপায় নেই, উপায় ছিল না। বিড়বিড় করল বিজন।

কেন, ওর কাছে ধার নিয়েছ?

না না তা না, আসলে এমন করে ধরে পড়েছে।

এ কী আব্দার, ধরে পড়লে নতুন বাড়ি দিতে হবে, ওর বাড়ি নেই?

ও না, ওর ছেলের বউ।

কবিতা যেন কোমর বেঁধে বসল তার সামনে, তুমি কী করছ বলো দেখি, ও বাড়ি রাখতে হবে না।

না না, সবে তো বছর ঘুরল।

আমি ও বাড়িতে যাব না।

আমাদের ধূলিহর, যাবে না?

কবিতা বলল, যতো সব ইউজলেস রোমান্টিকতা, তুমি কি সত্যিই ১৯৪৭ এর আগে ফিরতে পারবে?

সে কথা না, স্মৃতি ধরে রাখা মাত্র।

সাতচল্লিশে তুমি কোথায় বিজনবাবু, তার কত পরে তোমার জন্ম, স্বাধীনতা ষাট পেরিয়ে একষট্টি, তুমি ফোরটি ফাইভ, ধূলিহরের স্মৃতি তোমার কী করে থাকবে?

বিজন বলল, আমিও তো অবাক হয়ে যাই, যে কোনওদিন ধূলিহর দ্যাখেনি সে কেন ধূলিহর প্রতিষ্ঠা করতে চায়, মা আর বাবা, খুব ছোটবেলায় ঠাকুমার মুখে শুনে শুনে আমি ধূলিহরকে চিনে ফেলেছিলাম কবিতা।

কবিতা বলল, জমিটা কেনা ঠিক হয়নি বিজনবাবু, তুমি খোঁজ নিয়ে এস, দেখবে তোমার ধূলিহর গ্রাম আর গ্রাম নেই, শহর হয়ে গেছে প্রায়, আর তুমি সেই সাতচল্লিশের আগের ধূলিহর বানালে জগৎপুরে, হয়নি একদম হয়নি।

বিজন বলল খুব তাড়াতাড়ি ডেভলপ করে যাবে, দেখো।

কেন করবে, কী কারণে?

বাহ্, যে যে কারণে ডেভলপমেন্ট হয়।

কবিতা বলল, হবে না, আমাকে তোমার ওই মন্ডল বলেছিল বাস গাড়ি ঢুকলে চুরি ডাকাতি বেড়ে যাবে, কী দরকার মিনিটকুড়ি হেঁটে বাস ধরতে তো অসুবিধে নেই, আর ঘরে ঘরে তো সাইকেল।

ও এমনি বলেছে, পেসিমিস্টিক লোক গৌড়েশ্বর।

মোটেই না, খুব অপটিমিস্টিক, বাড়িটা দখল করে নেবে, ওর তো বয়স হয়েছে, ছেলে বউ-এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো, ফোকটে এমন একখানা বাড়ি যদি পেয়ে যায় কে ছাড়ে?

বিজন ভাবছিল কবিতার কথা ঠিক না হয়ে যায় না। ওর পুত্রবধূও তো খুব সহজ নয়। ঠিক সময়েই গৌড়েশ্বর বেরিয়ে গিয়ে পুত্রবধূ সারাকে তার

সামনে রেখে গিয়েছিল। সারা কেমন হাতটা ধরে ফেলল কাকাবাবু—আক্কেল করে। চোখে কেমন জল নিয়ে এল অনায়াসে। বুকের আঁচলও প্রায় খসে একদিকটা তার চোখের সামনে খয়েরি ব্লাউজের নীচে দপদপ করছিল তাকি সে দ্যাখেনি? কেমন অনায়াসে বলল ও বাড়িতে তার স্বামীর কাছে সে পুরনো হয়ে গিয়েছে। পুরনো তক্তপোষ, পুরোন রংচটা দেওয়াল, জানালা দিয়ে না আলো না বাতাস, খুপরি ঘরে কি ভালোবাসা জন্মায়? তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। তাই গেছে। ফলে তার স্বামী ভেড়ির ডিউটি শুধু রাত্তিরেই নেয়। কেন দিনে কি কাজ থাকে না? খুব থাকে। আগে তো তাই করত। সন্ধে সন্ধে ঘরে ফিরত। এখন ফেরে না। ফেরে যখন, ব্যাগের ভিতরে ওইসব পাওয়া যায়। কাকাবাবু যদি বলেন তো সে তার স্বামীকে নিয়ে এই বাড়িতে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। শ্বশুর-শাশুড়ি মহাহারামি। ছেলের দোষ দেখে না। সেও দেখে নেবে। শুধু কাকাবাবু মত দিলেই হয়। সে দুবেলা ঘর মুছবে, ধূপ-ধুনো দেবে। বড়দিন করবে, আবার সব বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপুজো করবে। ভাদ্রমাসে মনসাপুজো করবে। তাতে বাড়িটা ভাল থাকবে। বাড়িতে লক্ষ্মীশ্রী ফিরবে। আর কী বলল, যে কথা বলল অনায়াসে সে কথা বিজন আশাই করতে পারে নি ওই বছর পঁচিশের বউটির কাছ থেকে।

কবিতা জিজ্ঞেস করল, কী ভাবছ?

কিছু না।

বাড়িটা রাখতে হবে না।

তা কি হয়, এত কষ্ট করে করা।

তুমি রাখতে পারবে না।

পারব, খুব পারব।

তাহলে পরের রবিবারে আমি যাব, আমি সব ঘরে তালা দিয়ে আসব, ওদের বের করে বাড়িটা দখল নেব।

দখলেই তো আছে।

আছে কি, ভেবে দেখো।

বিজন জানে কবিতার কথাই ঠিক। নেই বলা যাবে না। তবে দখল চলে যাচ্ছে। সারা বলছে নতুন বাড়ি ওসব চায় কাকাবাবু, আপনারা তো আসবেন না এখন, এলেও কী হবে কী হবে না তা আপনারা জানেন, আপনার তো চুলে পাক ধরেছে, কাকিমাও তো আর ওসবের মতো নেই।

কী সবের মতো?

সারা সরে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করেছিল, আপনি কি বুঝতে পারছেন না কাকাবাবু, আপনি গুরুজন বলি কী

করে, ওই যে গান আছে না—গুন গুন করে উঠেছিল সারা সেই গান—"আদি পুরুষ আদি নারী/ আদম ইভ নাম.....। সারা বলেছিল ওই গানটায় যা বলেছে?

কী বলেছে?

তাও কি বলতে হবে কাকাবাবু?

আমি তো ধরতে পারছি না।

সারা বলেছিল আপনি আমার শ্বশুরবাবার বন্ধু, কী করে বলি?

না, না ওঁর বন্ধু কেন হব, তোমরা তো প্রতিবেশী।

তবু তো বন্ধু, যাক গে আপনি তো জানেন সব, আমার অবস্থাটা জানেন, আমি তো কেস্তান মেয়ে, যীশুবাবার পুজো করি, এবাড়িতে এসে হিঁদু ঠাকুরও পুজো করি, কেন করব না, ঠাকুর তো ঠাকুর, তার আবার কেস্তান হিঁদু কী, ওঁরা বলেন যীশুরে ত্যাগ করতে, কী করে করি?

না না, যা করছ করো।

তাই-ই করব, কিন্তু কাকাবাবু আঙ্কেল এডা তো জানেন একটা বাড়ি হল আবডাল, আমাদের আদি পিতা আদি মাতা আদম ইভও আবডাল নিয়েছিল, পাতার ঘর নিয়েছিল কিনা?

হয়ত, তখন তো জগতে মানুষ ছিল না।

না থাক, গাছপালা জীবজন্তু ছিল কিনা, রোদ ছিল আলো ছিল, ছিল কিনা, আবডাল চাই-ই তো?

চাই। না পেরে বলেছিল বিজন।

বাড়ি তো সেই জন্যেও করে মানষে, আদম ঠাকুর ইভ ঠাকরানির পাতার ঘর একালে আপনার বাড়ি হয়ে উঠল কাকাবাবু, আমি স্বপনে দেখেছি।

থ হয়ে গিয়েছিল বিজন। যে মেয়েটা সারাদিন বাসন মাজে, সারাদিন কাঠকুটো শুকোয়, জামাকাপড় কাচে, দুটো বাচ্চাকে স্নান করায়, ভাত খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, স্বামীর বেচালে দুঃখ পেয়ে কাঁদে আবার গলা ফুলিয়ে ঝগড়া করে, সেই মেয়ে এসব কী বলছে? বলছে ঘরবাড়ি সব চায়। আদম-ইভও চায়। চায় নারী পুরুষ এই আড়ালে ভোগ করুক। না হলে ঘরবাড়ি ভাল থাকে না। দুজনে যদি পরস্পরে ভালো না বাসে ঘরের অন্ধকারে, তবে ঘরবাড়ি কীসের জন্য? এই দালান কোঠায় এখনো তা হয়নি। কোনো স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে ভালোবাসেনি রাতভর। এ বাড়ি ভালো থাকবে না।

বিজন জিজ্ঞেস করেছিল, এসব কে বলল?

কেউ বলেনি, যবে থেকে বাড়িটা ওঠে, ইটের পর ইট গাঁথা হয়, ছাদ ঢালাই হয়, প্লাস্টার হয়, রঙ হয়, মেঝেতে মার্বেল বসে,বাথরুমে মার্বেল বসে,

তবে থেকে আমি ভাবি এঘরে কারা প্রথম— ! কাকাবাবু আমার লজ্জা করছে, আপনি গুরুজন, আপনি কী ভাবছেন, ভাবছেন সারা মেয়েটা খুব বেলজ্জে, বেহায়া।

না, না বলো না।

শুনতে ভালো লাগছে?

এসব তো জানি না, জানছি।

আমি কাকাবাবু মনে মনে ভাবতাম আমার সোয়ামিরে নিয়ে এ বাড়ি শুদ্ধ করব, ওতে বাড়ি শুদ্ধ হয় কাকাবাবু, বাড়ির দেওয়াল, মেঝে, ছাদ, জানালা, দরজা ওসব দেখতে চায়, কিন্তু এখেনে একটা বুড়ো শুয়ে থাকে আর মাথার ভিতরে নানা প্যাঁচ কষে, সমস্ত দিন ধরে বাড়িটা মুখ অন্ধকার করে থাকে।

বাড়ির মুখ আছে?

আছে, তুমি তা টের পাও না কাকাবাবু, বিজনবাবু?

তুমি পাও?

খুব পাই, দেখতে পাই।

কী দ্যাখো?

দ্যাখো কাকাবাবু এ বাড়িতে যদি আমি আমার সোয়ামিকে নিয়ে থাকি, বাড়ির মুখে হাসি ফুটবে, দুটো বাচ্চা ঘুরবে, আর একটা বাচ্চা পেটে আসবে, বাড়িই সব করে দেবে, আমার সোয়ামিকেও ফেরত আনবে ডাকিনীর কাছ থেকে।

আমি পরে জানাব তোমাকে। বলে বিজন উঠে এসেছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরের দেওয়ালে হাত রেখেছিল। চমকে উঠেছিল। ঠিক যেন মানুষের গা। সারা বাইরে এসেছিল তার পিছু পিছু, চাপা গলায় বলেছিল, বাবাকে যেন বলো না, তুমি আমারে দেও, বাড়ি ভালো থাকবে, না হলে অপদেবতা এসে ঢুকবে।

কবিতা বলল, ভূত প্রেত ঢুকেছে, তাড়াতেই হবে তারপর আর না, ইরফান গেল না, ওর জমি বেচেও দিল, তুমিও বাড়ি বেচে দেবে।

বিজন বলল, তিনদিনের বেশি থাকলাম না।

থাকতে হবে না, ও তোমার ধূলিহর হতে পারে না, মিথ্যে স্বপ্ন দেখছ তুমি বিজন, মানুষ তো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে আগের জায়গার কথা ভুলে যায়, তুমি ভুলছ না কেন যে ধূলিহরকে, কোনওদিন দ্যাখোনি তাকে।

চার

পরে বলবে। দুধকুমারের বউকেও বলেছিল পরে বলবে, গৌড়েশ্বরের ছেলের বউ সারাকেও বলে এসেছে পরে বলবে। শুধু সে তার খাটে শুয়ে পা দোলাচ্ছে। কবিতা এমন রেগেছে, প্রতিদিন বলছে, ও মায়া ছাড়ো, ও জায়গায় কেউ যাবে না।

কিন্তু এই শহরে তো জায়গা নেই।

মাটিতে নেই, শূন্যে আছে বিজনবাবু।

শূন্যে আছে মানে?

বোকারাম বুঝলে না, ফ্ল্যাট কেনো ওটা বেচে দিয়ে, শূন্যে উদ্যান বানাও।

বিজন বলে, ফ্ল্যাটে তো ধূলিহর হয় না।

তোমার ধূলিহর কিছুতেই হয় না।

একথা তো আগে বলোনি?

কবিতা বলল, আগে তো তোমার পিতৃপুরুষ কালিদাস বসুর কথা শুনিনি গো, কী কীর্তিমান মানুষ ছিলেন তিনি!

সন্তোষ চক্রবর্তী সত্যি বলেনি, আর ওসব হয় নাকি, ঠাকুর্দার জ্যাঠতুতো না খুড়তুতো ভাই কার সম্পত্তি মেরে খেয়েছিল, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায়?

কবিতা বলল, আছে, নাহলে থাকছে না কেন জমি-বাড়ি?

আমার ঠাকুর্দাও তো ওপার থেকে এপারে আসার সময় মুসলমান চাষাদের ভিতর জমি ভাগ করে দিয়ে এসেছিলেন, এটা কি জানো?

কথা হচ্ছিল সন্ধের পর। তাদের জানালার ধারে খাট। এখন আলো নিভে আছে। শহরে আলো না থাকলে সব কেমন ভুতুড়ে ভুতুড়ে লাগে। মেয়ের স্যার এসেছে, এমার্জেন্সি আলো জ্বালিয়ে ঘামছে আর অঙ্ক কষছে। অঙ্কে তাদের কারোর মাথা পরিষ্কার নয়। তার মেয়েরও না নিজেরও না। আর এ জন্যই কোন পরিকল্পনাই ঠিকঠাক সফল হয়ে ওঠে না বুঝি। জমি বাড়ি অন্যলোক দখল করে নেয়। এমন জায়গায় বাড়ি করতে যায় সেখানে তার ছাড়া আর কারোর যাওয়ার কোনো তাগিদই নেই।

কবিতা বলল, কালিদাস বসু লোকের জমি আত্মসাৎ করতেন আর দুর্গাদাস বসু নিজের জমি বিলিয়ে দিতেন—তোমরা কী ছিলে গো, আসলে তোমরা কি ভালো না মন্দ?

বিজন বলল মার কাছে শুনেছি, ঠাকুর্দা বলেছিল গ্রাম ছেড়ে দেশ ছেড়ে যখন নতুন দেশে যাচ্ছি যেটুকু না হলে নয়, সেটুকু নিয়ে যাব, গ্রামই থাকল

না, জমি গেলে যাবে।

কবিতা বলল, জমি তো আনা যেত না, ওটাকে বলে স্থাবর সম্পত্তি।

ধূলিহরের আলাউদ্দিন মণ্ডল বলেছিল কর্তা মশায়, আমারে দিয়ে যান, আমি টাকা দিয়ে নেব, লোকটার তেজারতির ব্যবসা ছিল, ঠার্কুদা বলেছিল তা হয় না, যে চাষারা এতকাল করেছে তাদের হোক।

এমনিতে পেল তারা?

হ্যাঁ এমনিতে।

কত জমি?

ষাট-বাষট্টি বিঘে, কত জমি তার হিসেব রাখত কে?

ওহ্! হাজার হাজার বিঘে নয়?

সবার কি হাজার হাজার বিঘে থাকে, এটা ছিল এক লপ্তে, আমি অত কিছু জানি না, মায়ের কাছে যা শুনেছি তা বলছি।

কবিতা বলল, আমি তো শুনিনি।

মা বলতেন আমার ছোটবেলায়, অতটা না ছেড়ে এলেও হত, মায়ের একটা ক্ষোভ ছিল, আলাউদ্দিন মণ্ডল এপারে ওই আমতলিতে কতবার এসেছে, ঠাকুর্দাকে ওপারে নিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে নেবে সব।

তারপর?

ঠাকুর্দার এক কথা, গাঁ থাকল না, দেশ থাকল না, ও জমিতে কোনও মায়া নেই, কীরকম উদাসীর মতো বসে থাকতেন বারান্দায়, বাঁচেনও নি বেশিদিন, অথচ আলাউদ্দিন বলেছিল কোনো চাষাকেই উচ্ছেদ করবে না, শুধু মালিকানা নেবে সে।

কবিতা বলল, রাজার মতো কাজ?

তার মানে?

পাপ করল কালিদাস, শোধ করল দুর্গাদাস, রেজারেকশন-এর কথা মনে পড়ে তোমার?

না না ওসবের সঙ্গে মিলিয়ো না, আমরা নরম মাটির দেশের মানুষ, এখানে ভালো করে শীত পড়ে না, ভালো করে গরমও না, আমরা ভালো করে পাপ করতে পারি না পুণ্যও না।

তোমার ঠাকুর্দার সেই ভাই কালিদাস কি শুধু জমিখোর ছিলেন, আর কিছু না? বললে বিশ্বাস করব?

ছিল, পোলিও ভরা পা নিয়ে একটা ছেলে আসত, বলিনি বাগদি বউ-এর ছেলে।

হুঁ সেই পাপ মেটাতে কাউন্ট নেখলিউদভ-এর মতো চাষাদের ভিতর জমি

বিলিয়ে দিয়ে ঠাকুর্দা দুর্গাদাস এপারে চলে এলেন, ওগো এ যেন তলস্তয়ের রেজারেকশনের গল্প।

জোর করে মেলাচ্ছ কবিতা, একজনের পাপ অন্যজন মেটাবে কী করে?

দুর্গাদাসবাবু ভালো ছিলেন? কবিতা জিজ্ঞেস করে।

ছিলেন।

আমার শ্বশুরমশায়?

ছিলেন, এদের বিষয়ে আসক্তি কম, আর কালিদাসের ছিল উলটো, বিষয়ের টানে ওপারে পড়েই ছিলেন, রোগে গলে পচে মরে ছিলেন।

বোঝা গেছে! কবিতা বলল, তোমার এ বাড়ি মণ্ডলের ভোগে যাবে, এখন দান করার মতো ফোকটের সম্পত্তি নেই তোমার বিজনবাবু, দান করলে আমরা নিঃস্ব হয়ে যাব, আর কাকে দান করবে, একটা পাজি লোভী লোককে?

আমার ঠাকুর্দা কি ফোকটের সম্পত্তি দান করেছিলেন, ফোকটের সম্পত্তিটা কী কবিতা?

কবিতা দুহাত কপালে তুলল অন্ধকারে, বলল, তিনি আমার প্রণাম নিন, যে পারে না সে কোনোটাই পারে না, যে পারে সে সব পারে, আমার দাদাশ্বশুর পেরেছিলেন, ফোকটের সম্পত্তি তো আমাদেরও ছিল, আমার বাপ ঠাকুর্দার, তোমার বাপ ঠাকুর্দার, কী করে অত জমি তারা পেয়েছিলেন বলো দেখি?

পৈতৃক সূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে।

যাঁর উত্তরাধিকার তিনি কী করে করেছিলেন অত জমি? আমার ঠাকুর্দারও ছিল দেড়শো বিঘে, কিন্তু তাঁর আটটি সন্তান, ভাগ হয়ে কী থাকে, আর ভালো জমি সব বর্গাচাষে চলে গেল, এঁরা সব অত ভূসম্পত্তি পেলেন কী করে?

সে তো জানি না।

ফোকটে, প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে, বুদ্ধি খাটিয়ে, বোকা চাষারা জমি চষতে লাগল, তবু সে সম্পত্তি দান করতে বুকের পাটা লাগে।

অন্ধকারে দুজনের কথা হয়ে যাচ্ছিল। কবিতা তার আশঙ্কার কথা শোনাচ্ছিল। দুর্গাদাসের নাতি বিজনকে কি বাপ ঠাকুর্দার হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে? না হল চোখের সামনে আমতলির বাড়িটি সন্তোষ চক্রবর্তীর দখলে যাওয়ার পর জগৎপুরের বাড়িতে বাইরের লোককে ঢুকতে দেয়? ও বাড়ি ভোগের হবে না। সন্তোষ চক্রবর্তী না হয় অভাবী, উপায়হীন, কিন্তু গৌড়েশ্বর তো পাকা বদমাশ। ছলে বলে বাড়িটি নেওয়ার তাল করছে তা কি এতদিনে বুঝতে পারেনি বিজন? লোকটার চোখ পড়েছে, লোভ হয়েছে। ও বাড়িতে বাস করা যাবে? অমন প্রতিবেশীর পাশে বাস করা যায়?

বিজন বলল, এত কষ্ট করে করলাম, ভোগ করব না?

তোমাদের ভোগের মন নেই, তোমরা ত্যাগ করতে জানো শুধু।

বিজন হাসে, ত্যাগ করা কি সহজ, ওটা পেরেছিল আমার ঠাকুর্দা।

তাঁর রক্তের ছিটেফোঁটাও তো আছে তোমার ভিতরে।

বিজন চুপ করে থাকল। তার মনে হল কবিতা অনেকটা আন্দাজ করতে পারছে। বাড়িতে থাকতে চাইছে যারা, তাদের কাউকে তো সে না করতে পারছে না। সরাসরি বলতে পারছে না যে হবে না, হতে পারে না। তারা তিনদিন বাস করার পর ওই বাড়িতে তো গেল ইরফান তার পরিবার নিয়ে। থাকতে পারল না ইরফান। এত বছরেও হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে বসবাস করার উপযোগী পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। ইরফানকে তাই ফিরতে হল, জমিও বিক্রি করে দিতে হল। কিন্তু ইরফানকে তো থাকতে পাঠিয়েছিল সে। কথা ছিল বাড়ি করে উঠে যাবে। তারপর তো ঢুকল গৌড়েশ্বর। কী সহজেই ঢুকে গিয়ে এখন গোটাবাড়িতে তার কর্তৃত্ব স্থাপন করে বসে আছে। সব এত সহজে হয়ে যাচ্ছে কেন? তাহলে কি ধূলিহর নামের বাড়িটি নির্মাণের পর থেকে তার মায়া কমতে আরম্ভ করেছে ওই বাড়ি থেকে? দেশটা ভাগ হয়ে যাওয়ার পর তার ঠার্কুদার সেই যে সিদ্ধান্ত, আলাউদ্দিন মণ্ডল কেন কাউকে জমি দিয়ে বিনিময়ে টাকা নিয়ে ওপারে যাবেন না তিনি? তার কারণও তো ওই বৈরাগ্য। দেশই চলে গেল, জমি আর কী করে থাকে দুর্গাদাস বসুর? মা কী সুন্দর বলতেন তাকে। বাবা অনেক বুঝিয়েছিলেন। ঠাকুর্দার এক সিদ্ধান্ত, দেশটাই যখন থাকল না, জমিও থাকে না, যে চাষারা এতকাল ধরে চাষ করেছে তাদের হয়ে যাক সব। ভূসম্পত্তি তো কেউ মাথায় নিয়ে জন্মায় না। জন্মায় মাটির পৃথিবীতে। তার দেশে তার গ্রামে। দেশ আর গ্রাম যখন থাকে না তখন জমিও থাকে না।

কবিতা বলল, যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখনই নাও, যদি ওখানে পাকাপাকিভাবে থাকতে হয়, এখনই থাকতে হবে।

তুমি পারবে? তোমার ভরতনাট্যম, তোমার ছাত্রীরা সব ছেড়ে গিযে থাকতে পারবে?

কবিতা অভিমানের স্বরে বলেছে, যায় যাবে, যাক না।

না কেন যাবে, গেলে তুমি কী নিয়ে থাকবে?

কেন তোমার ওই ধূলিহর নিয়ে, সারাদিন ধরে বাড়ি সাজাব, সাজানো হয়ে গেলে সব এলোমেলো করে দেব, তারপর আবার সাজাব, তারপর একদিন সাজানো ভুলে যাব, তোমার গৌড়েশ্বর এর বউ-এর সঙ্গে বসে বাটাভরা পান নিয়ে সাজতে বসব। পান খাব আর পিক ফেলতে ফেলতে পরচর্চা করব, খুশি তো।

এতো ঠাকুমা দিদিমাদের কথা বলছ তুমি কবিতা।

তাই তো, ধুলিহরে তো আমাদের ঠাকুমা দিদিমারাই থাকতেন, ধুলিহর তো পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের ব্যাপার, তখন তুমি কোথায় আমি কোথায় বিজন?

বিজন বলল, না না এ তো ঠিক তেমন নয়।

তেমনই, আমরা এই একবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের শেষের দিকেই না হয় চলে যাব, যাবই তো।

তুমি যেতে চাও না, তাই না? বিজন সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

যেতে কি তুমি চাও, বলো দেখি ভেবে।

না চাইলে কি বাড়ি করি?

ও একটা নেশায় করেছ, জীবনে একটা বাড়ি করা হল না তাই বাড়ি করতে গেলে, নিজেদের কোন গ্রাম নেই তাই বাড়িটার নাম করলে গ্রামের নামে, আচ্ছা বিজন এর কি কোনো মানে আছে, চাইলেই পিছিয়ে যাওয়া যায়?

যায় না?

না যায় না, আমার মা হিমানি স্নো মাখতেন শীতের দিনে, তুমি আমার জন্য আনতে পারবে হিমানি স্নো?

বিজন থর থর করে ওঠে, আমার মাও তো হিমালয়ান ট্যালকম পাউডার।

কবিতা বলল, আমার মাও ওই পাউডার।

বিজন বলল, বাবার ছিল পানামা সিগারেট।

কবিতা হেসে বলল, আমার দাদু খেতেন পাসিং শো, তাতে একটা সায়েবের ছবি ছিল, কাউবয়, হ্যাট, চেয়াড়ে মুখ, আমি শুধু সায়েবটার ছবি দেখতাম, তখন কত, তিন চার।

বিজন বলল, কী আশ্চর্য এসবও তো ছিল।

ধুলিহরের মতো এখন আর নেই।

বিজন বলল, গঙ্গায় কত জল ছিল, কেষ্টপুর খাল দিয়ে লঞ্চ চলত।

কবিতা হেসে বলল, চালাতে গিয়ে লঞ্চ চড়ায় আটকে গেল সেদিন মনে নেই?

তাহলে আমি এখন কী করব?

কবিতা বলল, নিয়ে এস হিমানি স্নো, হিমালয়ান ট্যালকম পাউডার, পানামা সিগারেট, লক্ষ্মীবিলাস তেল, এসব নিয়ে আমি যাব।

বিজন বলল, তাহলে ধুলিহর যাব না?

যেতে তুমি পারবে না, চাও ও না যেতে তাই গৌড়াকে ঢুকিয়ে দিয়ে বসে আছ, তোমার ইচ্ছে গৌড়া বা দুধকুমার বাড়িটায় বাস করুক, তখন তুমি না যাওয়ার একটা অজুহাত খুঁজে পাবে।

বিজন বলল, তাই কি হয়?

হয়, যে একবার গ্রাম থেকে শহরে এসেছে সে আবার গ্রামে ফিরতে পারে? যতই গ্রাম গ্রাম করে চোখে জল আসুক, ওসব শহুরে তঞ্চকতা নিজের সঙ্গে, সভ্যতা পিছনে ফেরে?

একি পিছনে ফেরা?

তাইই তো, দ্যাখো মশাই তোমার বাবা, আমার পূজনীয় শ্বশুরমশাই এদিক থেকে খুব পরিষ্কার ছিলেন, তিনি আমতলি গ্রামে যাবেন না, অথচ একটা পিছুটান আছে, নিজের হাতে গড়া বাড়ি তো, দিলেন সন্তোষ চক্রবর্তীকে ঢুকিয়ে, সন্তোষ যে বেরোবে না তা কি উনি জানতেন না, খুব জানতেন।

বিজন বলল, তুমি এতটা ভেবছ?

হ্যাঁ ভেবেছি, ছ'টা মেয়ে নিয়ে একটা দুঃস্থ লোক বিনা ভাড়ায় বাড়িটায় ঢুকে গেল ছ'মাস থাকবে বলে, কেউ ঢুকতে দেয়, বাবা দিয়েছিলেন যাতে তাঁকে না যেতে হয়, যাওয়া যায় না বিজন তোমার ধূলিহরে।

আমরা তাহলে যেতে পারব না?

তুমিই পারবে না, নেশা তোমার কেটেছে বলে কী আনন্দে গৌড়েশ্বরকে বাড়ির চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত আছ, ও বাড়ি রাখতে হবে না।

এই করলাম, এখনই বেচে দেব?

হ্যাঁ তাই করতে হবে, রাখা মানে উদ্বেগ।

বিজন চুপ করে থাকল। দীর্ঘক্ষণ লোডশেডিং-এর পর আলো এল। পাখা ঘুরল। বিজন জানালার ধারে বসে ভাবছিল জমি কেনা, বাড়ি করার দিনগুলিকে। একা একা তুলেছে বাড়ি। কন্ট্রাক্টর যে কত মেরেছে তাতে ভ্রূক্ষেপ করেনি। ধূলিহরই তো উঠছে। নিজের পিতৃপুরুষের কাছে ফেরা কি অত সহজে হয়? বিজনের মনে হত তার সঙ্গে তার বাবা, ঠাকুর্দা দুর্গাদাস দাঁড়িয়ে দেখছেন ইঁটের পর ইঁট গাঁথা। আহা কী সুন্দর দিন গেছে তা। ঠিকই করে নিয়েছিল ধূলিহর থেকে মাটি নিয়ে আসবে। সেই মাটি ছড়িয়ে দেবে। কই হলো তা। পাসপোর্ট করবে করবে করেও করা হল না।

কবিতা বলল, বাড়ির জ্বালায় পাগল হয়ে গেলাম, আমি এখন গান শুনব।

শোনো, আমি কি বারণ করেছি?

কবিতা হেসে তার কাছে এগিয়ে এসে গালে আঙুল বসিয়ে দিল, রাগ তো করেইছো বিজনবাবু, মুখ দেখে কি ধরা যাচ্ছে না, আচ্ছা তোমার ধূলিহর, তোমার খেলনা ধূলিহর নিয়ে তুমি থাকো, গৌড়া থাকুক, আমি আর কিছু বলব না, হ্যাঁ।

বলতে বলতে কবিতা বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পাঁচ

সহকর্মীদের জিজ্ঞেস করল বিজন, কী করি বলো দেখি।

এক একজন এক একরকম সাজেশন দিল। কেউ বলল, কলকাতার এত কাছে, ও জায়গা ঠিক ডেভেলপ করে যাবে, রেখে দাও।

কেউ বলল, এখন না, ক'বছর বাদে বিক্রি করো, ভালো দাম পাবে, জমি বাড়ির দাম দু'তিন বছরে ডবল হয়ে যাচ্ছে।

ইরফান জমি বেচে দিয়ে নিজের গাঁয়ের কাছে গঞ্জে বাড়ি করে ফেলেছে, সে বলল, যে কারণে বাড়িটা করেছিলে বিজনদা, আমরা সবাই একসঙ্গে থাকব, এখন তো তুমি একা হয়ে গেছ।

হুঁ, তাহলে ছেড়ে দিই।

সিদ্ধান্ত তুমি নিজে নাও, এ খুব কঠিন সিদ্ধান্ত বিজনদা, পরে মনে হতে পারে ভুল করেছ, আর তা মনে হবেই।

বিজন মাথা নাড়ে, তারপর বাড়ির বৃত্তান্ত গুছিয়ে বলতে ইরফান বলল, তার না বিজনদা, ও তুমি দিয়ে দাও, বাড়িটা এত কষ্ট করে করলে, এর ভেতরে মায়া চলে গেল!

মায়া কি সত্যি গেছে?

না গেলে কী করে সহ্য করছ গৌড়েশ্বরকে?

বিজন ভাবল কথাটা তো ভুল নয়। ক'দিন বাদে সপ্তাহের মাঝখানের একটি ছুটির দিনে সে দৌড়ল জগৎপুর-ধূলিহরে। আকাশে মেঘ এসেছে। হাঁটাপথে রোদ নিবারণের জন্য ছাতা খুলতেই হল না। বাস থেকে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট হাঁটা। ডানদিকে ভেড়ির জল হাওয়ায় খল খল করছে। মেঘের ছায়া ধরে সে জল ঘন কালো। হাঁটছিল বিজন একা, আচমকা পিছন থেকে ডাক এল, দাদাবাবু ও দাদাবাবু বাড়ি আসছ?

কথাটা এমনভাবে উড়ে এল যেন বিজন মাসান্তে তার দেশের-বাড়িতে ফিরছে, যেমন হতো সেই আমলে। তাদের আমতলির বাড়িতে বাবা ফিরতেন প্রতি শনিবার সন্ধেয়। তারা তখন সবাই ওখানে। বাবার চাকরি কলকাতায়, মেসে থাকতেন। বাবা চিরকালই বাড়ির বাইরে কাজ করেছেন। যখন তারা ধূলিহরে, বিজনের জন্ম হয়নি, তখন বাবা খুলনা শহরে। সপ্তাহ শেষে নৌকোয় ফিরতেন। তখন রাত হয়ে যেত। নদীঘাটে লণ্ঠন নিয়ে যেত তাদের জমির চাষি আক্রামুল। বিজনও যেন খুলনা থেকে ধূলিহরে ফিরছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দুধকুমারের বউ চাঁদমণি, চাঁদনি। শস্তার ছাপা শাড়িতেও রূপ যেন মেঘের ছায়াধরা জলের মতো টলটল করছে। মাথার চুল টেনে বাঁধা, পিছনে

লাল ফিতে, গায়ে হলুদ ব্লাউজ। ব্লাউজটি নতুন মনে হয়, রং খুব উজ্জ্বল। হাসি জড়িয়ে আছে ঠোঁটের দুই কোণে। তার পাশে চলে এসে বলল, দাদাবাবু তুমি নেশ্চয় খুব খোঁজ করেছ তোমার চাঁদনিরে, পাওনি তো?

বিজন দেখছিল বন্যেরা বনে সুন্দর। মেঘলা আকাশ, প্রায় নির্জন দুপুরের পথ, ঠান্ডা বাতাস সবই চাঁদনির রূপের আগুনে ইন্ধন জোগাচ্ছে ঠিক। সে বলছে, আমার উপায় ছেলনি, ভগবানরে হাসপাতালে দিতি হলো, আমারেই তো সব করতে হয় দাদাবাবু।

কেন দুধকুমার?

সে! সে তো নিত্যি তাড়ি খেয়ে চিত হয়ে থাকে, ওরকম পুরুষমানুষ নে সংসার করা যে কী জ্বালা!

চাঁদনির এখন দুই স্বামী। দুই পুরুষ নিয়ে সে হাসপাতালে যাচ্ছে, ফিরছে, তাড়িখোরের গায়ে জল ঢেলে নেশা ছোটাচ্ছে, তার আর সময় কই?

বিজন বলল, ভালোই তো আছ।

ভালো কি আছি দাদাবাবু! দাদাবাবু চলো আমার ভিটেয়।

এখন এই দুপুরে?

দুপুরেই তো ভালো, যাবা তার আবার এখন তখন কী?

না না, পরে যাব।

পরে তুমি আসবা না, কেন চাঁদনি গরিব তাই।

না না তা নয়, কাজে এসেছি।

তুমার ঘরে এখন গৌড়াকা' দুই নাতি নাতনি নে দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে, ওকি ওঠবে ঘুম ভেঙে?

বাহ্ উঠবে না?

বিরক্ত হবে, আর যদি ওর ছোট বউ তার সোয়ামিকে নিয়ে ঢোকে, তবে গৌড়াকা'র ঘরে, ওর বাড়িতে তোমাকে বসতে হবে।

বিজন মর্ম বুঝল। এল তো দিন কুড়ি বাদে। আসলে রাখবে না ছেড়ে দেবে এই চিন্তায় বিমর্ষ হয়েছিল এতদিন। কতরকম যে ভেবেছে। দেরি করে এসেছে এই কারণে যে সিদ্ধান্ত নিয়েই আসবে। সিদ্ধান্ত একটা আছে মনের ভিতরে। সে জানালে, বললে ওরা বেরিয়ে আসবে।

মুখটিপে হেসে ওঠে চাঁদনি, সোমত্ত মেয়ে পুরুষ ঘরে ঢুকে কি এমনি ঘুমোচ্ছে! তারপর ওই দালানকোঠা, দাদাবাবু তুমার ওই দালানের কথা ভাবলে আমার গা সিরসির করে ওঠে, এই যে বললাম কী বলব, এই দ্যাখো রোম কী রকম হয়ে গেছে।

বিজনের গা ঘেষে হাঁটছে দুধকুমারের বউ। বিজন একটু সরে গেলে,

তফাত রাখলে তা ঘুঁচিয়ে চাঁদনি সরে আসে, বলছে, ও দালানের কথা ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার, দাদাবাবু শুনছ?

বিজন পেছন ফিরল। পথ ধূ ধূ। বিজন সামনে তাকাল, একটা সাইকেল আসছে। হেলেদুলে তাদের পারও হয়ে গেল। চাঁদনি আচমকা তার হাত ধরে ফেলল, চলো না দাদাবাবু, গরিবের ঘরে দুদণ্ড বসে যাবা, জল খাবা, আমার কি ইচ্ছে হয় না, যাদের নে থাকি, তারা কি মানুষ!

প্রথমে বৃষ্টির পর মাটি থেকে যে সোঁদাগন্ধ ওঠে, চাঁদনির গা থেকে তা যেন নিঃসৃত হচ্ছে। বিজনকে যেন অদৃশ্য সুতো ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে অন্যপথে। বিজনের বাড়ি যেতে পথের যেখানে বাঁকতে হবে, তা ছেড়ে এল সে। চাঁদনি বলছে, ভগবানরে এখনো অনেকদিন হাসপাতালে থাকতি হবে দাদাবাবু।

ব্যান্ডেজ প্লাস্টার করা হাড় তো ঘরেই জোড়া লাগে।

না লাগছিল না, এর ভিতরে খাট থেকে পড়েছে ও, ওফ হাসপাতাল ছাড়া ও রোগীর চিকিচ্ছা করা যায় না।

তোমার কাজ বাড়ল, হাসপাতাল ছুটতে হবে।

চাঁদনি তার দিকে বিদ্যুৎভরা চোখে কটাক্ষ হানল, বলল, কাঁহাতক রোগ আর রোগী ভাল লাগে দাদাবাবু, হাসপাতালে গেলি কী না গেলি কী? ফিরি বেড়ে ঢুকোয় দিচ্ছি, চিন্তা নেই, থাকুক।

দুধকুমার!

ওফ্ তুমার দালানখানার কথা যত শুনি ওর মুখে মনে হয় তুমার কথা বলছে দাদাবাবু, বাড়িটারে মনে হয় যেন তুমি, নোতন মানুষ যেমন হয় তেমনি তুমার বাড়ি, আমার গাঁ কাঁপে তুমার দালানের পাশে গেলি।

হয়েছে, হয়েছে।

এস দাদাবাবু, তুমারে জল বাতাসা দিই, হাওয়া করি, তুমার দালানে গৌড়াকা' থাকে ফোকটে, কেন থাকবে?

না, না ও তো টেম্পোরারি।

কেন থাকবে, টিম্পোরারিই বা কেন থাকবে?

আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।

তুমি বললে তুমার দুধকুমারই ব্যবস্থা করে দিতে পারে, ওরে বের করে ঘরে তালা মেরে দেবে।

না না, ও আমি দেখছি।

চাঁদনি তার বিদ্যুৎভরা শরীর নিয়ে কী দ্রুতই না হাঁটে। তারপর রাস্তা যেখানে দূরে, মহিষচরার দিকে মিলিয়ে গেছে, যেখানে রাস্তা থেকে নেমে

পড়ল মাঠে। মাঠও থমথমে। কোথাও কেউ নেই। কটা গরু একটা ছোট মতো অশ্বত্থ গাছের নীচে মনের সুখে জাবর কাটছিল। চাঁদনির পিছু পিছু দুধকুমারের ভিটের বারান্দায় উঠে হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে বিজন টের পায় ভিতরে দুধকুমার নাক ডাকাচ্ছে। চাঁদনি ভিতরে ঢুকেই তাকে ডাকতে লাগল, দ্যাখো কেডা এয়েছে, কেডা।

ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে বসল দুধকুমার তার হাতির মতো দেহখানি নিয়ে, আতঙ্কিত গলায় বলল, ভগবান, হাসপাতাল ছুটি দিয়ে দিল?

না না ও আপদ তো বিদায় করেছি, হাসপাতালেই পড়ে থাকবে।

যখন ছুটি হবে?

ওর তো কোমর ভাঙা, হাসপাতালের সামনের ফুটপাতে পড়ে থাকবে, ওদিকি না গেলি হলো। হিসহিস করে বলছিল চাঁদনি।

এই ব্যবস্থা করি এলি!

হ্যাঁ, এছাড়া উপায় কী? তুমি বাইরে যাও দ্যাখো কেডা এয়েছে।

দুধকুমার লুঙ্গির কষি বাঁধতে বাইরে এসে বিজনকে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ল, এ কী দা'বাবু যে, দা'বাবুরে বাইরে হাত ভাঙা চেয়ারে বসায়ে রাখলি তুই চাঁদনি, তোর কোনো জ্ঞান আছে?

তুমি যে ঘুমুচ্ছিলে?

ডাকপি তো, এসো দা'বাবু ভিতরে এস, সেই কবে এয়েছিলে তুমি, তারপর নিজির বাড়ি আসো আর চলি যাও, গৌড়াকা'র সঙ্গে পরামর্শ করো আর চলি যাও, আমরা কি মানুষ লই দা'বাবু, গরিব হতি পারি কিন্তু মানুষ তো।

এসব কী বলছ!

ঠিকই বলছি, এস, বাইরি বসপা কেন, তুমি আমার দা'বাবু, তুমার বউ আমার বড়দি, ভিতরে বসো।

তাই হলো, খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসতে হলো বিজনকে। ভিতরে আলো কম, জানালা আছে দুটো। কিন্তু খুব ছোট। ইট বসিয়ে বসিয়ে ফোকর রেখে জানালা। তাতে আর কতটা বাতাস আলো ঢুকবে ভিতরে। চাঁদনি বলল, দাদাবাবু চা খাবা তো, শোন গো মিঠাই লিয়ে এস।

না, না কী বলছ তুমি?

হ্যাঁ হ্যাঁ মিঠাই আনো গো, দাদাবাবু মিঠাই ভালোবাসে।

কে বলল?

ও আমি জানি, মানুষ দেখলি ধরা যায় কে কী ভালবাসে।

দুধকুমার গালভরে হেসে বলল, তাড়ি তুমি খাবানা তা আমরা জানি, নাহলি তাড়ি আর বাটামাছ ভাজা খাওয়াতাম।

তাই হোক না, আচমকা বলে ফেলল বিজন।

তাই! তাহলি তো নয়াপট্টি ছুটতি হয় মাছ আনতি, তুমি বসো।

না, না অতদূর যেতে হবে না।

তুমি আগে মিঠাই আনো, তারপর মাছ আনবা, চা আনবা, চিনিও, ঘরে তো কিছু নেই, ওফ ভগবান গেছে না বেঁচেছি, বেশিদিন রোগী নে থাকা যায় না দাদাবাবু, ঘরময় ওষুধির গন্ধ হয়ে গিছিল, যাও তাড়াতাড়ি যাও। বলতে বলতে তাড়া দেয় চাঁদনি দুধকুমারকে।

যাচ্ছি যাচ্ছি, বলতে বলতে ঘরের কোণ থেকে সাইকেল টেনে বের করে দুধকুমার। গায়ে জামা দেয়। তারপর চাঁদনির দিকে হাত বাড়ায়, টাকা দে।

আমি দিই, বিজন বলে ওঠে।

না না তুমি দেবা কেন দাদাবাবু। বলে উঠল চাঁদনি।

আচ্ছা দা'বাবু তো, দেন না কেন, ভগ্নিপতি আমার, দিলি কী হয়েছে, দ্যাও।

না, গর্জে ওঠে চাঁদনি, তুমার ট্যাকায় লিয়ে এস, আমি দেবখন।

না না। বিজন উঠে দাঁড়ায়। পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে। একটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দেয় দুধকুমারের দিকে, বলে আমি যদি ওর ভগ্নিপতি হই, টাকা কি দিতে পারি না?

চাঁদনি চুপ করে দাঁড়িয়ে দ্যাখে। টাকাটা নিয়েই দুধকুমার বেরিয়ে যায়, যাব আর আসব, দাদাবাবু তুমি জল বাতাসা খাও, আরাম করো, গল্প করো, আমি গেলাম আর এলাম।

দুধকুমার চলে যেতে আচমকা নিস্তব্ধতা নেমে আসে আধো অন্ধকার ঘরে। ওই দূরে চাঁদনি, বলল আমার মনটা ভেঙে দিলে তো?

কেন?

মোর ঘরে তুমি ট্যাকা দিবে কেন?

তুমি টাকা পাবে কোথায় চাঁদনি, তুমি না আমার কাছে থাকতে চেয়েছিলে?

হ্যাঁ চেয়েছিলাম, রাখনি হতি চেয়েছিলাম, তুমি তো রাখলে না।

সে তো টাকার জন্যে?

ছিহ্! ওই বলে গিয়েছিলাম। আসলে এদের কোনো উপায় নেই। তুমারে দেখে তুমার কোঠাবাড়ি দেখে আমার অস্থির লাগে দাদাবাবু, অমন সোন্দর দালান বাড়ি, মেঝেতে পাথর, দেয়ালে কী সোন্দর রং, দাদাবাবু তুমি আমারে রাখনি করনি, তাতে আমি তুমার জন্যি পাগল হয়ে গেলাম, রাতি তুমার কথা ভাবি—ভাবি এ লোক তেমন লোক লয়, এ লোকের লোভ নাই, টাকার গরমে

মেয়েমানুষ ভোগ করতি চায় না, যত ভাবি তত অস্থির হই। বলতে বলতে দরজা ঠেলে দিয়ে ঘর আরো অন্ধকার করে দিয়ে চাঁদনি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। তাকে বেড় দিয়ে ধরে বলল, পেত্যেক দিন কোঠাবাড়ি দেখি, এক একবার ঢুকে পড়ি, কাঁপতে থাকি দাদাবাবু, কোঠাবাড়িটা আমারে চায়।

এ কী করছ! বিজন তেতে উঠেও নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে।

ঠোঁট জোড়া ঘষছে চাঁদনি বিজনের গালে, উফ্! কোঠাবাড়িটা বলে যেদিন দাদাবাবুরে লিয়ে তুমি ঢুকবা, সেদিন সব সাত্থক হবে।

দুধকুমার এসে যাবে।

একঘণ্টা, দাদাবাবু ওরে পাঠালাম তো ওই জন্যে, আমারে ঠাণ্ডা করো তুমি, উফ তোমার কোঠাবাড়ির সামনে গেলে গা গরম হয়ে যায়, কী যে হয় দাদাবাবু, তুমি আমারে এ কী করলে বলো।

বিজন টের পাচ্ছিল তার ভিতরটা জেগে উঠছে। কত সময় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে সে? চাঁদনির সমস্ত অঙ্গ তার অঙ্গে পিষে যাচ্ছিল।

বিজন কোনোরকমে বলল, আমার তো ভয় করে।

করুক ভয়, আমি তুমারে সাহস দেব, ভগবানরে হাসপাতালে দিয়ে এয়েছি, দুধকুমারের তাড়ি খাওয়ার ট্যাকা দিলে শান্ত, দাদাবাবু তোমার কোঠাবাড়িতে রাখো আমারে, আমি তুমার ছোটবউ হয়ে থাকি, শুনেচি তুমার বউ এখেনে আসবে না, সে থাকুক সেখেনে, আমি থাকি তুমার ধূলিঅরে।

বিজন বলল, তারপর, তারপর কী হবে চাঁদনি?

কী হবে, ছোটবউ তুমার আদর খাবে, তুমারে আদর করবে, দাদাবাবু, আমারে যে তুমার মনে ধরেছে তা আমি পেত্থম দিনেই বুয়েছি।

ঘরের অন্ধকার সুগন্ধে ভরে যাচ্ছিল। বিজন বিভোর হয়ে পড়ছিল একটু একটু করে।

ছয়

টলতে টলতে বিজন ধূলিহর যাত্রা করে। দুধকুমারের ভিটে থেকে একখানি মাঠ পেরিয়ে বাড়ির পেছনে এসে ওঠা যায়। চাঁদনি বলল, তুমি আরো থেকে যাও দাদাবাবু, ও লোক নেশাখোর, নির্ঘাত তাড়ি নে বসে গেছে নয়াপট্টির ওদিকে কোথাও, ফিরল না যখন এখনো, ফিরতি রাত হবে।

তবুও বিজন বসেনি। সে বুঝতেই পারছিল না তার ভিতরে অতখানি সুধা আছে। অতখানি সুধা ছিল! কবিতা কি তাকে দ্যাখে না? খুব দ্যাখে। কবিতাকে কি সে ভালোবাসে না? খুব বাসে। তাহলে? দুধকুমারের বউটিকে যেদিন থেকে

দেখেছে সেদিন থেকেই শরীর তাকে গোপনে চায় কেন? আর সে যা বলল, বিজনকে আর ক'দিন দ্যাখে, বিজনের দালানখানি দেখলেই তার খুন গরম হয়ে যায়। বিজনের দালানে সে বিজনের দাসী হয়ে থাকবে। দুটো পুরুষ তার আশ্রিত ছিল, একটাকে বিদায় করেছে, দুধকুমারকে হাতে টাকা দিলে কিছু বলবে না, শুধু চাবিখানি বিজন দিয়ে যাক। তাতেই হবে।

মাঠ কত বড়। বেলা শেষ হয়ে আসছে তখন। চাঁদনি ধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে ঘরের ভিতরে। বিজনকে আঁকড়ে ধরে সে শুয়ে থাকতে চেয়েছিল। খুব অনুনয় করেছিল। তার খুব সাধ বিজনের বুকে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে। বিজন বলেছিল, তার যে অনেক বয়স।

কোথায় বয়স, বিজন যেমন জানে, পারে, ও দুটোর কেউ তা জানে না, পারে না।

ওই কথা বিজনকে যেন আরো উদ্দাম করে তুলেছিল। চাঁদনি তার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলেছিল, এইটে তোমার বাড়ি, এইটে তোমার ধূলিঅর দাদাবাবু, এর চাবিকাঠি আমারে দিয়ে যাও, গৌড়াকা'রে তাড়াতি কতক্ষণ লাগবে।

গৌড়েশ্বর তো এখেনে ঢোকেনি চাঁদনি।

না তা ঢোকেনি, তুমি আমারে এই বাড়িতি রেখি দাও, সব কী রকম দপদপ করে দাদাবাবু, ও ভগবান! তুমি আমারে কী করলে ধূলিঅরের বাবু, তুমার কাছে সাজ্জন্ম দাসী হয়ে থাকবে চাঁদনি।

অতি কষ্টে বিজন মাঠ পার হয়ে তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে দেখল গৌড়েশ্বর কোমরে হাত দিয়ে দরজার মুখে, ওদিকে দিয়ে আসা হলো যে?

এমনি, জায়গাটা দেখে নিই ভাবলাম।

কখন এয়েচেন?

এই তো এলাম।

হুঁ। গৌড়েশ্বরের দুচোখে গভীর সন্দেহ। বিজনকে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে সে, তারপর বলে আমারে বলতে পারতেন, বারোকপাট পর্যন্ত ঘুরোয়ে নিয়ে আসতাম, চলুন ভিতরে।

বিজন ভিতরে ঢুকল। ঘরখানি নোংরা হয়ে আছে। মেঝেয় একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা। ইস! ছেঁড়া প্যান্ট, ছেঁড়া চাদর, ছেঁড়া মাদুর এসব হলো অলক্ষ্মীর চিহ্ন। সে বিরক্ত হল, গভীর অপ্রসন্নতা তার চোখমুখে ফুটে উঠল। তা টের পেয়েছে গৌড়েশ্বর। ভ্রূক্ষেপই করল না। মাদুর গুটিয়ে ঘরের কোণে রেখে জিজ্ঞেস করল, কখন এয়েছেন?

বিজন বলল, ছেঁড়া মাদুর কেন আমার ঘরে?

তাহলে নোতন মাদুর দিয়ে যান, টাকা দেন কিনে আনব মিশন বাজার থেকে।

আমার কিসে লাগবে মাদুর?

এক একদিন মনে হয় মেঝেয় শুই, খুব গরম পড়ে যেদিন, বাতাস থাকে না যেদিন, আপনার বউদি এমন পাথর বসানো মেঝেয় গা ছেড়ে দেয়, আমার আবার খালি মেঝেতে গা ভার হয়, মাদুরটা তাই।

না, না ওসব রাখবেন না আমার বাড়িতে।

গৌড়েশ্বর হেসে বলে, আমিও তো বলছি একটা ভালো মাদুর কিনে দিয়ে যান, গরমে কি খাটে শোয়া যায় সব সময়, বিশেষ করে দুপুরে।

বিজন বলল কী দরকার আমি তো শুচ্ছি না।

গৌড়েশ্বর আচমকা জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিলেন বলুন দেখি?

কোথায় ছিলাম?

সে আপনি জানেন, দেখুন দাদা আমি প'স্কার বলছিল এসব জায়গা আপনি ভালো চেনেন না, গৌড়েশ্বর আপনারে ঠকাবে না, কোথায় ছিলেন?

কোথাও না, আমার ঘরটা এত নোংরা কেন?

ওসব ছেলেবিলেরা করেছে, ছেলেবিলেয় করে না?

না, না দেয়ালে পেনসিলে ছবি এঁকেছে। বিজন উঠে গেল, ইস! তার বাড়ির প্লাস্টার অব প্যারিসের দেওয়ালে পেনসিল দিয়ে আঁকি-বুকি, নদী আর গাছ, তলায় নামও লেখা দীপক। কে দীপক? গৌড়েশ্বরের নাতি। বিজন বলল এসব দেখছেন না?

কী দেখব, ছেলেবিলেয় এমন করে।

বিজন বলল, ইস! ওটা কী লিখেছে? সে আঙুল দেখাল পুবের দেওয়ালে, এটা কি প্রস্রাবখানা, না মন্দিরের দেওয়াল!

আপনি এমন করছেন কেন, নাতিটার লেখা না আর কেউ লিখেছে, ও মুছে দেব জল ন্যাকড়া দিয়ে।

উত্তম প্লাস সুচিত্রা লিখে পাশে একটা হার্ট এঁকে রেখে গেছে কে? বাড়িটার একটা স্যাংটিটি নেই, এইভাবে নষ্ট করবেন?

নষ্ট হচ্ছে কোথায়, অবাক কথা বলছেন!

আপনি বুঝতে পারছেন না।

কী করে বুঝব?

বিজন বসল না। ভিতরে সেই ঘরটিতে গেল যেখানে যীশু, রাধাকৃষ্ণ মা কালী-সবার ছবি রেখে সর্বধর্ম সমন্বয় ঘটিয়েছে সারা। সেই ঘরে ঢুকতে দেখল দুইখানি বস্তা। কিসের বস্তা? দুটি ভাঙা চেয়ার, পলিথিন সিট, সব ঘরের

একধারে রাখা আছে। সে দেখল পিছু পিছু গৌড়েশ্বরও এসে ঢুকেছে, বলল দু বস্তা আলু, শস্তায় পেলাম, বর্ষায় আক্রা হবে।

বিজন বলল, এই ঘরটা গোডাউন হয়ে যাচ্ছে, ভাঙাচেয়ার, পলিথিন সিট।

পলিথিনটা অফিস থেকে ম্যানেজ করেছে বড় খোকা, কী কাজে লাগে।

বিজন বলল, বাড়িটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কী বলছেন নষ্ট নষ্ট, কোথায় নষ্ট, একটা মানুষ থাকলে এটা ওটা এনে রাখতে হয় না, প্রায় ফোকটে পেয়েছি।

বিজন গম্ভীর মুখে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। দিন পনের বাদে আজ এল। এখনো মাথার ভিতরে দুধকুমারের বউ ভেসে আছে। তার মনে হচ্ছে ছাদে গিয়ে একা একটু দাঁড়িয়ে থাকে। না হয় একটা চেয়ারে বসে থাকে। বলল, আমার বেতের চেয়ারটা কই?

চেয়ারে বসবেন, কোথায়?

বিজন বলল, ছাদে বসতাম।

মাদুর পেতে দিই?

ছেঁড়া মাদুর?

ছেঁড়া কই দাদা, গেরস্ত ঘরে ওরকম থাকে, সব সময় নোতন কেনা কি হয়, পুরোন জিনিস সব কি ফেলে দিতে হয়?

না বেতের চেয়ারটা কই?

ওটা বোধহয় ও বাড়ি।

ও বাড়ি কেন?

কী কারণে নিয়ে গিয়েছিল, বউমারে আনতে বলি।

এনে রেখে দিন, এ বাড়ির জিনিস ও বাড়ি যাবে কেন? বলতে বলতে উপরে উঠে আকাশতলে দাঁড়িয়ে বিজন নিঃশ্বাস ফেলল নিশ্চিন্তে, শ্বাস নিল গভীর করে। গৌড়েশ্বরও এসেছে। একটু দূরে ছাদের আলসে ধরে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে। তার খুব রাগ হচ্ছিল। তার বাড়িটায় এই লোক থাকে? কী করে যে ঢুকল? আজই লোকটাকে বের করে দিতে পারলে ঠিক হতো। কীরকম শুয়োরের মতো গড়ন লোকটার। কালো, বেঁটে, গোলগাল শরীর। মাথায় যে কটি চুল সব সাদা। হাতে চার-পাঁচটি আঙটি। কব্জিতে লাল সুতো। বিজনের মনে হলো শুয়োরটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। মরবে না, হাত পা ভেঙে পড়ে থাকবে। নীচে তো নরম মাটি। হাত-পা ভেঙে যদি তার ঘরে শুয়ে কাতরায়। ইস। বিজন তখন ওকে হাসপাতালে তুলে দিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হবে? উঁহু, তখন তো সারা তার স্বামীর সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ করবে। একে ছাড়াতে পারলে চাঁদনিকে ঢুকিয়ে দিতে পারত সে। চাঁদনির

হাতে চাবি থাকত। ঘর প্রত্যেকদিন পরিষ্কার করত। বিজনের মনে পড়ল আলো আঁধারে স্পর্শ করা, অনুভব করা দুচোখে দেখা ঠোঁট, গাল, দুই ভরন্ত স্তন, পেট, নাভি, তলপেট নিতম্ব। চোখবন্ধ করল বিজন। ওকে এ বাড়িতে রেখে আসবে মাঝে মধ্যে। সে তো বলেছে তার দুধকুমারও থাকবে, ভগবান যদি ফেরে সেও থাকবে। আর থাকবে দাদাবাবু। দাদাবাবু যেদিন আসবে সে দাদাবাবুর সেবাই করবে। ও দুটো পুরুষকে সে একাই সামলাবে বলে খিল খিল করে হাসতে হাসতে স্তন তার বুকের উপর চেপে ধরে বলেছিল, ওরা দরজায় এসে পাহারা দেবে গো দাদাবাবু, গৌড়াকা'রে হটাবে, আমি তুমি দোর বন্ধ করে ভিতরে থাকপ, সে যে কী সোন্দর হবে, তোমার দালান আমারে পাগল করে দেয় দাদাবাবু, আমি তো একদিন রাত্তিরে দালানে গে চুমু খেয়েছি পাগলের মতো, মনে হচ্ছিল তুমি, হ্যাঁ তুমি।

বিজনের মনে হচ্ছিল এটি হতে পারে খুব সহজেই, যদি গৌড়েশ্বর এখন বেরিয়ে যায়। গৌড়েশ্বর তার ছেঁড়া মাদুর, আলুর বস্তা, ভাঙা চেয়ার যদি বের করে নিজেও চলে যায় নিজের বাড়িতে। ফিরল গৌড়েশ্বর, তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, অন্যরকম লাগছে আপনারে।

বিজন সাড়া দিল না।

গৌড়েশ্বর বলল, যা করবেন, করতি চান এই গৌড়েশ্বরকে লুকোয়ে করবেন না কিছু, আমার জানা থাকলি সাহায্য পাবেন!

বিজনের গা একটু ঠাণ্ডা হল। জানে লোকটা? জানে তার দুপুর কেটেছে কীভাবে? নাকি আন্দাজে ঢিল মারছে। সে বলল, আমার চেয়ারটা নিয়ে আসুন।

আনছি, আরে ও চেয়ার কি আমি নিয়ে নেব, ব্যবহার হয় না, এবার তো এলেন দিন পনের বাদে, বেয়াই এয়েছিল, ওরা তো কেস্তান মানে সায়েব বলতি পারেন, সায়েব না হলিও তো সায়েব বটে, সায়েবের ধম্মো ওটা, সে কিসে বসে, ভালো চেয়ারটা তাই নিয়ে গেছি, ঘরে তো অন্য চেয়ার আছে, তুলে আনব, বসবেন?

হাতলভাঙা।

বসবেন তো আধঘণ্টা, হাতল সারিয়ে নেব?

সে তো আপনার ব্যাপার।

না মানে বসতি চাইলে আমি সারিয়ে রাখতি পারি।

আমার বেতের চেয়ার তো আছে।

আছে, আর একটা থাকল, আমরা দুজনে দুটো চেয়ারে বসে গল্প করলাম, সারিয়ে নিই, পঞ্চাশ টাকায় হয়ে যাবে।

বিজন আর পারল না, বলল গৌড়েশ্বরবাবু আমি আজ চাবি নিয়ে যাব।

গৌড়েশ্বর হাসে, খুব রেগে গেছেন, কী হলো?

না বাড়ি তো আমার।

আপনারই তো, বাড়ি তো কেউ তুলে নিয়ে যাচ্ছে না।

বিজন বলল, আমার চাবি আমার কাছে থাকা ভালো।

ভালো, খুব ভালো, তবে সে যখন আসবেন তখন, ফেমিলি নিয়ে থাকবেন, তখন, এখন কী করে হবে, সত্যি কথা বলছি কি দাদা, ছেলেটা তো শুধু নাইট ডিউটি দিয়ে যেত, এই বাড়ি সেই ডিউটি বদলাচ্ছে, কী উপগার যে করছেন আপনি আমার।

এখন কি আপনার ছেলে বউ থাকছে?

হ্যাঁ, আমি নিজের ঘরে চলে যাচ্ছি, এমন পাকা দালান, পাখার হাওয়া ওদের হোক।

আমি তো ওদের থাকতে বলিনি।

গৌড়েশ্বর বিস্মিত হল, সে কী দাদা, বউমা বলল আপনি পার্মিশন দিয়ে গেছেন, দিয়ে গেছেন বলেই তো আমি ওদের থাকতে দিলাম।

থাকতে দিলেন মানে?

মানে রাত্তিরে থাকে, দুটোয় আসে, নাতি-নাতনি আমার সঙ্গে থাকে।

বিজন গম্ভীর হয়ে গেল। ছাদের উপর পায়চারি করতে লাগল। বাড়িটা তার কিন্তু গৌড়েশ্বর ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সে বলল আমি পরে জানাব বলেছিলাম।

পরে আর কী দাদা, বউমা বলেছে আপনি কি না করতে পারবেন, পারবেন না, এতো আমি জানি ভালো করে।

বিজন ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে লাগল। অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। এই দৃশ্যটুকু ধূলিহরের ছাদ থেকে কী সুন্দর না দেখা যায়। এসব সে আগে দ্যাখেনি। তার বাড়ি তো ঘিঞ্জির ভিতরে। এক তলার ফ্ল্যাট। রাস্তা, রাস্তার ওপারে মাঠ কিছুই চোখে পড়ে না। আর এই ছাদ, এখান থেকে চোখ কতদূর না চলে যায়। মনে হয় ওই দূর অসীম থেকে, সেই বারোকপাট, ভগবানপুর, জোতভীম, হাটগাছা থেকে হাটুরে মধ্যবয়সীর মতো অন্ধকার আসছে পায়ে পায়ে। তাকিয়ে থাকল সে। এবার সে ফিরবে। ফিরবে দুধকুমারের বাড়ি হয়ে। দুধকুমার ফেরেনি ঠিক। একশো টাকা নিয়ে বেরিয়েছে, তাড়ি খেয়ে পড়ে আছে কোথাও। আবার এবার চাঁদনিকে দেখে যাবে। কিছু টাকা দিয়ে যাবে, দেওয়া তো উচিত। ওই যে দূরে ঘনায়মান অন্ধকারে বাড়িটা নিঃঝুম দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটা তাকে টানছে।

কী দেখছেন? গৌড়েশ্বর জিজ্ঞেস করল।

চমকে উঠল সে, কই কিছু না।

দেখুন দাদা, আমি পষ্ট কথার লোক, আপনি এই জগৎপুরে এয়েছেন বাড়ি করেছেন, আমার প্রতিবেশী হয়েছেন, আপনার ভালো মন্দ আমি দেখব, আপনার যদি কোন অনিষ্ট হয় তবে আমি বউদির কাছে মুখ দেখাতি পারব?

অনিষ্ট হবে কেন?

যার অনিষ্ট হয় সে কি বোঝে? বোঝে না, সে কি নিজেকে দেখতি পায়? পায় না, বোঝে অন্যলোকে, আপনার কী চাই বলেন, বললাম তো বাড়ি করেছেন, টাকা পয়সা ঢেলেছেন, এখন আসবেন না, ফুর্তি করুন, আমি ব্যবস্থা করব।

আপনি কী বলতে চাইছেন?

যা বলতে চাই তা কি আপনি বুঝছেন না, খুব বুঝছেন। বলে গৌড়েশ্বর তার দিকে তাকিয়ে থাকল ভাবলেশহীন মুখে।

সাত

চতুর গৌড়েশ্বর কোনো কথাটাই স্পষ্ট করে বলল না। তবে ইঙ্গিতে জানাল বিজন কোথায় গিয়েছিল, সারাদুপুর কোথায় পড়েছিল তা তার জানা। সে নখদর্পণে বুঝি সব দেখতে পায়। তার কত গুণ! বলল, সে বশীকরণও জানে, বিজন যদি চায় বিজনের হয়ে সে কাজ করতে পারে, তবে কিনা তারও তো কিছু শর্ত আছে। আর যৌবনে যেভাবে পারত, এখন সেভাবে পারবে কিনা বলতেও পারে না।

বিজন চুপ করেছিল। কিন্তু বুঝতে পারছিল গৌড়েশ্বর তাকে চাবি দিচ্ছে না। গৌড়েশ্বর তার মঙ্গল অমঙ্গলের ভার নিয়েছে। কী করে চাবি দেয়? সে বুঝিয়েছিল এই জগৎপুরে যা ঘটবে কোনো কিছুই তার অজানা থাকবে না, তার চোখের আড়ালে কিছুই হবে না, হতে পারে না, সুতরাং বিজন তার উপরে নির্ভর করতে পারে। করলে তার লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। কলকাতায় বিজন কী করতে যাচ্ছে তা গৌড়েশ্বর দেখতে যাচ্ছে না, কিন্তু জগৎপুরে সব দেখতেও পাবে, জানতেও পারবে। সে যদি এক থালা জল নিয়ে ঘরে বসে একা একা তবে কি সেই জলে সব ছবি ফুটে উঠবে না? যেমন নখের দর্পণে ওঠে। লোকটা পারেও বটে। বিজন যত সময় থাকল, লোকটার কথা সত্য মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল সে বিজন আর চাঁদনির শারীরিক ক্রিয়া দেখেছে ঠিক। ইস! বিজনের কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। গৌড়েশ্বর বলছে, বিজন কী চায় তা স্পষ্ট করে বলুক। বিজন যদি চায় তবে তাকে

নিয়ে সে জলকরে যেতে পারে যেখানে তার ছেলে রাত পাহারায় থেকে একটা তাজা মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। সে মেয়ের স্বামী সুন্দরবনে গিয়ে আর ফেরেনি। হয় বাঘের পেটে গেছে না হয় কুমিরের হাঁ মুখে। আবার এমনও হতে পারে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে জেলখানায় বসে আছে।

বিজন বলতে গিয়েছিল, এসব আমাকে বলছেন কেন?

গৌড়েশ্বর বলেছে, কেন বলছে তা কি বিজন জানে না, খুব জানে, তবে কিনা সেই মেয়েছেলেটাকে এখানে আনা যাবে না, তাহলে তার বউমা সারা সেরেফ আঁশ বটি দিয়ে তাকে কেটে ফেলবে, অতিকষ্টে ছেলেটাকে ছাড়ানো গেছে অনেক বশীকরণ করে। বিজনকে যেতে হবে।

বিজন বলল, আমি কেন যাব?

না যেতেও পারেন, তাহলে তা হবে না।

কী বলছেন, থামবেন।

গৌড়েশ্বর হেসেছিল, বলেছিল, সে মেয়েছেলেটা ওই দুধকুমারের বউ-এর চেয়ে অনেক ভালো, আরো কচি, দেখলে মাথা ঘুরে যাবে।

বিজন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সব জেনে বসে আছে নাকি সত্যি? সে তবু আত্মরক্ষার্থে বলেছিল, আমি এসব কথা শুনতে চাই না আমার বাড়িতে।

গৌড়েশ্বর বলেছিল, না শোনাই ভালো, তবে বিজনকে সাবধান হতে হবে, এমন একখানা খাসা বাংলোর মতো বাড়ির মালিক হলে ওসব হয়, দেহের ভিতর থেকে দানব জেগে ওঠে। উঠতেই পারে। তাকে তো মানুষ সমস্ত জীবন ঘুম পাড়িয়েই রাখে। গৌড়েশ্বর বলেছিল, যা করেছেন বেশ করেছেন, তবে আমারে বলে করবেন, জানিয়ে করবেন। তাহলে বিপদ হলে আমি রক্ষা করতে পারব। এই জগৎপুরে গৌড়ারে কে না ভয় করে? সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল যত পার্টি আছে তার কাছে এসে সব ঠাণ্ডা। কেন ঠাণ্ডা, না সে স্পষ্ট কথা বলে। তার কোনও রাখঢাক নেই। শাদাকে শাদা কালোকে কালো বলার সাহস তারই আছে দাদা। যৌবনকালে গৌড়ার কি পোষা মেয়েমানুষ ছিল না? রাখনি ছিল না? খুব ছিল। তবে গৌড়ারে কাউর কিছু বলার সাধ্য ছিল না, পরিবার জেনেও বিশ্বাস করত না।

বিজন অবাকই হয়েছে। কী করে জেনেছে গৌড়েশ্বর? জানার উপায় কী? ঠিক দুপুরে গৌড়েশ্বর তো এই ঘরে ঘুমিয়ে ছিল, তাহলে? ধূলিহরে—এই জগৎপুরে বসে বশীকরণ, নখদর্পণ, থালার উপর জল রেখে জলদর্পণ এসব বিশ্বাস করলেও করা যায়। কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে কলকাতায় পৌঁছে গেলে ওসবের মূল্য কী? এই ধূলিহর যে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের। ষাট বছর আগে তো এসব ছিল। বিজন কি তাহলে ষাট বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে গেছে?

অথচ তার নিজের বয়সই তো বছর পঁয়তাল্লিশ। তা হোক, সে গৌড়েশ্বরের কথা শুনতে শুনতে বলল, আমি তাহলে উঠব এবার।

চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই।

না না আমি একাই যেতে পারব।

পারবেন যে তা কি আমি জানি না, একাই তো ফেরেন, একাই আসেন, আজও একা এসেছেন, কিন্তু আমি যাব।

কেন, কী হল?

কী হয়েছে তা আপনি জানেন দাদা, আপনার ভার আমার উপর, আমার একটা দায়িত্ব আছে, আমি ভালো-মন্দ বুঝি।

বিজন আর কথা বাড়াল না। যে কাজের জন্য এসেছিল তা হয়নি। এইসব কথার পরে চাবিটা চেয়ে নেয় কী করে? তার বাড়ি গৌড়েশ্বরের হেফাজতেই থাকল। যেতে যেতে গৌড়েশ্বর বলল, এখন তো আসছেন না, বউদি যে আসবে না তা আমি অনেকদিনই জানি, জমি কেনা থেকে জানি, কিন্তু বাড়িটা হয়ে গেল, ভালোই হয়েছে, দেখুন দাদা, বাড়ি কি ভাড়া দেবেন?

ভাড়া? বিজন চমকে গেল?

তারা হাঁটছিল ভেড়ির পাশ দিয়ে। এই পথেই দুপুরে দুধকুমারের বউ-এর সঙ্গে দেখা। বিজন বুঝতে পারছিল না সমস্ত দুপুর ধরে যা ঘটেছে তা বাস্তব কিনা। অমন যৌবন! তার মনে হচ্ছিল ষাট বছর আগের ধূলিহরে পৌঁছে গেলেই ঠিক হতো। রাত দুপুরে তার কোনো এক পূর্বপুরুষের মতো সেও সুসজ্জিত হয়ে গায়ে আতর লাগিয়ে, মাথার চুলে কলপ লাগিয়ে বেরোত অভিসারে। বোষ্টমীর বাড়ি গিয়ে দরজায় টোকা মারত! সেই সব কাহিনিই কি অন্যভাবে রচিত হচ্ছে না এই জগৎপুরে? আসলে জগতে একটাই তো কাহিনি, ক্ষমতার জোরে সব দখল করা, জমি থেকে নারী। কালিদাস বসু যা করেছিল সেই কত কাল আগে, সেইসবই তো করতে হবে বিজনকে। জগতে একটাই ঘটনা, নারী আর পুরুষের টান। সেই টান তো ছিঁড়বে না কোনওদিন। বিজনকে তাই অনায়াসে বশ করে বেঁধে ফেলেছে দুধকুমারের বউ।

কী হল কথা বলছেন না যে?

কী বলব?

দাদা কি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন?

কেন বলুন দেখি?

গৌড়েশ্বর বলল, দেখুন দাদা, আপনি এ লাইনের লোক না, যদ্দিন বাড়ি হয়েছে তদ্দিন আপনাকে মাথা তুলে তাকাতে দেখিনি, হঠাৎ কী হল?

বিজন বলল, জানি না।

তুক করেছে, মেয়েছেলে ওসব করে, করে বলেই পুরুষের মাথা ঘুরে যায়, আর দুধকুমারের বউটার ভিতরে ডাকিনী শক্তি আছে, না হলি দুটো পুরুষ নিয়ে থাকে? বউ ভেগে গেল স্যাঙাতের সঙ্গে, স্যাঙাত আর বউ দুজনকে ফিরিয়ে আনল আমার ভাইপো, এ কখনো হয়?

বিজন চুপ করে থাকে।

গৌড়েশ্বর বলল, হয় কেন ওর বউটা হওয়াতে পারে, দুটোকে আসলে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে, বলছি বাড়ি ভাড়া দেবেন কি?

কেন?

না দেওয়াই ভালো, আসলে ক'টা লোক ঘুরে গেছে, আমি ভেবেছি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেই এসেছে।

বিজন বলল, না আমার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেনি।

ফাঁকাবাড়ি, লোকের চোখ টাটাচ্ছে, আমি বলে দিয়েছি হবে না।

বিজন বলল, অদ্ভুত তো!

কত অদ্ভুত দেখবেন, বাড়ি পড়ে থাকলেই দালাল লেগে যাবে।

বিজন বলল, ভাড়া দিলেও তো হয়।

না হয় না।

হয় না মানে?

দেখুন দাদা, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কি তারা?

বিজন বলল, ভাড়া দিলে তো কিছু টাকা উঠে আসে।

বাড়িতে বাইরের লোক ঢোকাবেন?

ভাড়াটে তো।

আপনি এসে ঢুকতে পারবেন না, ভাড়াটে সব দখল করে নিজের বাড়ির মতো করে নেবে, আমার কিন্তু মত নেই।

বিজন অবাক হয়ে গৌড়েশ্বরের মুখের দিকে তাকায়। তার মত নেই। তার কি মত দেওয়ার অধিকার আছে? বাড়ি তো বিজনকুমার বসুর। গৌড়েশ্বর বলল, এত কষ্ট করে বাড়িটা করলেন ভাড়া দেওয়ার জন্য?

আমি তো লোক পাঠাইনি।

লোক আপনার কাছে যাবে, না হয় ফোন করবে, সললেকে সব কাজ করতে আসে, তারাই দালালের মারফত খোঁজ পেয়েছে।

আপনি কী বলেছেন?

না হবে না, বাড়িটার ভার দাদা আমার উপর দিয়ে গেছে।

বিজন চুপ করে থাকল।

গৌড়েশ্বর বলল, ভাড়ায় দেওয়া যেতে পারে, তবে একটা ঘর, বাকি দুটো

ঘর খালি থাকবে, আপনার নিজস্ব ঘর তো থাকবে একটা।

দুটো ঘর দিলেও তো একটা থাকে।

না দাদা, আপনার একেবারে নিজস্ব, একটা ঘরে তো আমি বা আমার ছেলে বউমা শোবে, আপনার ঘর সাজিয়ে রেখে দেব, আসবেন বিশ্রাম নেবেন।

বিজন বলল, না কিছুই করতে হবে না, আমি পরে সিদ্ধান্ত নেব।

যা বলেন, তবে বাড়ি তো আমার দায়িত্বে আছে, যা করবেন আমাকে জানাবেন, একটা নতুন বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে কত লোকের কত রকম লোভ, যে যা করছে সব কিন্তু ওই লোভে, বুঝলেন।

বিজন এবার দ্রুত হাঁটে। গৌড়েশ্বরকে বলল, আপনাকে আর আসতে হবে না।

ঠিক আছে আমি যাই, আবার কবে আসবেন?

দেখি কবে আসি।

আসবেন, না এলে মন খারাপ লাগে, বাড়ি তো আপনার, আমি কতবার উঠি, এঘর দেখি ও ঘর দেখি, বারান্দার গ্রিল দেখি, তবে গৌড়া থাকতে কারোর সাহস হবে না বাড়ির গায়ে হাত দিতে।

ফিরে এল বিজন খালি হাতে। ফিরে এল শূন্য হয়েই যেন, সামনে কবিতা। কবিতা বলল, তোমার কী শরীর খারাপ লাগছে?

না, না, ক্লান্ত হয়ে গেছি।

কী হয়েছে তোমার? কবিতার গলায় উদ্বেগ।

বিজন মুখ নিচু করে ফেলল। কবিতার সামনে এসে দুপুরের কথাটা মনে পড়ল প্রবলভাবে। ঘন দুপুর, হালকা অন্ধকার, নগ্ননারী, ঘামে লেপ্টে গেছে দুই শরীর...! ইস এমনতো এ জীবনে ঘটেনি কখনো। কবিতা কিছুই জানে না, শুধু তার মুখের অন্ধকার দেখে ভাবছে কী হল, রোদ লাগল? রোদ তো লেগেছে মেয়েমানুষের। উত্তাপ লেগেছে। যুবতীর শরীরের আগুন তার ভিতরে ঢুকে গেছে যে তা এখন টের পাচ্ছে বিজন। বিকেলের পর থেকে সেই উত্তাপ লুকিয়ে রেখেছিল গুহার অন্ধকারে ঢোকা শ্বাপদের মতো। এখন বাড়ি ফেরার পর জন্তুটা বেরিয়ে এসেছে। বিজন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। একি ঠিক হল? একে তো কোনোদিন ঠকায়নি সে, আজ থেকে কথা লুকিয়ে যেতে হবে।

চাবি এনেছ?

মাথা নাড়ে বিজন।

কী হল, বাড়িটা কি দখল হয়ে গেল?

না তা হবে কেন?

তবে কেন চাবি নিজের কাছে রাখলে না?

বিজন বলল, ভাড়া দেব কবিতা, এর মধ্যেই নাকি লোকে খোঁজ করে গেছে।

ভাড়া! ভাড়াটে উঠবে?

তবে কী করব?

বিক্রি করে দিতে হবে, রেখ না, আমার ভাল লাগছে না, আমার মনে হচ্ছে বাড়ি না, ও যেন একটা দেওয়াল।

কথা হচ্ছিল অন্ধকারে বসে। রাত গভীর হয়েছে। কবিতা বলছে, বিক্রির কথা হয়েই গেছে তো, তবে আবার ভাড়ার কথা উঠল কেন? বাড়ি করার পরই মনের ভিতর অশান্তি ঢুকে যাচ্ছে যে তা কি বিজন টের পাচ্ছে না? ও বাড়ি ঠিক ওই গৌড়েশ্বরের ভোগে থাকবে। নতুন পাকা বাড়ি, মার্বেল পাথরের মেঝে, ওই বাড়ি কি সে ছাড়বে? যা ডিসিশন এখনই নিতে হবে।

কথা হতে হতে থেমেই গেল একসময়। কবিতা ঘুমের ভিতর চলে গেল। বিজনের ঘুম নেই। ঘুম হবে কী করে? অন্ধকারের ভিতরে সে কবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘুমের ঘোরে কবিতা পাশ ফিরে শোয়। মুখখানি ওধারে চলে গেল। ঘুমের ভিতরেই কি সে টের পাচ্ছে বিজন আর আগের মতো নেই। প্রাচীন ধূলিহরে গিয়ে সে অন্য কেউ হয়ে যায়। যায় তো নিশ্চয। না গেলে ওই মস্ত দুপুর কীভাবে সে কাটাল দুধকুমারের বউ-এর সঙ্গে? বিজন সরে এল। চোখ বুজে দুপুরটিকে ফিরিয়ে নিয়ে এল নিজের ঘরে। একটু বাদেই তার ভয় ভয় করল। সে সরে গেল কবিতার দিকে। ডাক দিল, শুনছ?

ঘুম চোখে উঠে বসেছে কবিতা, কী হলো তোমার?

আমার ভয় করছে।

ভয়! কীসের ভয়?

কীসের ভয় জানি না কবিতা, কিন্তু ভয় করছে।

তোমার কী হয়েছে?

কী হয়েছে জানি না, আমি ওই ধূলিহরে গেলে কেমন হয়ে যাই।

কী হয়ে যাও?

আমি যেন সেই কালিদাস বসুকে দেখতে পাই।

পাগল। কোথায় দ্যাখো?

বিজন বলল, নিজের ভিতর।

নিজের ভিতর মানে, সেই লোকটা তো তোমাদের কেউ না।

তবুও তো আমাদেরই শাখা-প্রশাখার কেউ।

সেই লম্পট লোকটার কথা বলছ তো? কবিতা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

হ্যাঁ কবিতা, হ্যাঁ।

কবিতা তাকে দুহাতে বেড় দিল, বলল ও বাড়ি রেখ না, আমরা তো বেশ ছিলাম, একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনে নিলেই হয়ে যাবে, এই শহর ছেড়ে আমরা কেন ধূলিহরে ফিরব গো, কেন ফিরব?

আট

পরদিন সকালে একটি ফোন এল দুধকুমারের, দা'বাবু আমি খুব অন্যায় করেচি আমারে ক্ষমা করো।

বিজন বলল, না না ঠিক আছে।

ঠিক নেই দা'বাবু, শুনলাম তুমি রাগ করে গেছ, যেই না গেছ সেই আমি এয়েচি, গেলে আর আলাম।

আমি রাগ করিনি।

বললি হবে, তুমি করেছ, সে আমারে চাঁদনি বলেচে, সেই থেকে কী থেঁতো না করতেছে, বলতেচে অমন একটা মানী লোকেরে চা পর্যন্ত দিতি পারেনি, গেরস্তর সংসারে অকল্যাণ হবে, দা'বাবু আমারে ক্ষমা করো।

ঠিক আছে।

না ঠিক নেই দা'বাবু, তুমি চাঁদনিরে বলো।

পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে কথা বলছে। বিজন স্পষ্ট শুনল চাঁদনির কণ্ঠস্বর 'তুমি বাইরে যাও।' তার বুক দুরু দুরু হল। কী সাংঘাতিক সাহস ওর বউ-এর! বিজন ফোন কানে চেপে দাঁড়িয়ে। কবিতা এখন স্নানঘরে। ছেলেটি বই নিয়ে ঘরে। মেয়ে স্কুলে। বিজন সব দিক দেখে সতর্ক গলায় ডাকল, হ্যালো।

আমি কাল রাত ভোর ঘুমুইনি দাদাবাবু, তুমি আমারে কী করেছ!

ঠিক আছে, এখন আমি বেরোব।

বেরোতে হবে না, আমার কথা শোনো দাদাবাবু, তুমার মতো ভাল কেউ না দাদাবাবু, কবে আসবা আবার?

যাব।

এক্ষুনি এস দাদাবাবু এক্ষুনি এস, আমি আর কথা বলতি পারব না, আমি ওরে বলেচি একটা মোবাইল ফোন কিনে দিতি, কিন্তু তাতে হবে না দাদাবাবু, তুমারে আসতি হবে চাঁদনির নেকট।

বিজন ফোন কেটে দিল স্নানঘরের দরজা খোলার শব্দে। চুপ করে বসে

থাকল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কবিতা জিজ্ঞেস করল, কার ফোন?

দুধকুমারের।

লোকটা ভালো, ও ওর বউ ফেরত পেয়েছে?

বিজন হাসল, বোধহয়।

ওরা কেমন অদ্ভুত না! বউ চলে গেল, ফেরত আনল, সারাদিন তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকে, কী করে চলে? কবিতা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জিজ্ঞেস করল। কবিতার মাথায় একসময় খুব চুল ছিল। এখন কমে গেছে অনেক। দুধকুমারের বউ-এর মাথায় চুলের প্লাবন। খোলাচুল যখন ছড়িয়ে গিয়েছিল মেঝেতে মাদুরের উপর তার ভিতরটা গরগর করে উঠেছিল। কালিদাস বসু জেগে উঠে বলেছিল যেন, যা ইচ্ছে তাই করবি, যদ্দিন ভোগের সময় ভোগ করে নিবি, মেয়েমানুষের চেয়ে ভোগের জিনিশ আছে!

বিজন বলল, না আমার ভয় করে।

তুই না পুরুষমানুষ, পুরুষমানুষের আবার ভয়!

বিজন বলল, কবিতা টের পেলে আমার মুখ দেখবে না।

না দেখুক, না দেখলে কী হবে, ডবকা মেয়েছেলের সুখ কত বেশি!

আমার সংসার ভেসে যাবে।

যায় যাবে, তবে যাবে না গ্যারান্টি দিতে পারি, তুই ধুলিহর, ধুরোলের বোস বংশ, বোস বংশ মহাবংশ, তোর বউ জানলেও চুপ করে থাকবে, তার লজ্জা নেই! যা ধুরোলে যা, তুই আমারে জাগালি কত বছর বাদে।

বিজন বলল, না হয় না কালিদাসবাবু।

হয় না মানে, তুই বংশের মান রাখলিনে।

বিজন বলল, ধুরোলের পাট তুলে দেব।

দে দে, আমি ধুরোলে থাকব মরার দিন পর্যন্ত।

বিজন উঠতে উঠতে বলল, তাহলে সেল করে দিই কী বলো।

হ্যাঁ, আমি ওখানে যেতে পারব না, ওখানে ফেরা যায় না বিজন, তুমি একুশ শতক থেকে বিশ শতকের অর্ধেকে ফিরতে চাইছ, তা হয় না বিজন, তোমার ওই গৌড়েশ্বর লোকটা হয়ত তোমাদের সেই কালিদাসের শিষ্য, আমার একদম ভালো লাগছে না ওই পরিবেশ।

বিজন বলল, ডেভলপমেন্টের জন্য অপেক্ষা করলে হত না।

ততদিনে গৌড়েশ্বর দখল করে নেবে সব, তোমাকেও দখল করে নেবে, কাল তোমার কী হয়েছিল?

কী? যতীনের বুক কেঁপে ওঠে।

তোমার কিছু হয়েছিল ঠিক।

কী হবে?

কবিতা বলল, তুমি ঘুম ঘোরে কী বিড়বিড় করছিলে?

কখন? আমি তো কত রাতে ঘুমিয়েছি, তুমি কত আগে।

শেষরাতে। কবিতা চুলে আলতো খোঁপা করে বিজনের সামনে এল বড় আয়না থেকে, বলল, কী চাঁদনি রাতে চাঁদনি রাতে... বুঝতে পারা যাচ্ছিল না, চাঁদনি রাতে কী হয়েছিল?

বিজনের বুক থেকে পাষাণ নামে না, বলল ডেকে দিলে না কেন?

ডাকতে হল না, আমি তোমায় পাশ ফিরিয়ে দিলাম, ঘুমের ঘোরে তোমার বুকে হাত পড়লে এমন হয় আমি জানি।

বিজন চুপ করে থাকল। কবিতা বলল, বলো চাঁদনি রাতে একবার তোমার ওই বাড়িতে থেকে আসি, বিক্রি তো হয়েই যাবে।

খদ্দের ঠিক হলে তারপর।

জায়গাটা পূর্ণিমা রাতে খুব সুন্দর হবে, তাই না?

বিজন বলল, পূর্ণিমা রাতে আমাদের ধূলিহর থেকে মাইল দুই দূরে বিলে নামত হাঁসের পাল, আমার মা একবার দেখেছিল বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি আসার পথে, হাঁসের পাল নামছে। সব সাইবেরিয়ার পাখি।

সেই সব দিন চলে গেছে, আর ফিরবে না বিজন।

হাঁসের পাল যে আসে শীতে।

নামার জায়গা না পেয়ে ফিরে যায়, গুলিতে মরে। কবিতা বিড়বিড় করে।

বিজন বলল, তাহলে ধূলিহরে তো আমরা যাব না?

না যাব না, পেছনে ফিরব না।

অনেক সময় সামনে এগোতে পেছনে তাকাতে হয় কবিতা।

কবিতা বলল, হ্যাঁ কতদূর এলাম জানার জন্য কিন্তু সে তো যতখানি চোখ যায়, তারপর কি পারবে?

বিজন বলল ধূলিহরে মানে ওই জগৎপুরের বাতাসে যে কী আছে?

কী আছে?

আমি বদলে যাই যে।

তুমি মনে করো তা, আসলে কিছুই নেই, অজ গাঁ।

হতে পারে না, কালিদাস বসু লোকটা একেবারে চিরস্থায়ী হয়ে আছে ওখানে কবিতা, লোকটাকে যেন দেখা যায়।

ওফ! তুমি পাগল নাকি?

আমার ভিতরে ঢুকে পড়ে লোকটা।

কী সব কথা বলছ, কাল রাত্তিরেও কী সব বলছিলে না, তুমি আর যাবে

না ওখানে, ও বাড়ি সব্বোনেশে, দেখলে না ইরফান থাকতে পারল না।

বিজন বলল, কত যত্ন করে, কত কষ্ট করে বাড়িটা করলাম, নিজে বসে বসে দেখেছি একটার পর একটা ইট গাঁথা।

ওভাবেই বাড়ি করে মানুষ, তুমি নতুন কিছু করোনি, নতুন যেটা করেছ তা হলো সুন্দরবনের লোক জগৎপুরে এসে সভ্যতাকে ছোঁয়, তুমি কলকাতা থেকে যাচ্ছ, উলটো যাত্রা। বলতে বলতে কবিতা আচমকা রেহাই দিল যেন। প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে চলল কিচেনের দিকে। বিজনের মনে হল সে বাঁচল। এখন মনে হচ্ছে যদি সত্যি সত্যি পেছনে হেঁটে থাকে সে, তাই হাঁটবে। ধূলিহর থেকে কলকাতায় এসে কী বদল হয়েছে মানুষের? অন্তঃকরণ কি বদলেছে? দেশভাগ স্বাধীনতা থেকে ধূলিহর থেকে এপারে এসে এতবছর যে কাটল কী হলো চারদিকের? যে ভয় থেকে দেশটা ভাগ হয়েছিল সেই ভয় তো রয়েই গেছে। শুধু কি মসজিদের আজান শোনা যায় না তাই ফিরে এল ইরফানের বউ রেহানা? ওরা কি থাকতে পারত শেষ পর্যন্ত? ভয় থাকত না? শেষ অবধি ইরফান কি তাদের এলাকায় ফিরে গেল না? একসঙ্গে বসবাস করার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে কি এদেশের মানুষ এখনো? বরং ধূলিহর-এ তা ছিল। ঠাকুর্দা তো সব জমি মুসলমান চাষাদের ভিতর বিলি করে চলে এসেছিলেন এপারে। বিজনের মনে হচ্ছিল আবার যায় জগৎপুর-ধূলিহরে। তাকে টানছে দুধকুমারের বউ। আজ গিয়ে গৌড়েশ্বরকে বলে আসে তার চাবি তার কাছে থাকবে, না হয় দুধকুমারের কাছে থাকবে। তার দালানে চাঁদনি এসে থাকবে। বিজন অস্থির হয়ে উঠছিল ভিতরে ভিতরে।

চা লাগবে আবার? কবিতা এল।

মাথা নাড়ল বিজন। খবরের কাগজ মেলে ধরেছে চোখের সামনে। কবিতা চলে গেল। বিজনের চোখের সামনে খবরের কাগজের কোনো অক্ষরই স্পষ্ট হচ্ছিল না। সে ভাবছিল আর একবার সন্তোষ চক্রবর্তীর কাছে আমতলিতে যেতে হয়। কালিদাস বসু সম্পর্কে আর কী জানে তা খুঁজে নিয়ে আসে। ঠাকুর্দা এক রকম ছিলেন, তাঁর জ্ঞাতিভাই কালিদাস ছিলেন আর এক রকম। লোকটা ছিল বাঘ। জমি আর নারী দখলেই যেন ছিল জীবনের অসীম সফলতা। যতটা সময় পেয়েছে এই সব নিয়ে জীবন কাটিয়েছে। পার্টিশনও তাকে দমাতে পারেনি। এপারে এসে ওই জীবন কি কাটাতে পারত? জীবনের ওই রসের টানে ধূলিহরে পড়ে থাকল। নিঃসন্তান। বউ মারা গিয়েছিল দ্বিতীয় না তৃতীয় পক্ষের। শেষে বাগদি বউ-এর কৃপায় বেঁচেছিল। মৃত্যুর সময় খুব কষ্ট পেয়েছিল, কিন্তু সেই কষ্ট কে না পায়? মৃত্যুযন্ত্রণা তো থাকে। যে প্রাণ এ জীবনকে সজীব রেখেছিল, সর্ব রিপুর আধার করে রেখেছিল, বারবার ধাবিত

করেছিল অগ্নিরূপী নারীর দিকে, ক্ষমতারূপী মৃত্তিকা-জমির দিকে, সে প্রাণ যখন দেহ ছাড়ে, কষ্ট না দিয়ে যায়? কষ্টটা কিছু না। পচে গলে মরেছিল, তবুও ওই কষ্ট কিছুই না। লোকটা ভোগ তো কম করেনি। যে ভোগ করেছে তেমনি তার জন্য দামও তো দিয়েছে। তাহলে এ জীবনের পাপ এ জীবনেই শোধ করে গেছে। তাই তো করে যেতে হয়। আমতলির সন্তোষ চক্রবর্তী কী করে শোধ নেবে? কালিদাস তো পঞ্চভূতে বিলীন। বিজন উঠে স্নানে যায়। স্নানঘরে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

স্নানঘরের আলো কম। আলোর ভিতরে চোখে যেন ঘোর লাগে। এ ফ্ল্যাটের বয়স অনেক। স্নানঘরে দাঁড়িয়ে বিজন দ্যাখে দুধকুমারের বউকে। হারিয়ে যাওয়া, বিলীন হয়ে যাওয়া তার গায়ের ঘামগন্ধ গতদিনের দুপুর থেকে ভেসে আসতে থাকে। দুচোখ বন্ধ করে সেই গন্ধটি সে আস্বাদ করতে থাকে। তখন সে টের পায় এই হলো ভেসে যাওয়া। চাঁদনি গরগর করতে করতে কী বলছিল, ভাসাতে পারি আমি দাদাবাবু, বিজন, তুমারে আমি বিজন বলে ডাকি, বিজন বলে একটা লোক ছিল, তার নামও ছিল বিজন, সে আমারে পেত্থম নেয়, তখন আমার চোদ্দ না পনের, আমার বাপের মুখ বেঁধে আমারে তুলে নিয়ে গেল সললেকের বালির মাঠে, কোন একটা বাড়ি হচ্ছিল, তার ভিতরে ফেলে আমারে পেত্থম নেয়, তুমি সেই বিজন, বিজন বিজন!

বিজনকুমার বসু ছটফট করে ওঠে। তখন দেহের তাড়নায় যে চাঁদনি যা বলছিল মধুর মতো বর্ষিত হচ্ছিল তার কর্ণকুহরে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাঁদনি বলছিল; তাই তুমারে পেত্থম দেখেই আমার শরীরে ডাক উঠেছিল বিজনদাদাবাবু, বিজন, বিজন, মনে হয়েছিল সে ফিরে এয়েচে ভালোবাসা করতে, সেদিন তো ভালোবাসা দেয় নাই।

ভালোবাসা ছাড়া হয়?

হয়, খুব হয়, আমার তখন মরে যাওয়ার কথা ছিল, রক্তে ভেসে গিয়েছিল সব, কী করে যে বাঁচলাম জানিনে, ওর ভিতরে কি ভালবাসা ছিল, ছিল না, ছিল খিদে, মাংসের খিদে।

বিজন বুঝতে চেষ্টা করছিল তার ভিতরে কালিদাস বসুর ভিতরে কি ভালবাসা ছিল? কাল দুপুরে যা করেছে তা কি ভালোবাসায়? নিম্নবর্গের ওই রমণীকে সে ভালবাসতে যাবে কেন? ওর সঙ্গে কি সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতে পারবে? ওর সঙ্গে কি সে সংসার পাততে পারত, পারবে? ও কি ভরত নাট্যম জানে, রবীন্দ্রনাথের গান জানে, কখন ভৈরবী কখন পূরবী মাড়োয়া—তা জানে? ও কি জানে পদ্মা নদীর মাঝির কথা, তিতাস একটি নদীর নাম-এর কথা? ও কি জানে সেইসব কাহিনিগুলি মৎস্যজীবীদের নিয়ে।

দুধকুমার, গৌড়েশ্বর তো আসলে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের। এককালে সল্টলেক এলাকা, জগৎপুর, মহিষবাথান, বারোকপাট, থাকদাড়ি দিয়ে বয়ে যেত বিদ্যাধরীর কত শাখা-প্রশাখা। নোনাজলের ভেড়িতে ভর্তি ছিল সব। ঘরে ঘরে জাল। জাল ফেলে নৌকো বেয়ে জীবন কাটত যাদের, তারা নদী হারিয়ে গেলে, জলাভূমি বুজিয়ে ফেলে নগরপত্তন হলে জীবিকা হারিয়ে উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে। কলকাতা যত তার হাঁ মুখ বাড়াচ্ছে ততই বিপন্ন হয়ে কী করবে কী করবে না তা ঠিক না করতে পেরে তাড়ি খেয়ে সমস্ত দিন মাঠে পড়ে থাকছে। জল গেছে মাছ গেছে, তাদের জীবনও গেছে। নগর ঢুকছে, আর কী উপায়? জমি মাটি সব যাচ্ছে একটু একটু করে। শুধু বউটিকে আড়ালে রেখে কী করবে? দুধকুমার ভালোই জানে। জানে বলেই ফেরেনি। ফিরবে না যে তা তো চাঁদনিই বলেছিল, বলেছিল, দাদাবাবু বিজন, তুমার পায়ে ফুল দিয়ে ও নেশা করতেই গেছে, ফুলটা হলো এই চাঁদনি, চাঁদনিরে দে পুজো করল তুমার নেশাখোর, ওর লোভ বড় কম, আজগের জন্যি যা দরকার সেটুকুতেই হয়। দাদাবাবু বিজন তুমি তো ভালোবাসতে এসেছ।

বিজনের গায়ে অঝোরে শাওয়ারের জল ঝরে পড়ছে। বিজন টের পায় তার গা থেকে কাল দুপুরের ঘাম গন্ধ, রমণী শরীরের গন্ধ সরছে না। সে সুগন্ধী সাবান গায়ে ঘষতে থাকে। চাঁদনির ঘরে সস্তার লাক্স সাবান আর শিশিতে নারকেল তেল, একটা পন্ডস পাউডার—এই প্রসাধন। আজ গিয়ে ওর হাতে টাকা দিয়ে আসবে। ভালো শাড়ি ব্লাউজ শায়া—ইস। শায়াটা কী ময়লা! কোমরের ধারে ফেঁসেও গেছে অনেকটা। বিজন বহুক্ষণ ধরে স্নান করে বেরিয়ে আসে।

কবিতা বলল, কখন স্নানে ঢুকেছ, দেরি হয়ে গেল না?

ওদিকে গেলে খুব ধুলোময়লা লাগে।

লাগে তো, আর যেতে হবে না, কাগজে অ্যাড দাও বিক্রির।

আগে তো পজেশন নিতে হবে, চাবিটা নিয়ে তালা দিয়ে তবে তো বিক্রি, না হলে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা তৈরি হবে।

কিসের অপ্রীতিকর, আমি সোমেনদাকে বলছি ফোনে, পুলিস সার্ভিস ওর, ডি এস পি, বলে দিলে ঠেঙিয়ে বের করে দেবে না গৌড়েশ্বরকে।

কবিতা এত অবধি ভেবেছে। এই ভাবনাটা বিজনেরই ভাবার কথা ছিল।

নয়

ক'দিন ধরে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল বিজন মনে মনে, আবার সিদ্ধান্ত বদল করছিল। বাড়িটা বিক্রি করে দিলে জীবনের আর কী থাকবে? সে তো একেবারে খেয়ে পরে বাঁচা নিপাট মধ্যবিত্ত। এক সময় কবিতা লিখত, কবি হয়েই জীবন কাটাবে এমন ইচ্ছা পোষণ করত। কিন্তু সেই কবিতা কোথায় ভেসে গেছে। কলমই ছোঁয় না অফিসের কাজ ব্যতীত। শুধু মাঝে মধ্যে কবিতার বই, ভালো উপন্যাস, গল্পের বই পড়ে। বই নিয়ে আসে কবিতা। বিজনও কেনে সাময়িক পত্র—এই পর্যন্ত। বাড়ির জমি কেনা, বাড়ি করা, তারপরে সেখানে যাওয়া না যাওয়া সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়ে জীবন একটু ব্যতিক্রমী হয়ে গিয়েছিল। আর তা হয়েও যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। ধূলিহর নামের বাড়িটি, জগৎপুর, দুধকুমার, দুধকুমারের বউ, গৌড়েশ্বর, তার পুত্রবধূ সারা সব তাকে টানছে অবিরত। বাড়ি বেচে দিলে আবার সেই কলকাতা শহর নামের জেলখানাটির ভিতর আটকা পড়ে থাকতে হবে। জীবনের জেলখানায় যে প্রাচীর ধূলিহর-জগৎপুরে তার কোনো চিহ্নই ছিল না।

সন্ধেবেলায় বিজন বসে আছে মনুমেন্টের সামনের সবুজ মাঠের অন্ধকারে একা। এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত জন বসে আছে। নারী-পুরুষ যুগলে যেমন আবার একা একা কতজন। একা একা আকাশে তাকিয়ে আছে। আবার আজ সকালে ফোন করেছিল দুধকুমার। তারপর তার হাত থেকে ফোন নিয়ে চাঁদনি। বারবার বলছে, কবে আসবা দাদাবাবু? দাদাবাবু দুধকুমার থাকপে না, ক'দিন ধরে যাচ্ছে সললেক। ভগবানের ক্যান্টিন চালু করতে চাইছে আবার। না হলে রাস্তার ধারের ওই ঝুপড়ির হোটেল অন্য লোক দখল করে নেবে। দাদাবাবু দুকুরে এস, আমি একা বসে থাকি তোমার জন্য, এস গো এস।

ডাক শুনেছিল বিজন যেন স্ত্রী কোকিলের ডাকের মতো। ডাক শুনেছিল বিজন বাঘিনীর ডাকের মতো। তার মনে হচ্ছিল, না গিয়ে পারবে না। শেষ অবধি যেতে পারেনি। তাকে আটকে ছিল কে যেন। কবিতার মুখ। নাকি এতদিনের অভ্যেস যা সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে দুর্গাদাস, তস্যপুত্র অনন্তকুমারের কাছ থেকে।

সন্ধে হতে, সমস্ত দিন কেটে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে যেতেই পারত। একা একা সে বসে আছে সবুজ ঘাসের উপর। হাওয়া আসছে পুবদিক থেকে। ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে। ওদিকে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। পুবেই তো জগৎপুর-ধূলিহর। ওদিকে মেঘ এসে ভিজিয়েছে মাটি, দুধকুমারের ঘর। দাওয়ায় একা বসে আছে চাঁদনি। একা অসফল, ব্যর্থ নারীর মতো বিষণ্ণ মুখে, দু-হাঁটুর ভিতরে মুখ গুঁজে।

অথবা সে ফুঁসছে। অতৃপ্ত বাঘিনীর মতো পায়চারি করছে নিবিড় অন্ধকারে।

তার পাশে এসে বসল একটি মানুষ। রোগা চোখমুখে বার্ধক্যের ছায়া, গায়ে একটি ধবধবে আর্দির পাঞ্জাবি, ধুতি, পামশু, গা ভর্তি এসেন্সের গন্ধ ভুরভুর করছে। হাতে কয়েকটি আংটি। ভাগ্য পরিবর্তনের নানা শক্তিতে ভরা সেগুলি। বিজনের মনে হলো মুখখানি যেন চেনা। কোথায় কবে দেখেছে!

মানুষটি বলল, একা একা যে।

আপনি!

লোকটি হাসল, তোমাকে দেখে এলাম।

আমাকে চেনেন?

না চিনলে বসি বিজন, কিছু ভাবলে?

বিজন জিজ্ঞেস করল, আপনি?

লোকটা বলল, সিদ্ধান্ত তো একটা, বাড়িটা রেখে দাও।

আপনি জানেন সব?

না জানলে কি বলি, তোমাকে দুর্গাদাস ভোগাচ্ছে।

কী বলছেন?

যা বলছি ঠিক, দ্যাখো আমার নাম কালিদাস, কালিদাস বসু, দুর্গাদাস আমার জ্যাঠতুতো ভাই, ছ'মাসের ছোটবড় আমরা, ও কি জীবনটাকে বুঝত?

বিজন দেখল পুরো মাঠ যেন শূন্য হয়ে গেছে। মাঠও বড় হতে হতে অসীম এক প্রান্তরের মতো হয়ে গেছে। অন্ধকারে সব ছেয়ে আছে। তার মুখোমুখি বসে লোকটা বলছে, জীবন একবার।

বিজন বলল, সে কথা কে না জানে?

সবাই জানে না, ভাবে এজন্মে ভালো কাজ করলে পরজন্মে আরো সুখে থাকবে, পাগল, যা করবার এজন্মে করো, মানুষের জীবন একটা, যদ্দিন পারো বেঁচে থাকো ভালো করে, বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ মানুষের নেই।

বিজন বলল, জানি।

না জানো না, কী করে বেঁচে থাকতে হয় জানো না।

কী করে?

ভোগ করে, ভাল খাও না তুমি বিজন?

বিজন বলল, হুঁ।

কী খেতে ভালোবাস?

বিজন বলল যা ভালোবাসি তা খাই।

জিভে দিলে কেমন লাগে?

ভালো, ভালো কিন্তু আপনি কী বলতে চাইছেন?

জীবন মানে ভোগ করা, ধূলিহর ছাড়ব কেন, শালা তোর পিছু পিছু আমি আবার ফিরে যাচ্ছিলাম ধুরোলে, মেয়েমানুষটা সত্যিকারের মেয়েমানুষের মতো, বাঘিনী, কী তেজ, ভোগ করে সুখ হয়নি তোর?

বিজন বলল, আপনি চলে যান ঠাকুদ্দা মশায়।

তুই বল বিজন, তোর আনন্দ হয়নি, ও সুখ গেরস্ত তার ঘরে পায়?

বিজন বলল, ওটা ঠিক না।

কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক তুই জানবি কীভাবে? আজ যেটা ঠিক মনে হয়, পরে তাই ভুল হয়ে যায়, জীবনের মানে কি সত্যি করে খুঁজে পেয়েছে কেউ?

বিজন চুপ করে থাকল। মনে মনে প্রার্থনা করছিল লোকটা যেন উঠে যায়। লোকটার গা থেকে ভেসে আসা উগ্র এসেন্সের গন্ধ তার গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এত গন্ধ কেন? পচনের গন্ধ চাপা দিতে?

লোকটা বলল, ধূলিহর রেখে দে, ওখেনে জীবনটা চাখতে পারবি, না রাখবি তো বনে পাহাড়ে কমন্ডুল হাতে চলে যা একা, শালা অমন একখানি মেয়েমানুষ, অমন বুক, অমন পেট-তলপেট, অমন পাছা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছে, ওরে কি ছাড়া যায়, ছাড়বি কেন?

বিজন বলল, আমার ভয় করে।

লজ্জা, ঘেন্না, ভয় তিন থাকতে নয়, খোঁজ নে কোন লোকটা কী করত না, এত যে সব মহাপুরুষ সেজে বসে আছে, জন্মদিনে ফুলচন্দন মালা পরাচ্ছিস, তারা কী করেছে বেঁচে থাকতে তা জানিস নে বিজন?

বিজন বলল, তারা পারে আমি পারি না।

পারবি, আমি সঙ্গে থাকলে পারবি, ওই ধুরোলে মেহফিল বসা, নতুন নতুন নিয়ে আয়,আরে বাপ চাঁদিতে সব ঠাণ্ডা।

বিজন বলল ওই ভয়েই বাড়ি বেচে দেব।

বেচবি কেন? খ্যা খ্যা করে হাসল লোকটা, দান করে দে ওই দুখে আর তার বউটাকে, না হলি গৌড়ার পুতির বউটাকে, বউটা যখন তোর হাত ধরে বলল বাড়িঘর তো মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষের লীলা দেখতে চায়, তোর মনে হয়নি লীলা করার কথা?

থাক ঠাকুদ্দা।

চোপ আমি তোর ঠাকুদ্দা নই, তোর ঠাকুদ্দা দুর্গাদাস, সারা জীবন আমারে ঘেন্না করেছে, নিবৃত্ত করতে চেয়েছে, আমি তোরে আমার পক্ষে আনব, তুই রেখে দে দালান, ওরা জানে তোর অনেক আছে, তোর বউ আসবে না ওখেনে তবু তুই বাড়িটা করলি অমন যত্ন করে, কেন করলি, খেয়ালে করলি, এখন

তুই ডাকলি ওই সারাও তোর কাছে চলে আসবে, ওর স্বামীটা যে মেয়েছেলের চক্কোরে পড়েছে, ফেরা কঠিন।

ফিরছে তো।

ছাই ফিরছে, রাত্তিরে তোর ঘরে ওর বউরে ছোঁয়ও না।

ঠাকুদ্দা আমার এসব জেনে লাভ নেই, বাড়ি বেচে দিলেই শান্তিতে থাকতে পারব।

শান্তি! আবার হাসল লোকটা। শান্তি পাবি তুই, চিতায় উঠে আগুনে পুড়তে পুড়তেও মেয়েমানুষকে ভোলে না পুরুষ, মরণের পরেও কি শান্তি থাকে? পাহাড়ে যে সাধুসন্তরা থাকে, তাদেরও কি শান্তি থাকে, তুই যা করছিস সব ঠিক, কাল যা দেখি ধুরোলে।

বিজন ভাবছিল ওঠে। কিন্তু পারছে না। কালিদাস বসু যেন তাকে ঘিরে রেখেছে তার গন্ধবলয়ে। ওই বলয় ভেদ করে যাওয়ার কোনো উপায় নেই তার। কালিদাস বলছে, যা বিজন দুপুরে যা, মেয়েটা সব পাতিয়ে বসে আছে। যাওয়ার সময় একখানা ভালো কাপড়, ভালো সাবান, স্নো পাউডার নিয়ে যা, হাতে নোট ধরিয়ে দে, যাওয়ার সময় ভালো দোকানের মাংসের বিরিয়ানি নিয়ে যা। পেটভরে খাইয়ে দে। ভরাপেট থাকলে ওর খেলা দেখবি, ও হলো জাত নাগিনী। শঙ্খ লাগাবে এমন তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে, অমন খেলুড়ে ছিল আমার ধুরোল-ধূলিহরের হেলে বাগদির বউ, শিকড় বাকড় জানত, আপনা আপনি পেট খালাস করত, এর ভিতরে দুটো পেটেও ধরেছিল, দুটোই আমার।

বিজন মাথা নামিয়ে বসেছিল। তার মনে পড়ছিল আমতলির সন্তোষ চক্রবর্তীর কথা। সেই বাগদিরা আমতলিতে এসে উঠেছে ওপার থেকে। কালিদাস বসুর রক্ত ওখানে প্রবাহিত হচ্ছে। সে বলল আমি এবার যাব।

কোথায় যাবি, ধুরোল?

বিজন মাথা নাড়ে, বলে তিনরাত্রি থেকে ছিলাম গৃহপ্রবেশের সময়ে তারপর আর না, দুপুরে যাই সন্ধের পর ফিরি।

একেবারে ছা-পোষা গেরস্ত, রাত্তিরে থাকা অভ্যেস কর।

কবিতাকে কী বলব?

কী আবার বলবি, নিজের বাড়ি থাকবি না?

কবিতা বারণ করবে।

কোন বউ হ্যাঁ বলে, বলবি থাকতে হবে তাই থাকব।

ও হয় না, কবিতা সন্দেহ করবে।

এখনো সন্দেহ হয়নি?

খুব বিশ্বাস করে আমাকে।

কালিদাস বসু বলল, আরে থো ঘরের বউকে, সব দিক সামলে এসব চলে না, আমার একটা বউ তো গলায় দড়ি দিয়েছিল।

বিজন বলল, ঠাকুদ্দা তুমি যাও।

না যাব না, আমি একা একা ঘুরছি কত কাল! সমস্ত জীবনেও আমার ভোগের লিপ্সা মেটেনি, জলতেষ্টার মতো মেয়েমানুষের তেষ্টা নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি বিজন, বংশের একটাও আমার মতো হয়নি।

আপনার তো বংশ নেই।

নেই কি, বাগদি বউ-এর পেটে হয়নি?

সে আপনার নয়।

তবে কার?

যার হয় হবে, আপনার নয়। বিজন এবার গন্ধবলয় ভেদ করতে চাইছে।

কালিদাস বোস বলে, নারে বিজন না, আমার মেয়ে সন্তান কি ছিল না, ছিল, বাগদি বউ দিয়েছিল ছেলে, বোষ্টমী ছিল পুবপাড়ায়, সে তো পেট খসালো, তা বাগদিদের ঘরে যারা বড় হল তারা কেউ আমার মতো হল না, শুধু এতকাল বাদে তোরে পেয়েছি।

বিজন বলল আমি এবার উঠব।

না উঠবিনে, বলছি তোর বউ সন্দেহ করে করুক, তুই তোর সুখ ভোগ করে যা, ধুরোল ছাড়বিনে, ধুরোলে গিয়ে পড়ে থাক, আমি তোর ছায়া হয়ে থাকব, জীবনটাকে দেখে নে ভালো করে, না হলে পরে শুধু হা-হুতাশ করবি একা একা, যা তোর বাপ ঠাকুদ্দা করেছিল শেষ বয়সে।

তাঁরা পুণ্যবান মানুষ ছিলেন, তাঁদের কথা তুলবেন না।

পুণ্যবান মানুষের কথা আর বলিস নে, সব জানা আছে, তুই ধুরোল যাবি কি না।

বিজন বলল, ভয় করে।

আবার ভয়, আমি তোর পিছনে আছি।

তাতে বিপদ ঘটবে না?

বিপদ ঘটতে পারে, কিন্তু তুই তা সামলে নিবি, আমি সামলে দেব।

বিজন দেখছিল লোকটাকে। রাত অনেক হয়েছে। হুইসল মারতে মারতে একটা পুলিশ কনস্টেবল মাঠে ঘুরছে। নারীপুরুষদের তুলে দিচ্ছে, ভাগো ভাগো। বিজনের কিছুটা দূরে এসে সরে গেল। বিজন বলল, উঠি এবার।

আলাপ হল না তো ভালো করে। ধুতি-পাঞ্জাবি বলল।

আপনি?

আমি নির্মলেন্দু পালিত।

আমি কালিদাস বসু। বিজন অক্লেশে বলে দিল।

আপনার সঙ্গে এর আগেও আমার দেখা হয়েছে?

বিজন বলল, হয়েছে বোধ হয়।

হ্যাঁ হয়েছে, আপনাকে আমার ভালো লাগে।

কেন? বিজন জিজ্ঞেস করল,বলল, একটা কথাও তো হল না।

তবু, আপনিই বলুন না কেন?

বিজন বলল, বলব কী করে?

কালিদাসবাবু আপনি একা বসে থাকেন, দেখলেই মনে হয় আপনাকে দেখেছি, বাড়ি?

বিজন বলল, ধুরোল।

সে কোথায়?

জগৎপুরের কাছে।

বিজন জিজ্ঞেস করল আপনার বাড়ি?

আমি উত্তরপাড়ায় থাকি।

এখানে কী করতে?

ভালো লাগে না বাড়ি ফিরতে, একটু বসে যাই।

বিজন উঠতে উঠতে বলে, পরে আবার দেখা হবে।

হবে কালিদাসবাবু, ভাল থাকবেন।

হাঁটতে লাগল বিজন। বাড়ি ফিরতে একটু রাত হলো। কবিতা বলল, কোথায় ছিলে, দেরি হলো যে?

বিজন বলল, দরকার ছিল।

তোমার দুধকুমার এসেছিল টাকার জন্য।

কীসের টাকা?

সে তো আমি জানি না, বলল পায়, অদ্ভুত! তুমি তো বলোনি কোনোদিন।

দশ

যাচ্ছে বিজনকুমার বসু। চোস্তা পায়জামা, ফিনফিনে পাঞ্জাবি, গায়ে সেন্ট, ভুরভুর করছে গন্ধ। বিজনকে ঘিরে এক গন্ধবলয় তৈরি হয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বলল, চলো জগৎপুর ধূলিহর।

কাঁহা?

জগৎপুর ধূলিহর, শুনা নেহি?

নেহি হুজুর।

বিজন বলল, আগে সল্টলেক, উসকিবাদ ধুরোল।

ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করল। বিজন আয়েশ করে বসে সিগারেট ধরাল তারপর জিজ্ঞেস করল, কালিদাস ঠিক আছি?

আছ, রাত্তিরে ফিরো না।

বিজন বলল, শাড়ি জামা তো কেনা হয়নি।

পরের দিন দিয়ো, আজ তো দুধকুমারকে দিতে হবে, ও এসেছিল না তোমার বাড়ি, ধমকে আসবে।

হুঁ, কবিতা বারবার জিজ্ঞেস করছিল কেন এসেছিল।

তোমার বউ-এর কৌতূহল কেন এত?

জিজ্ঞেস করে, এমনিই করে।

এত জিজ্ঞেস করবে কেন, তুমি কাজ করো, আজ থেকে যাও তোমার বাড়িতে।

বিজন ভাবল, থেকে যাওয়া যেতেই পারে। আজ সে থাকবে বলে গৌড়েশ্বর মণ্ডলকে বলবে নিজের বাড়ি গিয়ে থাকতে। সে ছাদে বসে থাকবে একা একা, বহু রাত্রি পর্যন্ত। অন্ধকারে ছাদে বসে একটু একটু করে পিছনের কথা ভাবতে ভাবতে জন্মের আগে চলে যাবে। তার জন্মের আগের গ্রাম, যৌবনের কালিদাস বসু। জুতো মশমশিয়ে যাচ্ছে বাগদি বাড়ি। কে না জানত? কালিদাসের বউ, বিজনের ঠাকমা জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

ফিরতে রাত হবে।

কেন থেকে এস না।

কালিদাস বলল, বেরোনর সময় মেজাজ বিগড়ে দিয়ো না তো, কাজে যাচ্ছি, দুগ্গা দুগ্গা করো।

রাত্তিরে কাজ, কী কাজ আমি জানিনে! হিসহিস করে ওঠে কালিদাসের প্রথম পক্ষ।

জানো তো মুখ বুজে থাকো।

কেন থাকব?

চুপ কর, না হলি চেলা কাঠে পিঠে ভাঙব মাগী, তোর কথায় খুব বিষ।

বিজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এও কি হতে পারে? ঘাড় হেঁট হয়ে যায় তার, বিড়বিড় করে বলে, কালিদাস তুই যা।

যাব কেন, আমি তোর ভিতর দিয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করছি।

না কালিদাস যা, আমি আমার মতো থাকি।

তা কি হয় বিজন, তোর ঠাকুদ্দা আমারে খুব ঘেন্না করত, কথাই বলত

না, পারলে আমাকে পুলিশে দেয়, দারোগা, সার্কেল ইন্সপেক্টর আমার কাছে পেত অনেক, তারাই সব রক্ষা করত।

বিজন বলল, ঠাকুদ্দা তুমি যাও, আমার চোখ জুড়িয়ে আসছে।

ঘুমোবি, ঘুমো, কিন্তু আমি যাব কেন?

তুমি থাকলে আমার ঘুম হবে না।

ট্যাক্সিতে ঘুমের কী দরকার? তোর সব জানা দরকার, শোন তোর ঠাকুদ্দা একবার মোছলমান চাষাদের খেপিয়ে দিয়েছিল আমার বিপক্ষে, কিন্তু দারোগা যার সহায় তারে কে কী করবে?

আমার তো দারোগা নেই ঠাকুদ্দা।

নেই নেই, হবে, যখন দরকার পড়বে তখনই হবে, শোন তুই দুধকুমারের হাতে পঞ্চাশের বেশি কখনো দিবিনে, যদি দেওয়ার হয় মেয়েছেলেটাকে দিবি, সেই তো তোরে যত্ন করছে।

কানের কাছে বিড়বিড় করে যাচ্ছিল কালিদাস। হাওয়া দিচ্ছিল ঠান্ডা। হাওয়ায় চোখ জুড়িয়ে আসছিল, ঘুমিয়ে পড়ছিল বিজন। কালিদাস তাকে ডেকে ডেকে একসময় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ঘুম ভাঙল সময়ে। পথ দেখিয়ে দেখিয়ে ট্যাক্সি এল জগৎপুরে। বিজন ভেবেছিল সোজা চলে যাবে দুধকুমারের বাড়ি। কিন্তু তা না করে নিজের বাড়ি পৌঁছে জুতো মশমশিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে ঢাক দিল, গৌড়া, গৌড়েশ্বর।

অবাক গৌড়েশ্বর লুঙ্গির কষি বাঁধতে বাঁধতে বিজনেরই খাট থেকে উঠে এল। সুবেশ সুগন্ধে ভরা বিজনকে দেখে অবাক, দাদা অসময়ে?

আমার বাড়ি, সময় অসময় কী?

হে হে হে ঠিক কথা, আসুন।

বিজনের ভিতর কালিদাস বসু জেগে উঠল, আমার বাড়িতে আমাকে ডাকছ কেন হে, এবার বেরোও তো বাড়ি থেকে।

কী বলছেন?

বলছি, আমি বাড়িতে চাবি দেব।

চাবি দেবেন! গৌড়েশ্বর অবাক, দিন না, চাবি দিন, আমারে সুদ্ধু দিন। তার মানে?

মাথা ঠান্ডা করে বসুন তো দাদা, আমার মনে হচ্ছে আপনারে কেউ শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছে, ডেরেসটা দারুণ হয়েছে।

বিজন জুতো মশমশ করে ছাদে উঠে গেল। তার পিছু পিছু গৌড়েশ্বর। গৌড়েশ্বর বলল, চা খাবেন, বউমারে বলি।

বিজন দেখল কয়েক হাত দূরে কালিদাস বসু। সেই ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখে সুর্মা, গায়ে সুগন্ধ। লোকটা ঘাড় কাত করে বলল, ডাক, তোর জন্য সব সাজ্জানো আছে বিজন।

বিজন বলল, বাড়ি আমি রাখব না, বেচে দেব, আজই বাড়ি খালি করে চলে যা দেখি, অনেক হয়েছে।

দাদা কি ভেবে বলছেন?

না ভেবে বলব কেন?

আমারে তো আগে বলেননি?

তোকে আগে বলতে যাব কেন গৌড়া, বাড়িটা তো আমার।

বিক্রি করবেন ঠিক আছে, আমি খদ্দের দেখে দেব।

বিজন বলল, দালালি?

গৌড়েশ্বর কুঁকড়ে যাচ্ছিল বিজনের এই রূপ দেখে, ছাদের ধারে গিয়ে ডাকল, বউমা ও বউমা চা হলো?

বিজন বলল, লাগবে না।

কেন লাগবে না, বাড়ি করলেন বেচে দেবেন, গৌড়া আছে যখন সব হয়ে যাবে, কোন চিন্তা করবেন না।

দ্যাখ গৌড়েশ্বর চাবির গোছা আগে বের কর দেখি।

গৌড়েশ্বর বলল, তুই তোকারি করছেন কেন?

কী বলব, আমার বাড়িতে ফ্যামিলি ঢুকিয়ে দিচ্ছিস, আমি কিছু বুঝিনে, আমি কালিদাস বসুর নাতি।

গৌড়েশ্বর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। লোকটার খুব মাথা ঠান্ডা। কিছুতেই রাগে না। যা কিছু মান অপমান সব হজম করে নেয়। সময়ে শোধ নেয়। বলল, দাদা একটা চেয়ার আনি, বসে চা খান, বাড়ি তো আপনার, আমি কেডা, অল্পবয়সে নদীতে ভেড়িতে জাল ফেলে বেড়িয়েছি, আমরা মচ্ছোজীবী, জাল ফেলা অভ্যেস, দালানে এইরকম শুয়েছি নাকি, আপনি আমারে যা খুশি বলতি পারেন, আমি শুনে যাব, কিন্তু গৌড়া আপনার ভালোটা দেখবে, বাড়ি যদি সত্যি বেচতি চান, আমারে ভালো করে বলুন, খদ্দের তো ঘুরছে।

গৌড়েশ্বর চেয়ার আনতে নেমে যেতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে লাগল সারা। হাতে চায়ের কাপ প্লেট, বিস্কুট। গুনগুন করছে সে, বেথলেহেমের আস্তাবলে জন্মে নিল কেডা...।

ওই আসছে, কালিদাস বলল।

হুঁ। বিজন গালে হাত দিল।

বাড়ি বেচার কথা বললি কেন, বাড়ি কেন বেচবি?

পরে কথা হবে। বিজন বলল।

সারা উঠে এল, বলল, আঙ্কেল কাকাবাবু, তোমারে আজ কী সোন্দর লাগতেছে!

বিজন বলল, স্বামী ফিরেছে?

বুঝতি পারিনে।

তবে কী করবে?

যেদিক দুচোখ যায় চলে যাব, বলে উঠল মেয়েটা, ওর বাপ-মা শুধু ওরে সাপোর্ট দেয়, বলে বেটা ছেলের এমন হয়, এসব মেনে নিতে হয়, আমি কোনদিন গলায়...। চুপ করে গেল সারা। কথাটা শেষ করতে পারল না। ছাদের ধারে চলে গেল।

বিজন বলল, তবে তোমার শ্বশুর বলছিল এ বাড়িতে শুয়ে তার মতি গতি বদলে গেছে।

সব মিথ্যে, এখন রাত বারোটা একটায় ওদিকে সব ফুরোয়ে আমার কাছে খালি হয়ে ফিরে, পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ঘুরে দাঁড়াল সারা। দুচোখ জলে টলমল করছে।

এসব শুনছিস কেন বিজন, মেয়েছেলেটা ভালো, স্বামী দ্যাখে না, এতো সেই ফুলু বোষ্টমীর মতো, এক কথায় তোর বুকে এসে পড়বে, সব খুলে দেবে। চাপা গলায় তার কানের কাছে ফিসফিস করল কালিদাস। বিজন তার মুখখানি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পাচ্ছে। মুখের চামড়া ঝুলে গেছে। চোখ দুটো হলুদ, কোটরে বসা, মাথার চুল ঝরে গেছে। ইস! কী চেহারাই না হয়েছে। শরীর অত ক্ষয় করলে শরীরের কী দোষ! বিজন বলে উঠল, যা তো যা কালি।

তুই যে তোর ঠাকুদ্দার মতো কথা বলছিস।

বিজন এবার সারাকে দেখল। আঁচলে চোখ মুছছে। কই গৌড়েশ্বর তো চেয়ার নিয়ে আসছে না। বিজন সিঁড়ির দিকে তাকায়। কেউ নেই। লোকটা এমনিই নেমে গেছে। সারা এগিয়ে এল, বলল শউর বাবা এখন আসপে না।

চেয়ার আনবে বলল যে।

না, ঘরে ঢুকে গেল, দ্যাখো কাকাবাবু, লোকটা আমারে টোপ ফেলছে তুমার উপর, তুমি বাড়িতে চাবি দিয়ে যাও, আমার দরকার নেই।

কী বলছ তুমি?

ঠিক বলছি, লোকটা বাড়িটা নেবে, কী করে নেবে শুনবা, তুমি আর যাতে এ ধুলিঅরে আসতি না পারো সে ব্যবস্থা করবে, ওরে তুমি চেন না কাকাবাবু, কিন্তু তুমি এ বাড়ি বিক্রি করো না।

বিজন বলল, কেন করব না?

তুমি থাকলে আমি বাঁচপ কাকাবাবু, ও লোক না হলি আমারে মেরে ফেলতি না পারুক, মেরে তাড়াবে, ওর বেটার মন নেই, কিন্তু আমিও যাব না, আমার বাপের নাম পেদরু হালদার, আমার বাপের বংশ সাগর পার থেকে এয়েছিল এদেশ লুটতি, কিন্তু পারেনি, যে মেয়েছেলেরে লুট করল, তারেই বে করে থেকে গেল মনি নদীর ধারে ভালোবাসায় পড়ে।

বিজনকুমার বসুর চারপাশে যেন সুরেলা সঙ্গীত বয়ে যেতে লাগল। কী বলছে মেয়েটা! কুঁচবরণ কন্যে। কী চুল ওর মাথায়! মেঘবরন কেশ! ছিল নীল নয়ন, গৌড়ার ঘরে এসে তা ধূসর হয়ে গেছে! কিন্তু তেজ তো আছে খুব। ফুঁসছে নাগিনীর মতো। বলছে, তুমারে আমারে জড়ায়ে এমন কেচ্ছা করাবে, এমন রটায়ে দেবে যে তুমিও আর ধূলিঅরে আসবানা, আমিও আর শউরের ভিটেয় থাকতি পারব না, কাকাবাবু বুঝছ।

বুঝছি।

আমি যাই, কিন্তু যদ্দিন আমি এখেনে শউরের ভিটেয় থাকি তুমি এস, তুমারে আমার বাবার মতো মনে হয়, তুমারে আমি ভাবি কাকাবাবু, তুমারে রেঁধি খাওয়াতি ইচ্ছে হয়, সেবা করতি ইচ্ছে হয়, আবার বাবার মতোন তুমার হাতখানা মাথায় চাই, গৌড়া মণ্ডলে বিশ্বাস কোরো না, কাউরি বিশ্বাস কোরো না, তুমি যেমন ভালো, ধূলিঅর তেমন লয়।

দুধকুমার!

ওই ছেঁচড়টা! তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। ওর বউটার জন্যি কী কষ্ট হয়! আজও সক্কালে আমারে জিজ্ঞেস করল তুমি আসবা কবে।

কেন?

কেন তা আমি জানিনে, তুমার কাছে চায় কিছু, দিতি পার, কিন্তু গৌড়া মণ্ডল, আমার শউর শুধু ছিদরো খুঁজছে, যার ভিতর দে কাল সাপ হয়ে ঢুকে লখিন্দরের মতো তুমারে দংশন করবে। আমি যাই ওই তিনি আসতেছে। বলতে বলতে সারা লঘুপায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে ঝপ করে মিলিয়ে যেতে আবার দেখা দিল কালিদাস, তোর সামনে এত সুযোগ কামদেব দুহাত ভরে দেচ্ছে বিজন, তুই কিছু বুঝিসনে?

বিজন লাফ দিয়ে ওঠে, যা বলছি কালি, এ উঠোনে পা দিবি তো তোর ঠ্যাং ভেঙে দেব, কোনদিন পিটানি খেয়ে মরবি।

একেবারে দুগ্গাদাস! আমি যাচ্ছি। পারলে আমিও দেখে নেব, নেব নেব।

তখন ছাদটিতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। আকাশে একে একে ফুটে উঠতে লাগল হাজার হাজার বছরের প্রাচীন তারারা সব, কোটি কোটি বছরের

গ্রহ নক্ষত্র। বিজন নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মহাব্রহ্মাণ্ডের নীচে। এই তার গ্রাম, এই তার পূর্বপুরুষের ভিটে, বাসস্থান। এইখানে তার পিতৃপুরুষ জন্মেছে, পৃথিবী ছেড়ে চলেও গেছে। আকাশের তারা হয়ে সব ফুটেছে গৃহখানির মাথায়। এইখানে কত ভালোবাসা স্নেহমায়ায় তার পিতৃপুরুষ বড় হয়ে উঠেছে, ভালোমানুষ হয়ে নাম রেখে গেছে গ্রামখানিতে। বিজন হাত জোড় করে তাদের নমস্কার করল, বলল আমায় দেখ তোমরা।

দেখছি তো, পাশে আছি, তোর রক্তের ভিতরে মিশে আছি বিজন।

বিজন শুনল অন্ধকারে স্পষ্ট কণ্ঠস্বরগুলি। কলকল করে হেসে উঠল কতজন।

আনন্দে তার দুচোখে জল ভরে এল। বাড়িখানি সে রেখে দেবে, রেখে দেবে।

তখন গৌড়েশ্বর উঠে এল বেতের চেয়ার নিয়ে, বসুন দাদা।

বসব, আগে চাবি তো দেবে গৌড়া।

আপনার চাবি আপনি নেবেন, আপনি কি ভাবছেন আমি বাড়ি দখল করে নেব, আমার সে সাধ্য আছে? নিজে মরছি জ্বালায়।

বিজন বলল, বাড়িটা আমার শুধু নয়, আমার পিতৃপুরুষের, আমার বাপ ঠাকুর্দা, তাদের বাবাদের, মনে থাকে যেন।

খুব মনে থাকবে, খুব। বলতে বলতে উঠে এসে ষাটোর্ধ্ব গৌড়েশ্বর মণ্ডল তাকে ঢিপ করে প্রণাম করল, আপনি ভগবান দাদা, গৌড়া থাকতে আপনার কোনো চিন্তা নেই, গৌড়া আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন, ভাড়াটে বসান, বিক্রি করেন, গৌড়াকে বলবেন শুধু দাদা।

বিজন চেয়ারে বসল পায়ের উপর পা তুলে। এ পৃথিবীতে কিছুই না থাক, এই মুহূর্তটির আয়েশ তো আছে। তার সামনে মাটিতে বসেছে গৌড়েশ্বর। তার দিকে অবাক চোখে চেয়ে আছে। তখন শঙ্খধ্বনি শুরু হলো। দিগ্বিদিক জাগিয়ে অন্ধকারে শাঁখ বেজে উঠতে লাগল ধূলিহরে।

তৃতীয় পর্ব

বিজনের হাতে করা বাড়ি ধূলিহর এখন প্রায় গৌড়েশ্বরের। তার শুধু আছে দলিল, পর্চা, মিউটেশন সার্টিফিকেট আর একখানি ডায়েরিতে ইট, বালি, সিমেন্ট পাথরের হিসেব, কন্ট্রাক্টরের সই করে টাকা নেওয়ার ডকুমেন্ট। কত ডকুমেন্ট। বিজন কালো রেক্সিনে মোড়া বছর চার আগের ডায়েরিটা নাড়াচাড়া করে। তাতে টাকার কত হিসেব! একটা বাড়ি করতে যে কতরকম জিনিস লাগে! আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট—পেরেক থেকে প্যাটন কোম্পানির মস্ত বড় জল ট্যাঙ্ক। পেরেক ইত্যাদি ২০০/-, তার, পলিথিন ৪০০/-, লোহা ইত্যাদি ১৭,৩০৫/- অম্বিকা বিল্ডার ২০,১০০/- এইরকম হিশেব পাতায় পাতায়। টাকা যেন ঢেলে দিয়েছিল সে। কন্ট্রাক্টর সুহাস বড় আনন্দে নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেছিল। যা বলেছে বিজন তাই দিয়েছে। যা বলেনি তাও দিয়েছে বিজন। তখন গৌড়েশ্বর কোমরে হাত দিয়ে দেখেছে। তার সিমেন্টে নিজের বাড়ির নানা কাজও করে নিয়েছে। ভিতরে একটা বাথরুম পর্যন্ত। বিজনের বাড়ির যে টাইলস্ বেঁচে গিয়েছিল তা নিজের নতুন স্নান ঘরে ব্যবহার করেছে। পারলে নিজের বাড়িখানা ভেঙেই করে নিত। ছাদটি ঢালাই করে ফেলত অ্যাসবেস্টস সরিয়ে। অতটা পারেনি তার কারণ বিজন নয়, দুধকুমার। দুধকুমারই তাকে সতর্ক করে দিচ্ছিল। একদিন তো দুধকুমার নেশা করে তার সামনে গৌড়েশ্বরকে বলেই ফেলল, দা'বাবুর সিমেন্ট, ইট দিয়ে আর কতটা কাজ করবে কাকা? আমিও নিয়ে যাই, ছাদটা ঢালাই করে নেই।

বিজন তাকিয়েছিল গৌড়েশ্বরের চোখে চোখে। গৌড়েশ্বর হেসে বলেছিল, কী যে বলে দুধেটা তার ঠিক নেই, সাগর থেকে এক চামচ জল নিলে কি সাগরের কম পড়ে দাদা, এই দুধে যা দেখি এখেন থেকে।

সেই বাড়িতে গৌড়েশ্বর এখন রাজত্ব করে। বিজনের ইংলিশ খাটে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। জেগে উঠে পা নাচায়। বিজন কলকাতা থেকে জগৎপুরে তার ধূলিহর নামের বাড়িটিতে পৌঁছলে গৃহস্বামীর মতো অভ্যর্থনা করে। বিজনের এখন নিজের বাড়িতেই যেতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় পরের বাড়ি। গৌড়েশ্বরের জন্যই বাড়িটা বানিয়েছে সে। অথচ দলিল পর্চা সব তার।

গৌড়েশ্বর প্রায়ই শোনায়, যেদিন বলবেন আর থাকব না, চাবি আপনি রেখে দেবেন, আমি তো পাহারা দিই দাদা, বাড়িটার যদি কিছু হয়, জানালা দরজা খুলে নিয়ে যায় আমার কি কষ্ট হবে না? খালি বাড়ি রেখে দেওয়াও বিপজ্জনক তা জানেন?

কেন, কী হবে?

এই তো তরুণ সঙ্ঘের দাদারা চেয়েছিল এক রাত্তিরের জন্য, কী করবে কে জানে, হয়ত-মেয়েছেলে জুটিয়ে আনবে।

তালা দেওয়া থাকলে?

তালা ভেঙে ঢুকে পড়ে যদি কে বলবে, সব এক একটা মস্তান।

বিজন তখন বলেছে, না আপনি থাকুন।

আমি কি থাকছি দাদা, থাকছেন আপনি, আমি প্রক্সি দিচ্ছি, ওদের বলেছি দাদা আমার ছেলে বউমারে থাকতে দেছে, গেরস্ত বাড়িতে মদ মেয়েছেলে হবে না।

বিজন মুখ অন্ধকার করে সিগারেট ধরায়। গৌড়েশ্বর তার বাড়ি ভোগ করছে। সে কী করবে এ বাড়ি নিয়ে? বছর চার তো হতে যাচ্ছে। কতবার তালা মেরে রেখে দেবে ভেবেছে, কিন্তু হয়নি। তাহলে নাকি বাড়ি চুরি হয়ে যাবে। কী করবে বিজন একা? যদি তালা ভেঙে পাড়ার ক্লাবের দাদারা ঢুকে পড়ে? তারা সব পার্টির লোক। জমি বাড়ির দালালি করে, মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে সল্ট লেক গিয়ে ফুর্তি মেরে আসে, তাদের উপর কথা বলবে কে? এমন একখানি ফাঁকা বাড়ি পেলে কি ছেড়ে দেবে? মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে যাবে না! তখন কি বিজনদা কিছু বলতে পারবেন?

বিজনের মনে হচ্ছিল জগৎপুরের এ বাড়িতে তার আর আসা হবে না। কী করে আসা হবে? কবিতাই তো আসতে চায় না। নগর থেকে কেউ গ্রামে ফেরে? ধূলিহরে ফেরে? বলছে আমরা একবিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমার সন্তানরা পুরোপুরি একবিংশের। এই শতাব্দীতেই বড় হয়ে উঠছে। বেঁচে থাকবে। তাদের কেন আমরা পঞ্চাশ-পঁচাত্তর বছর আগে ফিরিয়ে নিয়ে যাব? গত শতাব্দীতে নিয়ে যাব কেন? এইভাবে পেছন ফিরতে হলে মানুষ তো ডায়নোসরের যুগ পৌঁছে যাবে। মানুষ তার জন্মের আগের পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে, তা কি সম্ভব?

তখন কালিদাস বসু, তার ঠাকুর্দা দুর্গাদাসের ভাই কানের কাছে ফিসফিস করেছে, তোর বউ ভুল বলে নি, কিন্তু তুই তোর সম্পর্কটা তুলে দিবিনে, ধূলিহর তোর থাকবে, তুই পিছনে ফিরলে তোর পূর্বপুরুষ খুশি হবে, সুখী হবে, তোর এটা তর্পণ হলো, আমাদের মুখে জল দেওয়া হলো।

কী বলবে বিজন? কালিদাস বসু কতকাল আগে পূর্ববঙ্গের বাড়িতেই একা একা পচে গেলে মরেছে। যৌন রোগ হয়েছিল নাকি কুষ্ঠ হয়েছিল কে জানে? বিজন আবছা আবছা শুনেছিল বাল্যকালে। তার ঠাকমাবুড়ি অনেক কাল অবধি বেঁচেছিল। ঠাকমারই তো দেওর ছিল কালিদাস। আলাদা ভিটে আলাদা সংসার ছিল বটে, পাশাপাশি থেকেও বাক্যালাপ বন্ধ ছিল কালিদাসের নানা আচরণে। সেই ঠাকমাই না এপারে এসে, আমতলিতে ওই দালানের বারান্দায় বসে কালিদাসের জন্য দুঃখ করতেন। তখন বিজন কত ছোট! ঠাকমার একটি দুটি কথা মনে পড়ে—মরলেও ওর ওই খিদে যাবে না, কী আছে মেয়েমানুষে? এত যে ভোগ করলি তবু ভোগের সাধ গেল না, একা একা পড়ে থাকলি—।

কালিদাস বলে, না যায়নি, যাবে কী করে পতঙ্গের মতো সব আমার আগুনে এসে পুড়ত, আমি কী করব বিজন, আমার কিছু করার ছিল না, আমিও আনন্দ পেতাম, মনে হতো ওসব আমার হকের, জগতে যুবতী মেয়েমানুষের জন্ম হয়েছে আমার আগুনে পুড়ে মরার জন্য।

বিজন বলল, হয়েছে, লজ্জা-ঘেন্না নেই, আমি না তোর নাতি?

নাতি না, তোর ভিতরে দুর্গাদাসের ভূত ঢুকে আছে, আছে বলেই তুই ভয় পাস, তোর ঠাকুর্দা ছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণ, মেয়েমানুষ হলো তার কাছে মা ভগবতী, না আমি ও সব মানিনে।

বিজন ঘরে বসেছিল একা। আজ খুব গম্ভীর হয়ে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে ভাল কথা বলেনি। কেন বলবে? তার প্লাস্টিক পেন্ট করা দেওয়ালে লেখা রয়েছে চাঁদনি আহা চাঁদনি! কে লিখেছে? গৌড়েশ্বরকে জিজ্ঞেস করেছিল বিজন অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে, চাপা গলায় ভর্ৎসনা করেছিল, বাড়িটা তো আমার, লোন শোধ হচ্ছে, এত খরচ করলাম এর পিছনে! কে লিখেছে এসব, নিজের বাড়ি বলে ধরে নিয়েছেন নাকি?

গৌড়েশ্বর মাথা নামিয়ে বলেছিল, কী বলছেন দাদা! এমন বাড়ি কি সাজ্জন্মেও হবে, সাজ্জন্মেও বাস করতে পারব এমন বাড়িতে? আপনি বলুন আমি আমার পোটলাপুটলি নিয়ে ঘরে চলে যাচ্ছি, মাথার উপর অ্যাসবেস্টস হলেও ছাদ তো আছে।

বিজন বলেছে, দেওয়ালে দ্যাখেন নি?

কই, কী?

বিজন দেখিয়ে দিলে হে হে করে হেসেছে গৌড়েশ্বর, বলল, ও নাতিটার কারবার, এ রকম পেলেন পস্কার দেওয়াল, আমি বারণ করে দেব।

আগে ও একবার হয়েছিল, অত উঁচুতে আপনার দশবছরের নাতির হাত যায়?

তা'লে কেডা লিখবে?

তা কী করে জানব, বড় কেউ লিখেছে।

বড় কেডা লিখবে?

বিজন ফুঁসছিল, বলছিল, এটা ভদ্দরলোকের বাড়ি, পাবলিক ইউরিনাল নয়।

আজ্ঞে! কেমন ভ্যাবলা মেরে গিয়েছিল গৌড়েশ্বর। বিজন যে এতটা রেগে যাবে তা বুঝতে পারেনি গৌড়া। বুঝলে কি এ কাণ্ড করত? বিজনের মনে হচ্ছিল লিখেছে গৌড়েশ্বর। শয়তান। শয়তান! তার বাড়িটা ভোগ করছে আবার তাকেই চাপে রাখছে। গৌড়েশ্বর বলেছিল, নাতিই লিখেছে দাদা, চেয়ারে দাঁড়িয়ে লিখেছে।

বিজন বলেছিল, মুছুন।

হবেখন, আমি বারণ করে দেব।

বিজন বলেছিল, গৌড়াবাবু আপনি খুব চালাক ভাবেন নিজেকে, আমি কি একেবারে বুদ্ধু, এ কাজ তোমার করা গৌড়া।

সরাসরি তুমিতে নেমে আসায় গৌড়া যেন একটু কুঁকড়ে গেল প্রথমে, তারপর বলল, আমি কেন করব?

তুমি জানো না?

না দাদা, এটা চাঁদনি নামের একটা সিনেমা, হিন্দি, টিভিতে দেখান হলো মানে আমার বউমা দেখাল, কী সিডি পেলেয়ার না কী এনে, ওই একটা কেনা হয়েছে, গোল চাকতির মতোন।

এটা কে লিখল?

আজ্ঞে নাতিই তো, ওই সিনেমায় ছিল নায়ক স্বপ্নের মধ্যে আকাশে নায়িকার নাম লিখছে, চাঁদনি!

আপনি যত চালাক ভাবেন ততটা নন।

গৌড়েশ্বর আর কথা বাড়ায়নি। পেনসিলে লেখা অক্ষরগুলি রবারে ঘষে ঘষে মুছে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। বিজন গুম হয়ে ঘরে বসে ভাবছিল কী করবে? চাঁদনির খোঁজ নেবে? দুটো পুরুষ নিয়ে সংসার করছে? চলছে সংসার, নাকি? গৌড়েশ্বর বলতে পারে। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করা যাবে না। বিজন ভাবছিল নিজে যাবে। সন্ধে হোক। ফেরার পথে না হয়। এখন ধূলিহরে আসার সময় ব্যাগে একটি টর্চ নিয়ে আসে বিজন। বেলা ছোট হয়ে আসছে তো। পুজো গেছে, এদিকে হিম ঝরতে আরম্ভ করেছে রাত্তিরে। টর্চটা ব্যাগ থেকে বের করে জ্বালিয়ে দেখে নিল। টর্চটা হাতে ধরতেই কেমন যেন শীত করল।

এই বিজন! কানের কাছে ডাক শুনল বিজন।

আবার এলে?

আমি তো আছি ধুরোলে, এসেছিস তো তুই, কালিদাস বলছে, মাথা গরম করলে হবে, জীবনটাকে ভোগ করতে হবে না।

বিজন ভাবছিল কী করবে এ বাড়ি নিয়ে? কবিতার ইচ্ছেই নেই। শহর থেকে গাঁয়ে আসবেই বা কেন? আর এ জায়গার যে ডেভলপমেন্ট হবে সে সম্ভবনাও দেখছে না বিজন। এতদিনেও তো হয়নি কিছু। সেই ভাঙা রাস্তা, ভাঙাই রয়েছে। পুরসভার সংযোজিত এলাকা বটে, তাতে কোনো লাভ হয়নি। পুর এলাকার সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত। তবে হতেও পারে। একদিন, হয়ত পঞ্চাশ বছর বাদে এ জায়গা শহর হয়ে উঠবে। পঞ্চাশ একশো বছর বাদে কি সব গ্রামই শহর হয়ে যাবে? বিজন ঠিক বুঝতে পারে না কী হবে? ধূলিহর শহর হয়ে গেলে কালিদাস বসু যাবে কোথায়? দেশভাগ দাঙ্গা কিছুই তাকে দমাতে পারেনি। একা একা গলে পচে মরেছিল তবু ধূলিহর ছাড়েনি। ওই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে নতুন করে অন্য জায়গায় গিয়ে জীবন আরম্ভ অসম্ভব ছিল। আর কালিদাসের যে জীবন সে জীবন ও এপারে এসে শেষ হয়ে যেত। জীবনের স্বাদই নষ্ট হয়ে যেত।

বিজন চাপা গলায় ডাক দিল, ঠাকুর্দা?

শুনল, কী বলছিস?

একা একা পড়ে থাকলে!

থাকলাম।

মেজ-ঠাকমা?

সেও চলে এয়েছিল, আমারে ছাড়তি পারলি বাঁচে।

তাঁরে আমি দেখেছি চোখ মুছতে, মছলন্দপুরে থাকতেন না?

হুঁ, তাই শুনিছি।

তুমি এপারে আসনি?

না ধুরোল ছাড়ব কেন?

একা একা?

বাগদিদের একটা বউ হাত পা টিপত, একটা মুসলমান বউ রাতে থাকত, ভালই তো ছিলাম।

বিজন শুনেছে এসব কথা কি? বোধহয় না। আবার হ্যাঁও হতে পারে। কালিদাস বলছে, লোকেরটা মেরে জমিজমা কম করিনি, আবার তা দখলও করে নিচ্ছিল অন্য লোকে, আমার খাসের জমি ছিল, বাগদি বউ-এর ভাতার আর মুসলমান বউ-এর ভাতার দেখাশুনো করত, আমি তো একা।

ঠাকুর্দা! তিনি চোখ মুছতেন।

আমি কী করব, ঠাকুর আমারে যেভাবে তৈরি করেছেন তার বাইরে যাব কী করে?

ঠাকুরের নাম নিচ্ছ?

ঠাকুর ছাড়া দেহটা কে দিয়েছিল রে, আমি কে?

তুমি কালিদাস।

কালিদাস তো দেহের দাস, শরীর যা চায় তাই তো হবে, বিজন জীবন একটা, যা দুধকুমারের ঘরে যা, বউটারে তো আশা দিয়ে চুপ মেরে গেছিস।

বিজন বুঝতে পারছিল না কী করবে? তালা লাগিয়ে দুধকুমারের ঘরে যাবে? অন্ধকার তো হয়ে এল। কিন্তু তালা কোথায়? একটাও নেই। সব গৌড়েশ্বরের হেফাজতে। বিজন ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে উঠে গেল। ওই দেখা যায় দুধকুমারের ঘর। ছ'মাস হয়নি, সেই যে দুপুরে গেল। বিজনের ভিতরটা গরগর করে উঠল অনেকদিন বাদে। সে বিড়বিড় করল, কী করি?

অন্ধকার হচ্ছে, টর্চ জ্বালিয়ে চলে যা, আমি যেতাম।

সেদিন আর নেই ঠাকুদ্দা।

আছে, সব আছে, দেই আছে, দেহের টান আছে নাতি, আমি যখন রোগে মরি, তখন আমারে চোখের দেখা শুধু দেখতি আসত তারা, দেখে চোখের জল ফেলত।

কাদের কথা বলছ?

যাদের ভোগ করেছি যৈবনকালে, যাদের ভোগ করেছি বুড়ো হয়েও, মাও এয়েচে, মেয়েও এয়েচে, এসে চোখের জল ফেলেছে উঠোনে বসে, বাবু কী ছেল কী হলো, বাবু আবার ভাল হয়ে ওঠো।

রোগে তো ওইজন্যে পড়েছিলে।

ধুস! রোগ না হলি মরণ হবে কী করে, মরণের জন্যি যমদূত চাই, রোগে হলো যমদূত।

বিজন বলল, গৌড়েশ্বরকে সরাই কী করে?

দাপট দেখা, কেন ঢুকতে দিলি?

ভুল হয়েছে ঠাকুদ্দা!

ভুল হয়নি, তোর ঠাকুদ্দা দুগ্নাদাস এই করত, ও ছেল এমনি ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরু, কত জমি যে বেহাত হয়েছে ওই জন্যি, দয়ামায়া ছেল নাকি ওর ভিতরে; তোরও হয়েছে সেই হাল, জমি আর মেয়েমানুষ দখলে রাখতে হয়, কোনো রকমেই ছাড়তি নেই, মেয়েমানুষ যদিও ছাড়িস, জমি বাড়ি কি দিতে হয়? তোদের আমতলির বাড়ি গেছে, এটাও যাবে।

তাহলে কী করি?

রাখনি এনে বসা, চাঁদনিরে রাখ।

অন্ধকার হয়ে এল। বিজন বসু নেমে এল ছাদ থেকে। নেমে দ্যাখে গৌড়েশ্বর বসে আছে ঘরে, বলল, দাদা যাচ্ছেন?

হ্যাঁ যাব, কিন্তু ঘরটা আপনি নষ্ট করলে আমি অন্য কিছু ভাবব।

না না দাদা, আমি নাতিটারে খুব দাবড়ে দিয়েছি, কানছে ঘরে বসে।

দরকারে আমি তালা মেরে রেখে যাব।

আপনার বাড়ি, তবে সে তালা কেউ ভাঙলে দেখবে কে?

বিজন বলল, যাই।

বেরিয়ে এল বিজন নিজের বাড়ি থেকে পরের বাড়ির লোকের মতো। হাঁটতে লাগল অন্ধকারে। টর্চ জ্বলতে লাগল যখন মাঠে পা দিল সেই সময়। মাঠে পা দেওয়ার কথা নয়। রাস্তা ধরে বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার কথা ছিল তো। তাকে যেন ভুলোয় ধরল। তার পায়ে পামশু, ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি, গা দিয়ে ভুরভুর করছে আতরের গন্ধ, চুলে কলপ—বিজন হাঁটছে কালিদাস বসু হয়ে। তার সেই ভোগী পিতৃপুরুষের ছায়া তাকে আবৃত করেছে এই অন্ধকারে।

কালিদাস বলল, এই বার দেখুক তোর আপন ঠাকুদ্দা দুর্গাদাস, ওরে এমন ভোগী শরীর বানায় ভগবান, তুই কী করবি বিজন?

বিজন হাঁটছিল। মনে পড়ে যাচ্ছিল বেকার তাড়িখোর দুধকুমারের বউটির কথা। সে বসে আছে ঠিক তার জন্য। এতদিন বাদে এলে দাদা! তোমার বাড়িটায় আমারে থাকতে দেবে বলেছিলে। এ ঘরে জল পড়ে, হিম নামে, দুপুরে রোদও আসে, ক'জায়গায় টালি ভেঙে গেছে, ও লাগায় না।

বিজন হাঁটছিল। সঙ্গে কালিদাস বসু। গুনগুন করে গান গাইছিল কালিদাস। এবার ম'লে সুতো হবো/তাঁতির বাড়ি চলে যাব/পাছা পেড়ে শাড়ি হয়ে......। বিজন গলা মেলাল কালিদাসের অন্ধকারের সঙ্গে।

দুই

অন্ধকারে টেমি জ্বালিয়ে বারান্দা বলি হাতনে বলি সেখানে দুটি মানুষ বসেছিল। বিজন সরাসরি টর্চের আলো ফেলল সেখানে। ডাক দিল, দুধকুমার!

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চাঁদনি, দাদাবাবু! আরে তোমরা ওঠো না, দাদাবাবু এয়েচে।

ওরা কারা?

ওই তিনি আর তেনার স্যাঙাৎ।

ভগবান?

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা উঠে পড়ে ছোট মতো পেনসিল টর্চ জ্বালিয়ে নেমে এল হাতনে থেকে, বড়বাবু নমস্কার, পন্নাম, আমি ভগবান।

পা জোড়া লেগেছে তোমার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার একটা সাইকেল দরকার। বলে শীর্ণকায় লোকটি টলতে লাগল, আপনার কথা কত শুনেছি, দুধে আর চাঁদনি বলেচে আপনি এলেই হয়ে যাবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে যাবে, খুব হয়ে যাবে। বলতে বলতে পাহাড়ের মতো পুরুষ দুধকুমার নেমে এল। হেরিকেন জ্বালিয়ে দিয়েছে চাঁদনি হাতনেতে। দুধকুমারকে দেখে বিজনের লজ্জা লাগে। কী দেহ! এই দেহের কাছে তার দেহ কী? এ তো ভীমচন্দ্র বটে। ভীমসেন। সে হলো—! না মহাভারতের কোনো জুৎসই চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারল না বিজন। দুধকুমার অনেকটা গিলেছে। বলেছে, হাঁ ওর একটা সাইকেল চাই, সাইকিলিয়া সাইকেল লিয়ে যাবে বলছে।

বিজন বলল, সাইকেল কে দেবে?

দুধকুমার বলল, তুমি ছাড়া কেডা দেবে বলো, আমরা তো তুমার জন্য বসে ছিলাম দা'বাবু, চাঁদনি বলল তুমি এলে ব্যবস্থা হবে।

বিজন দাঁড়িয়ে ছিল। দুধকুমারের বউ ভাঙা চেয়ারটি নিচে নামিয়ে দিল, বস দাদাবাবু, বসে থির হও, কত সময় এয়েচো, এতক্ষণে এলে!

হুঁ। বিজন দেখছিল যতদূর দেখা যায় অপরূপ এক অন্ধকার ভেসে আছে। দখিন পশ্চিমে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের আলো। বিজন বলল, তোমাদের আলো কী হলো, ইলেকট্রিক।

বিল দিইনি, কবে কেটে দেছে! দুধকুমার হাসল।

চাঁদনি বলল, তুমি ভগবানের ব্যবস্থা করো দাদাবাবু, পায়ে জোর হয়েচে, ওর সাইকেলখানা চুরি গেছে, ও বায়াত্তর ঘণ্টা সাইকেল চালাবে তো, সাইকেল নেই।

বিজন বিরক্ত হলো। আসলে সে নয়। তার পূর্বপুরুষ কালিদাস বোস যে কিনা তাকে সঙ্গে করে এখানে এনে ফেলল, সেই লোক তার রক্তের ভিতরে বসে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। ধুস মাগী, দুটো পুরুষকে বসিয়ে মদ গিলিয়ে মাঠে ছেড়ে দিতে পারলি নে। আমি কত সময় বসে থাকব?

আশ্চর্য! চাঁদনি বলল, তুমরা একটু হাওয়া খেয়ে এস, দাদাবাবু কী খাবে, চপ কাটলেট আনাব?

বিজন না বলতে চাঁদনি নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, তাহলি তুমরা দুই স্যাঙাতে

হাওয়া লাগাও গায়ে, নেশা কমুক, দাদাবাবু মাতাল সহ্য করে না।

শুনেই ভগবান বলল, আমার সাইকেল?

হবে, এখনই কি কিনতে যাবা?

ভগবান বলল, আমি এখেনে বসি।

না ওদিকি যাও।

কালিদাস বোস বিজনের গলায় বলল, হ্যাঁ যাও।

যেতি পারি, কিন্তু সাইকেল?

হবে হবে, আর দেরি করিস নে। বলতে বলতে দুধকুমার এক হ্যাঁচকা টান মারল ভগবান মণ্ডল সাইকিলিয়াকে, চ, দা'বাবু একটু বিশ্রাম নিক, উনি আমাদের সব, ওনারেও ভগবান বলা যায়।

ভগবান বলল, সাইকেল আমার চাই চাঁদনি, না পেলে আমি এ বাড়ি থেকে নড়ছি নি, ভোজেরহাট যাব নি।

হয়েছে হয়েছে, যাও দেখি। চাঁদনি ধমকে উঠল।

ওরা অবশেষে গেল। ভগবান বড় অনিচ্ছায় গেল। দুধকুমার না থাকলে যেতই না বোঝা যায়। চলে যেতেই বিজন জিজ্ঞেস করল, ভগবানটা হাসপাতালে ছিল তো?

সেরে গেলে আর রাখবে কেন?

এ বাড়ি এল কেন?

সাইকেলটা গেল যে।

কোথায় গেল?

ও তুমার দুধকুমার বেচে দিয়েছে।

তাহলে ও এখানে থাকবে?

না থাকতি, পারবে না, ওর খুব সাইকেলের নেশা, বায়াত্তর ঘণ্টা, ছিয়ানব্বুই ঘণ্টাও চালাতে পারে সাইকেল, সাইকেলে তখন সব।

ওর সঙ্গে তুই জড়ালি কেন চাঁদনি?

চাঁদনি বলল, তোমার দুধকুমার বড় ক্ষ্যায়মুষুলে মানুষ, শুধু বেচে খাবে, এ ভিটের দলিল পর্চা আমি সরিয়ে দিয়েছি, না হলে এও বেচে খেত, ওর হাত থেকে বাঁচতি ভগবানের সঙ্গে—

ভগবান আর দুধকুমারের গলার স্বর আর শোনা যাচ্ছে না। অন্ধকারে পায়ের কাছে বসেছে চাঁদনি। তার পায়ে হাত বুলোচ্ছে। বিজনের চোখ বুজে এসেছে। এই না হলে মনুষ্যজীবন! কানে কানে শোনাল কালিদাস, বলল, এখন অবধি ঠিক আছে সব, হবে তোর।

বিজন বলল, ও চাঁদনি।

হাঁ দাদাবাবু।

ও চাঁদনি রাতি।

বলো দাদাবাবু! গলা যেন ডুবে গেল অন্ধকারে। গলার স্বরে কী আপন ভাব। চাঁদনির হাত তার উরু অবধি উঠে এসে ধীরে ধীরে সরছে। চাপা গলায় বলছে, ঘরে যাবার সময় হলে বোলো দাদাবাবু।

বিজনের সুখ হচ্ছে। চাঁদনি তার কোলে মুখ ঘষছে, চাপা গলায় বলছে, ভাল লাগছে তুমার?

হ্যাঁ, কিন্তু ওরা?

ওরা আসবে না।

ওই ভগবান?

হারামিটাকে দুধকুমার আটকে রাখবে।

বিজন বলল, তুই আমার ভিতরে কী দেখলি চাঁদনি?

চাঁদনি উঠে দাঁড়িয়ে তার পিছনে গিয়ে দুই স্তন বিজনের কাঁধে ছুঁইয়ে গালে চুমু দিল, বলল, চলো ভিতরে চলো বিজন, আমি আর পারছি নে।

বিজন বলল, তোর দুধকুমার তো কত বড় পুরুষ।

ফাঁপা সব, চলো তাড়াতাড়ি ওঠো। বলতে বলতে তার সামনে এসে তাকে টানতে থাকে চাঁদনি, এসো উঠে এসো।

কালিদাস কানে কানে বলল, যা, তাড়াতাড়ি যা।

বিজন ওঠে না। চাঁদনি তখন বিজনের কোলে বসে বলল, আমারে আদর করো, কতদিন তোমার আদর পাইনি দাদাবাবু।

বিজন মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, আমারে তুই এমন করিস কেন, কী দেখলি বল, আমি ওইটে আগে শুনি।

চাঁদনি চাপা গলায় বলল, ভিতরে চলো, তখন বলব।

বিজনকে নিয়ে সে যাবেই। তখন বিজন বলল, কেন এই মাঠের ভিতরে, কেউ তো নেই, কেমন অন্ধকার।

বাস ছড়াবে।

কিসের বাস?

ওইটে যখন হবে, আমি নদী হয়ে গেছি বিজন, আর পারছি নে, এসো দাদাবাবু, মাঠে হলি দু'জনের মিলনের গন্ধ বাতাসে ভেসে যাবে।

যায় যাবে।

ওই ভগবানটা টের পাবে, দেখছ না বেটা আবার ফিরে এসেছে আমারে জ্বালাতে, ওর জমি আছে, ভিটে আছে, সব ফেলে এখেনে, স্যাঙাৎরে টাকা দিয়ে বশ করেছে, আই, তুমি আমারে শুকিয়ে দেবে যে।

বিজন বুঝতে পারছিল নাগিনীর গা থেকে মিলনের সুবাস বেরোতে আরম্ভ করেছে। কাঁঠালি চাঁপা ফুলের গন্ধ যেন তার ভিতরে। আঁচল ফেলে দিয়েছে চাঁদনি। ভিতরে ব্লাউজ ছিল না। দুই স্তন অন্ধকারে দুটি তারার মতো ভেসে ওঠে। বিজন উঠল। তার ভিতরে গর গর করে উঠেছে কালিদাস, চাপা গলায় বলছে, মাগী সব নিয়ে ডাকছে, তুই কি পাগল!

পাগল তো নিশ্চয়। বিজন বলল, চুপ করে বস চাঁদনি, সব হবে, আমি আগে সব জানি ।

কী আর জানবা তুমি, জেনে জেনে ও জানার শেষ নেই তুমার, তুমাদের এইটে অসুবিধে দাদা। বলতে বলতে গায়ে আঁচল তুলে মাঠের ভিতরে গুটি গুটি মেরে বসে থাকে দুধকুমারের বউ, বিড়বিড় করে, ভেসে গেলাম আমি তবু তুমার জিজ্ঞেস করা থামে না, এখন শুকোচ্ছি।

বিজন বলল, আমার ভিতরে তুই কী দেখিস!

তুমার ভিতরে তো না। তীক্ষ্ণ গলায় উত্তর দিল চাঁদনি, তুমার ওটা কি মরে গেল এ ক'দিনে, তুমি তো এমন ছিলে না বাবু।

বিজন বলল, পরিষ্কার করে বল, তারপর যা হয় হবে।

আমি বুঝেছি,ওই ভগবান হারামি, শুয়োরের বাচ্চাটা গুণ করছে তুমারে, তুমি জ্যান্ত পুরুষই হলে না।

আহ্! যা বলছি বল।

কী বলব আমি, তুমি এখেনে বসে থাক, না হয় যাও, আমি ঘরে যাই।

কী দেখেছিস আমার ভিতরে?

ওটা কি জানতেই হবে?

হবে।

ওটা জানোনি বলে তুমি এমন হয়ে থাকলে?

তুই বল।

আমার দুধকুমার তো আমারে পায় না, তার উপরে আমার মন হয় না কেন জানি নে, কিন্তু যদি আমি এমন ভাবে ডাকতাম, সে আমারে এ ফোঁড় ওফোঁড় করে দিত, আর কী মুখ তার, যত খারাপ কথার বান ডাকাত, তখন, কী সুখের কথা সব! কিন্তু আমি যে কেন পারি নে তারে ডাকতি।

বিজন বলল, বলবিনে যখন উঠি আমি, আর আসব না।

আসবা না?

না, এই গেলাম।

তুমার বাড়িতে?

আমার বাড়িতে আমি আসব তাতে তোর কী?

চাঁদনি উঠে এল। তার সামনে দাঁড়াল। তার চোখের মণির ওপর তারার আলো পড়ল। জ্বলতে লাগল। বলল, তুমার ভিতরে তুমার দালানকোঠারে পাই বিজন।

কী বলছিস?

হাঁ গো, আগে বলিনি তুমারে? আমি কতদিন তুমার দালানের দেয়ালে গা ঘষে এয়েচি, তখন মনে হয় তুমি দাঁড়ায়ে।

ভাল করে বল।

কত ভাল করে বলব, তুমি বুঝে নাও।

বুঝতে পারছি নে।

পারতি হবে, সব বুঝাতি হয় না বাবু, তুমারে দেখলি তুমার ওই কোঠা বাড়ি মনে হয়, কী শক্ত পোক্ত তার দেহখানি, কী ভাবে একটার পর ইট বসায়ে বিলিতি মাটি বালি মশলা দিয়ে গাঁথা হলো তা কি আমি জানিনে, অমন একখানা পুরুষমানুষ কেডা না চায়, আমার খুব লোভ!

কিসের লোভ?

ওই দালান কোঠার উপরে, ওর ভিতরে আমি একা থাকব, শুধু তুমি এলে ঢুকতি দেব, তুমি তো ওর মনুষ্যরূপ।

শিহরিত হলো বিজন। কাঁপছিল যেন। তার শিথিল হয়ে আসা অঙ্গ গরগর করে জেগে উঠল। সে চাপা গলায় বলল, আবার বল।

বলছি তো তুমি হলো ওই কোঠাবাড়ির মনুষ্যরূপ, পুরুষ রূপ, এমন একখানি পুরুষমানুষ পেলে সব মেয়েমানুষ বর্তে যায়।

আর ওই কোঠাবাড়ি?

ওই কোঠাবাড়ি হলো তুমার অন্য রূপ, তুমি না এলে ওরে আমি আদর করি, অন্ধকারে গে চুমা দিই, অন্ধকারে গে বুক চেপে ধরি ওর প্লাস্টার মারা দেওয়ালে, যখন ও বাড়ি উঠত একটু একটু করে আমি অবাক হয়ে শুনতাম, মনে হতো বিশ্বকর্মা ভগবান পুরুষ গড়ছে, বুঝেছ তুমি বাবু?

বিজন বলল, তুই একটা পাগলি!

পাগলি তো পাগলি, ও বাড়িই আমারে এক এক সময় নদী করে দেয় তা কি তুমি জান কত্তা, তুমি বাড়িখানা আমার হাতে দাও, আমার বড্ড ইচ্ছে করে ওরে সেবা করি, ঘর মুছি, জানালা পরিষ্কার করি, ওরে একা একা চুমা দিই, ওর সারা অঙ্গ জিভ দিয়ে—ওফ্! আমি আর পারছি নে, তুমি কেন এসব বলতে বললে, আমি আবার—নাও আমারে বিজন। এসো দাদাবাবু, নাও আমারে। বলতে বলতে দুহাতে বিজনকে জাপ্টে ধরেছে চাঁদনি। ঘুরে গিয়ে পড়েছে মাঠের ভিতর, সমস্ত শরীর ছেড়ে দিয়ে চাপা গলায় বলছে, আমাদের

ভিটে কাদার গাঁথনি, চুরি করা ইঁট কাঠ, মাথায় টালি, ঝড়ে বিস্টিতে মাথা ফাঁকা হয়ে যায়, তুমার দালান কেমন আশরয় দেয়, পুরুষমানুষের বড় একখানা বুক মেয়েমানুষের দরকার হয় বিজন, এসো।

কালীদাস বোস বলে, এটা কী হলো?

কী হলো? বিজন জিজ্ঞেস করে।

এ যা বলে তার সঙ্গে আমার মেলে না, গরিবের ঘরের ডাঁটো মেয়েছেলে, টাকা গুঁজে দে হাতে আর কম্মো সেরে হাঁটা দে। এসব কথা কেন, এসব হলি বিপদ, তুই কি এই মেয়েছেলেকে ওই দালানে তুলবি।

চাঁদনি বলে, হ্যাঁ আমি উঠব।

বললিই হলো, পয়সা দেব, ভোগ করব, দালানে চোখ কেন?

চাঁদনি বলল, দালানে শুতি পেলি হয়ে যাবে কত্তামশায়, আমি যে চোখের সামনে দেখিছি সব।

বিজন বলল, কত্তামশায় আমি?

হ্যাঁ, তুমি আমার কত্তা হলে, তুমার দালানও আমার কত্তা।

বিজন আর পারে না, সমূলে বিদ্ধ করতে করতে বলে, আবার কথাগুলো শোনা?

তুমি আমার কোঠাবাড়ি।

আবার বল।

কোঠাবাড়ি আমার বিজন বোস।

ভাল করে বল।

আহ্! এমন করে পারে না আমার সোয়ামি, ওরে কেউ বিলিতি মাটি দে গাঁথেনি, অমন রং অমন পাথর অমন মোজেক দিয়ে সাজায় নি, ওরে কেউ পাকা ছাদ দেয় নি। অমন সেগুন কাঠের জানালা, অমন বিজলি আলোর ফোয়ারা দেয় নি বিজন কত্তা, ওর মাটির গাঁথনি, আধপোড়া ইটের কাঠামো, দেখতি এত্তখানি বটে, এফোঁড় ওফোঁড় করে অমন একখানা মস্ত শরীর চেপে, তারপরে আর পারে না।

আবার বল।

আহ্, বিজন কত্তা, তুমার ভিতরে কোঠাবাড়ির জোশ আছে, আহ্! মাগো, তুমি আগের দিনও এমন পারনি।

কী বলছিলি বল।

তুমি একখানা কোঠাবাড়ি, কোঠাবাড়ির মতো শক্ত সিমিনট গাঁথা।

আবার বল।

তুমি যেন বিলিতি মাটি সিমিনট ঢালাই করা পুরুষমানুষ, তুমি ভাঙবা না

কোনোদিন, আহ্ ভগবান! এমন কেডা পারে? আমারে ওই দালানে আজই রেখে দাও কত্তা, ওখেনে শুয়ে আমি তুমার বীজ পেটে পালন করি।

কী বলিস!

তাই হবে কত্তা।

কী সব্বোনাশ! তাহলে চলবে না।

চলবে, আজই কোঠাবাড়িতে রেখে যাও, আমি তুমার জন্য সেজে গুজে ঠোঁট রাঙা করে—আহ্, কত্তা, তুমি এমন করে পার কত্তা—ঠোঁট রাঙা করে বসে থাকব কত্তা, ও দুই বেটা দোরের দুদিকে বসে ঝিমোবে, তারা পাহারা দেবে দালানখানি, বুঝলে কত্তা, যে মেয়েমানুষ তুমারে সব দিল, তুমি তারে কিছু দাও, কোঠাবাড়িটা দাও।

বুঝেছে বিজন। তার কানের কাছে অবিরল ফুসফাস করে যাচ্ছিল কালিদাস বোস। সেই তাকে বিচ্ছিন্ন করল চাঁদনির শরীর থেকে, টেনে তুলে বলল, জামা কাপড় ঝেড়ে বাড়ি যা, এখেনে আর থাকিস নে।

কেন, এমন ভালবাসে আমারে।

তোর দালানে ওর লোভ! গরিবের বড় লোভ, গরিব মেয়েমানুষকে কব্জা করা সোজা, কিন্তু সেও ছাড়ে না, সব নিয়ে নিতে চায়, মেয়েছেলের অভাব, বল না ক'টা তোর চাই, গৌড়া হাজির করে দেবে, এ মাগী তোর সব্বোনাশ করে দেবে, বাড়ি নিয়ে নেবে।

চাঁদনি পড়েছিল মাটিতে। তার গায়ের কাপড় টেনেটুনে দিল বিজন। চাঁদনি সুখে ঘুমোচ্ছিল। বিজন এবার জুতো মশমশিয়ে পালাবে। হনহন করে হাঁটতে লাগল। এতদিনে ধরা গেল কেন তার কাছে সব কিছু মেলে ধরেছে দুধকুমারের বউ! বিজন টের পাচ্ছিল তার কোঠাবাড়ি নিয়ে সে বিপদের ভিতরে ঢুকে পড়ছে।

তিন

বিজন পরের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কবিতাকে বলল, আমরা কি সত্যি জগৎপুর ধূলিহর যাব না, এত খরচ করে বাড়িটা করলাম।

কবিতা বলল, হঠাৎ একথা?

কতদিন কেটে গেল, যাওয়া তো হল না।

নিজেদের বাড়ি, গেলেই হলো।

বিজন ক্ষুব্ধ হলো। গেলেই হলো মানে? আছে বলে ফেলে রাখতে হবে এইভাবে? না থাকলে কী হতো? সেই কবে তিনদিন কাটিয়েছিল গৃহ প্রবেশের

সময় তারপর আর এক রাত্রিও কাটাতে যায়নি। কবিতা এমনিও যায়নি। কোনো কৌতূহলই নেই যেন। বিজন বলল, আমতলির বাড়ির মতো হয়ে যাবে।

কেন, কাউকে কি পাকাপাকি থাকতে দিচ্ছ?

গৌড়েশ্বর, সে তো নড়ছে না।

তুলে দাও।

বিজন বলল, আমরা যাচ্ছি না, সবাই ভাবছে বেওয়ারিশ বাড়ি।

ভাবলেই হলো।

বিজন বলল, সবাই থাকতে চাইছে।

আর কারা?

কেন গৌড়েশ্বরের ছেলে বউ, দুধকুমার তার ওর বউ, বাড়ি যদি দখল হয়ে যায়, তখন?

কবিতা বলল, এখনো কি ও জায়গা বসবাসের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে? আমরা যদি না যাই কী করে হবে?

হলে তো আমরা যাব।

বিজন বলল, ও বাড়ি রাখব না।

রাখবে না মানে?

রেখে কী হবে, আমাকে শুধু ডিউটি করতে হয়, নিজের বাড়ি যদি অন্য লোকে ভোগ করে দেখতে ভাল লাগে?

তালা মেরে রাখতে হবে, লোকের কি এমনি বাড়ি থাকে না?

কী করে থাকে?

বাহ্, কত লোক বাড়ি করে রেখে দেয়, শান্তিনিকেতনেই কত বাড়ি এমনি পড়ে আছে, ন'মাসে ছ'মাসে মালিকরা যায়, সেই সব বাড়ি কি দখল হয়ে যাচ্ছে?

শান্তিনিকেতন আর জগৎপুর এক হলো?

এক কেন হবে, বাড়ি কি পড়ে থাকে না, এক সময় মধুপুর, শিমুলতলা—এই সব জায়গায় বাঙালিরা বাড়ি করে রেখে দিত, বছরে একবার যেত, সেই সব বাড়ি এখনো আছে।

আমরা তো জগৎপুরে বছরে এক রাত্তিরও কাটাই না।

কাটাব, যাব, যাওয়ার মতো অবস্থা হোক।

বিজন বুঝতে পারে না কবিতাকে। একসময় কবিতাই বলেছিল বাড়ি বিক্রি করে দিতে। এখন ওর মত বদলেছে। সম্পত্তি তো! আছে তো! যেতেও চায় না? পছন্দ হয়নি? পছন্দ হয়নি তো বলে দিতে পারে। সে কথাও বলবে না। তাদের তো নিজস্ব বাড়িঘর ফ্ল্যাট কিছুই নেই। এত বড় পৃথিবীর এক কণা মাটি,

এক কণা শূন্যতার অধিকারীও তারা নয়। যেটুকু পেয়েছে তা যদি এমন অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখে, আর কি আসবে একটুও? বিজন জিজ্ঞেস করে, তুমি তো দেখতেও যাও না, ও বাড়ির সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই?

কবিতা হেসে ফেলে, থাকবে না কেন?

যাওয়ার কথা বলো না তো।

তুমি তো যাও।

আমি গেলে তোমার যাওয়া হয়?

হয়, এখন তো ওখানে সংসার পাততে পারছি না, গেলে যে বাড়িটা টেনে ধরবে আমাকে।

বিজন অবাক হয়ে কবিতাকে দ্যাখে। গভীর করে নিঃশ্বাস ফেলছে সে নিজের বুকের উপর। বলছে, ও জায়গা ডেভলপ করুক, বাস বা অটো রিকশা হোক, আরো কিছু লোক যাক, তখন আমরা যাব।

সে কবে হবে কে জানে?

হবে, কোনো কিছু বসে থাকে?

তখন বিজন বলে, আমার যে মনে হয় পঞ্চাশ বছর আগের পৃথিবী থেকে কোদালে কেটে ও জায়গা আলাদা করে রেখে দিয়েছে কেউ, ও জায়গা বদলাবে না।

ইস! তাই কি হয়? কবিতা সোফায় বিজনের পাশে এসে বসে, বিজনের পিঠে হাত রাখে নিবিড় মমতায়, বলে, ভাবছ কেন, পরিবর্তন কি চোখে দেখা যায় সব সময়, ভিতরে ভিতরে হয়।

বিজন বলল, ভিতরে হলে বাইরে তার ছাপ পড়ে।

কোথাও পড়ে কোথাও পড়ে না।

তুমি কী করে টের পাবে জগৎপুর বদলাচ্ছে?

কবিতা বলল, এই যে তুমি কলকাতা থেকে গিয়ে তোমার পূর্ববঙ্গের সেই ফেলে আসা গ্রামের নামে বাড়ি করেছ ধূলিহর, এতেই টের পেয়েছি জায়গাটা বদলাচ্ছে।

বিজন উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। এদিকটায় অনেকটা মাঠ, পুরনো কলকাতার একটুখানি এই অঞ্চলে বহুদিন টিকে ছিল টালাপার্ক আর তার সবুজের জন্য। সেই পার্ক এখন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কোথাও মিটিং, কোথাও পুলিশ ট্রেনিঙের লেফট রাইট লেফট রাইট। তবে সন্ধ্যার পর পঞ্চাশ বছর আগের অন্ধকার নেমে আসে মাঠ যদি মিটিং-মুক্ত থাকে। সেই অন্ধকারে তাকিয়ে বিজন বলল, বাড়িটা আমাকে উদ্বেগে রেখেছে, ও বাড়ি নিয়ে আমরা কী করব?

কবিতা ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে বলল, আমরা গিয়ে সংসার পাতব ওখানে নতুন করে।

সে কবে হবে?

হবে, একদিন হবে।

বিজন বলল, আমাদের ভাগ্যে বাড়ি নেই, ও বাড়ি চলে যাবে আমাদের আমতলির বাড়ির মতো, সেখানে সন্তোষ চক্রবর্তী, এখানে গৌড়েশ্বর।

কবিতা বলল, গৌড়েশ্বরকে বেরোতে বলেছিলে পরিষ্কার করে?

হ্যাঁ, বলছে যেদিন আমরা যাব, ওর দায়িত্ব শেষ।

দায়িত্ব নিতে কে বলেছে?

বিজন বলল, ও বলছে ও তো শুধু রাত্তিরে শোয়, না শোয়ার কথা বললে শোবে না, কিন্তু তাতে যদি দরজা জানালা অটুট না থাকে ও কী করবে তখন? বাড়িটা ওর চোখের সামনে উঠেছে, ও কি সহ্য করতে পারবে তা?

কবিতা বলল, কতবার বলেছি তুমি চাবিটা নিয়ে এসো ওকে বের করে দিয়ে।

যদি কিছু হয়?

যদি কিছু হয় থানায় যাব।

থানা কী করবে?

কবিতা বলল, কিছু যদি হয়, সেটা গৌড়েশ্বর করবে, করাবে।

তাহলে বাড়িটা নিয়ে আমরা কী করি?

কবিতা চুপ করে থাকল। বিজন ভাবছিল কবিতা বলে উঠবে, তাহলে চলো আমরা তোমার ধূলিহরে গিয়ে বাস আরম্ভ করি। আমরা জগৎপুরের বাসিন্দা হয়ে যাই। আমরা পঞ্চাশ বছর পিছনে ফিরি। পঞ্চাশ বছর আগের পৃথিবীতে প্রবেশ করি। বিজন মাথা নাড়ছিল নিজের মনে। কবিতা তো শুধু গৌড়েশ্বরকে জানে, চাঁদনির কথা কিছুই জানে না। জানলে কবিতা কী বলবে তা কল্পনাও করতে পারে না সে। গৌড়েশ্বরকে বের করে তালা দিলে, চাবি তো চাঁদনির হাতে দিয়ে আসতে হবে। ওই বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে চাঁদনি তৃষিত নয়নে। কবিতা যদি চাঁদনির কথা শোনে—বলবে নাকি বিজন? বলে দিয়ে নিজে মুক্ত হবে? চাঁদনির কথা যদি সবটা বলতে পারে সে তবে কবিতা একটা পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেবে। বিজন বলতে যায়, ওই যে দুধকুমার, ও আর ওর বউ....।

অন্ধকার থেকে নেমে এসে তার আর তার কবিতার মাঝখানে এসে দাঁড়াল কালিদাস বোস, খুনখুনে গলায় বলল, তুই কি পাগল হলি বিজন।

কেন, পরিষ্কার করে নেওয়াই তো ভাল।

ও তোর নাং হতে চাইছে, বাঁধা মেয়েমানুষ, তার কথা তুই বলবি বে করা ঘরের বউকে, এ কখনো হয়?

আমার বাড়িটা যে আমাকে চিন্তায় রেখেছে।

বাড়ি তো বাড়ি, সে আলাদা ব্যাপার, কিন্তু যে মেয়েমানুষ তোর কাছে তার যৈবন উচ্ছুগ্গো করেছে, তারে হাটের ভিতরে উদোম করে দিবি?

কই দিচ্ছি, আমি তো শুধু কবিতারে বলব।

তা'লে আর বাকি থাকে কী, তোর বউকি সহ্য করবে, মেয়েমানুষ তার সোয়ামি পুরুষটারে দ্যাখে গয়নাগাটির মতো, গয়নাগাটি যেমন ছাড়ে না, নিজের সোয়ামিরে ও না, ভাগ দেবে না।

না ছোট ঠাউদ্দা বলতে হবে, ওর জানা ভাল, তা'লে আমাকে চোখে চোখে রাখবে, আমি আর অন্যায় করতে পারব না।

খি খি করে হাসে কালিদাস, ওরে আমার ন্যায় করুনিরে, তুই ঠিক তোর আপন ঠাউদ্দা দুর্গাদাসের মতো হয়েচিস, তোর খিদেও আছে আবার ন্যায়ের ভড়ংও আছে, তোর ঠাকুদ্দা একবার অন্যায় করেছিল, জানিস তা?

বিজন বলল, জানতে চাইনে।

আমিও জানাতে চাইনে, লোকটা যেমন ছিল লোকের চোখে তেমন থাক, আমি চরিত্রহীন, লম্পট, তাই আমার ভূষণ, ওই নামেই আনন্দ, ক'জন লম্পট হতি পারে?

বিজন বলল, তুমি যাও ছোট ঠাউদ্দা, আমি কবিতার সঙ্গে পরামর্শ করব।

পরামশশো কী করবি, যখন জগৎপুরে যাস চাঁদনির জন্য যাস, কলকাতায় ফিরে সে মেয়ে মানুষটারে মনের আঁস্তাকুড়ে ফেলিস, না বলবি নে, সে তোরে ছাড়বে না।

ওই বাড়ির লোভে।

পাকাপাকি বাড়িটায় ঢুকতি চায়।

বিজন বলল, বাড়ি আমি দেব না।

না দিবিনে, সম্পত্তি আর মেয়েমানুষ এই হলো পুরুষের গয়না, যদি চাঁদনির গয়না তুই হয়ে যাস?

বিজন বলল, পারবে না।

তখন কালিদাসের জমাট অন্ধকারের পিছন থেকে কবিতা ডেকে ওঠে, কী হলো তোমার?

বিজন বলল, কী হবে কিছু না।

বিড়বিড় করছ কেন?

না তো, বলছি বাড়ি নিয়ে কী করবে?

কী করে মানুষ?

বসবাস করে, ছেলেপুলে মানুষ করে, তাদের হাতে বাড়ি রেখে মরে যায়।

তাই হবে।

কী করে হবে, এক বাড়ি সন্তোষ চক্কোত্তির হাতে, অন্যটা গৌড়েশ্বর নিয়েছে, এখন দুধকুমারও নেব নেব করছে।

কেন ওটা কি বেওয়ারিশ বাড়ি?

তাই তো, তার বেশি কী?

কী বলছ তুমি, নিজে হাতে গড়েছ।

গড়েছিলাম যখন গড়েছিলাম, এখন তো বাসও করি না, মানুষ ছাড়া ও বাড়ি একা থাকবে কেন? ও বাড়ির আমিই বা কে?

কবিতা চুপ করে কী যেন ভাবছিল। এই এলাকা ছেড়ে জগৎপুর যেতে পারবে? কী করে যাবে সে? তাহলে তার ভরতনাট্যম বন্ধ হয়ে যাবে। নিজের কতদিনের শেখা, অধ্যাবসায় সব শেষ হয়ে যাবে। তার মনেরও তো কিছু পাওনাগণ্ডা আছে, ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে। পঞ্চাশ বছর আগের ধূলিহরের কেউ ভরতের নাট্যশাস্ত্র, ভরত নাট্যম নৃত্যের কথা শুনেছিল? তাস পাশা লুডো বাঘবন্দি খেলার বাইরে কী জানত? কড়ি খেলত বোধহয়। কড়ি খেলাটা কী করে খেলতে হয়? ওগো কী করে কড়ি খেলতে হয়?

বিজন অবাক, কেন, হঠাৎ?

কড়ি খেলতে তো আর একজন লাগে।

শুনেছি তাই, কোন সিনেমায় দেখেওছিলাম।

স্বামী-স্ত্রী খেলে না? কবিতা জিজ্ঞেস করল।

কী জানি খেলত তো।

আমি কার সঙ্গে খেলব?

বিজন বলল, হঠাৎ যে কড়ি খেলা?

ধূলিহরে গিয়ে খেলতে হবে তো, আর রং মেলানো তাস?

বিজন বলেই ফেলছিল, 'কেন চাঁদনি আছে, তোমরা দুই সতীনে খেলবে।' নিজেকে সংবরণ করল সে। কিন্তু কথাটা মাথার ভিতরে জেগে থাকল। দুই সতীনে খেলবে, যে জিতবে, সে সেদিন স্বামীর ভাগ পাবে? আহারে। কালিদাস তার কথা শুনতে পেল। তাদের মাঝখানে এসে বলল, হ্যাঁ, খুব হবে, চুলোচুলি হবে, তুই মেয়েমানুষ চিনিসনে বিজন।

বিজন বলল, হবে হবে, আবার চোখ রাঙানিতে ঠাণ্ডা!

পারবি তুই?

বিজন বলল, জানিনে।

পারবি নে, তোর ভিতরে তোর ঠাকুদ্দা দুগ্গাদাস, থাক গে, ভেবেছিস এই যথেষ্ট।

কবিতা বলল, পান সাজব, কড়ি খেলব আর শরৎবাবুর দেবদাস পড়ব তাই তো!

বিজন বলল, না, ও জায়গা ডেভলপ করে যাবে দ্রুত।

সে তো শুনচি, জমি কেনার দু বছর বাদে বাড়ি, বাড়ি হলো ছ'মাস ধরে, তারপর কতদিন, কতবছর কাটল, এক পাও এগিয়েছে তোমার জগৎপুর?

বিজন বলল, না না জগৎপুর এগোবে না, কলকাতা এগোচ্ছে ওর দিকে।

ও দাঁড়িয়ে আছে জগদ্দল পাথরের মতো?

না তা হবে কেন, কলকাতাকে অবিরাম ডেকে যাচ্ছে।

কবিতা বলল, যদি ইরফানও থাকত!

বিজন বলল, একটা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

করেছ থাক না, তালা দিয়ে রেখে দাও, মাঝে মাঝে যাব।

তাহলে মাইনে দিয়ে কেয়ারটেকার রাখতে হয়।

কেন এমনি তালা দিয়ে রাখা যাবে না?

বাড়ির ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাবে।

নেবে তোমার গৌড়েশ্বর।

হুঁ, তাহলে কী করব, এখন আমি ওখানে গিয়ে অফিস করতে পারব না।

কবিতা বুকে বল পেল, তাহলে?

হাজার তিনের কম কেউ কেয়ারটেকার হবে না।

কবিতা বলল, কেন যে বাড়ি করতে গেলে বিজনবাবু, বাড়ি তোমাদের ধাতে সয় না।

তুমি বারণ করোনি কেন?

আমি কি জানতাম এমন হবে?

গৌড়েশ্বর এমন ভাবে থাকে যেন ও বাড়ি ওর, আবার দুধকুমার আর ওর বউ প্রত্যেকদিন একবার করে ঘুরে যায়, বাড়ির গায়ে গা ঘষে যায়, বলে ভাল লাগে, তারা চায় তারা থাকবে?

আর?

ওই ভগবান মণ্ডল, দুধকুমারের বউ নিয়ে যে ভেগেছিল, সেও ভোজের হাট ছেড়ে জগৎপুর এসে আছে পাকা দালানে শুয়ে ফ্যানের হাওয়া খাবে বলে।

আর?

আরো আছে কবিতা, আরও আছে।

ভাবো কী করবে; পরামর্শ করো বন্ধুদের সঙ্গে।

বিজন বলল, সব হয়ে গেছে, ও বাড়ি আমি বেচে দেব, রাখব না।

ঠিক তখন কালিদাস বোস এসে ঠাণ্ডা হাতে তার মুখ চেপে ধরল, বেচলে আমি যাব কোথায়, তোর চাঁদনি, তার কথাটা ভাব, সব দিল তো ওই বাড়ির লোভে।

চার

বিজন এল ধূলিহর আবার। সিদ্ধান্ত তার পাকা। এ বাড়ি রাখবে না। ধূলিহর আবার ধূলিহরে ফিরে যাক। স্বপ্ন আর ঘুমের ভিতরে। তার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো সমঝোতা হতে পারে না। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের ধূলিহরে সে ফিরে যাবে কী করে? ষাট বছর আগের পৃথিবীতে তো তার নিজেরই অস্তিত্ব ছিল না। সে ছিল বাতাসে, আলোয়, জলে, মেঘে, তৃণে, অন্নের ভিতরে। এসব দিয়ে তার প্রাণ হয়েছে তার কত পরে? সুতরাং ষাট বছর আগে সে ফিরলে পৃথিবীতে যা যা ঘটেছিল সেই সময় তার ব্যত্যয় ঘটে যাবে। সেই ব্যত্যয় ঘটে গেলে তার পরে এই ষাট বছর ধরে যা যা ঘটেছে তার ভিতরেও কোনো না কোনো ব্যত্যয় ঘটবে। তাহলে হয়ত এমন হতে পারে দেশভাগের পর আবার দেশ জুড়ে গেল। জিন্না নেহরু বসে এটা করে দিয়ে গেল। তার সাক্ষী থাকল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি নিরুদ্দেশ থেকে ফিরে এসেছিলেন হয়ত। তা যদি হয় তারপর যতগুলো ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছে ১৩৫০, ১৩৫০-৫২, ক'বছর আগের কারগিলের যুদ্ধ, এসবের কোনো অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না। এসব আর হয়নি। তাহ'লে যে এতবড় সীমান্ত, কাঁটাতারের বেড়া, সীমান্ত রক্ষীবাহিনী, প্রত্যেকদিন গোলাগুলি বিনিময় এসব অলীক হয়ে যায়। বিজন তার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে ভাবছিল এইসব নানারকম। গৌড়েশ্বর পাড়ায় বেরিয়েছে, আসবে এখনই। তার নাতি ডাকতে গেছে তাকে।

এখন কি আর হতে পারে? যা ঘটে গেছে তা না ঘটানো কি সম্ভব? তা যদি সম্ভব হতো, বিজন আরো ক'বছর আগে ধূলিহরে না হয় ফিরত। তাহলে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটি হত না? হিরোসিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা, তেজস্ক্রিয় বাতাসে মানুষের মরণ—হত না? অতীতে যা যা ঘটেছে তার একটি বদল করে দিতে পারলেই সব বদল হয়ে যেত। বিজন মনে মনে বলল, তাহলে ফিরলে হয়? ফিরলে দাঙ্গা, দেশভাগ, আবার দাঙ্গা, আবার দাঙ্গা, ১৩৫০ এর মন্বন্তর, ১৩৫০-এর আশ্বিনের ঝড়—এসব কিছুই হত না।

দা'বাবু এয়েছ? দরজা দিয়ে উঁকি মারে দুধকুমার আর ভগবান মণ্ডল।

হ্যাঁ, কেন দরকার আছে?

আমাদের ভিটেয় যাবা তো?

দেখি কী হয়?

এস, চাঁদনি পাঠাল, ও ঠিক জেনে গেছে।

কী করে জানল, দেখেছে?

না গো দ্যাখেনি, ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছিল দুকুরে, এই একটু আগে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বলল, দেখে এস তো দা'বাবু এল কি না।

বিজন কেঁপে উঠল, বলল, ভাল আছ তো তোমরা।

চাঁদনি তো, হ্যাঁ আছে, দা'বাবু তুমারে ও ভগবানের মতো দ্যাখে। দুধকুমার কথাটা বলেই জিভ কাটল, তার মানে ভগবান মণ্ডল না, শিব দুগ্গা ভগবান, তুমি তার শিবঠাকুর।

বিজন শিহরিত হলো। তার শরীর কঠিন হয়ে উঠল মুহূর্তেই। মনে পড়ে গেল চাঁদনির শরীর। শরীর শরীর! এ জগতে শরীর ছাড়া এই মুহূর্তে কিছু আছে? দুধকুমার আর ভগবান মণ্ডল তার সামনে মেঝেতে বসে আছে। ওদের পেটে অল্প একটু পড়েছেও। বিজন বলল, আমি গৌড়ার জন্য বসে আছি।

কেন বসে আছ দা'বাবু, তালা দিয়ে মোর হাতে চাবিকাঠি দাও, তারপর সঙ্গে চলো, আজই গৌড়ার ঢোকা বন্ধ করে দাও।

বিজন বলল, না বলে বন্ধ করে দেব?

হ্যাঁ তাই, যদি বলো ওর বিছানাপত্তর আমি বের করে ওর বাড়ি ফেলে দিই।

তা করা যায়?

খুব যায় বাবু, তা না করলে তুমি গৌড়ারে হটাতে পারবা না। ভগবান মণ্ডল মেঝেতে হাত ঘষতে ঘষতে বলল, এমন সোন্দর একখানি শিবঠাকুরের মতো বাড়ি করেছ দাদাবাবু, এ বাড়িতে গৌড়া কেন থাকবে?

তাহলে কে থাকবে?

আমি থাকব, আমারে পাহারা দিতে রেখে দাও।

শুনে দুধকুমার বলল, তোরে কেডা পাহারা দেয় ঠিক নেই, তুই দিবি পাহারা, আর তুই ভোজেরহাটের লোক, জগৎপুরে তোর পাহারা কেডা মানবে?

পাহারা মানবে না? বিজন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

না দা'বাবু, মানবে না, ওরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে যে আসবে লুটপাটের জন্য। বলতে বলতে দুধকুমার দেওয়ালে হাত ঘষতে লাগল, হাত ঘষতে ঘষতে বলল, কী মোলায়েম দাদাবাবু, ঠিক যেন মেয়েমানুষের গা, নরম নরম ভাবও আছে।

প্যারিস প্লাস্টার, তার উপর হালকা গোলাপি রঙের প্রলেপ। দেওয়ালের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল বিজন বোস। তারই তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে এসব। সে সাজিয়েছে এসব। দুধকুমার বলছে, এসব গৌড়ার ভোগে লাগছে, এর চেয়ে খারাপ কিছু হয়, ও কে?

বিজন বলল, কেউ না।

কেউ না তবে বসে আছ কেন ওর জন্য, চলো মোর ভিটেয় চলো।

কেন এখেনে অসুবিধে হচ্ছে?

না এতো বড় সোন্দর! ভগবান মণ্ডল বলল।

কিন্তু চাঁদনি নাই, হাতনেতে বসে আছে। দুধকুমার বলল।

ডেকে আন।

তুই যা ভগবান, তোর কথায় আসপে।

শুনে ভগবান বলল, হাঁক মার আদ্দেক গিয়ে, ভিটেয় তালা দে আসুক, আমরা এখেনে আজ ঢুকে পড়লাম।

দুধকুমার অবাক, সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি ছাড়া মিথ্যে কী, এই তো বসে আছি ঠাণ্ডা মেঝেতে গ্রিল গেটে তালা দে দুধে, লোক দেখে তালা খুলব।

চাঁদনিরে ডেকে আনি।

হাঁ লিয়ে আয় আমরা তিনজন আর দাদাবাবু, চারজনের ফেমিলি এটা, গৌড়ার ঢুকা বন্ধ। সত্যি কথা বলতে কী দাদাবাবু, যবে দেখেছি এ কোঠাবাড়ি তবে থেকে জগৎপুর আমি ছাড়তে পারিনে। হাসপাতালে ভর্তি হয়েও তুমার বাড়ির স্বপ্ন দেখিছি আমি। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ছাড়া-গরুর মতো এদিক ওদিক ঘুরে, ভোজেরহাটে নিজির ভিটেয় গিয়েও মন বসল না।

বিজন বলল, এটা তো ভাল না, বাড়িটা তো আমার।

তুমার হলি কী হবে? দুধকুমার এক গাল হাসল, তুমি আমি তো এক ফেমিলি দা'বাবু, তুমি আমাদের ভগবান বলতি বলতি চাঁদনি কেঁদে ফেলে।

তুই ওরে ডেকে আন। ভগবান মণ্ডল আদেশ করল।

দুধকুমার উঠতে যাবে তো গৌড়েশ্বরের বেঁটেখাটো মোটাসোটা বিড়ালের মতো চেহারাটা দরজায় ভেসে উঠল। দুধকুমার আর ভগবানকে দেখে কুতকুতে দুচোখে অসন্তোষ জেগে উঠল। ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল, এ মাতাল দুটো কেন?

দুধকুমার আর ভগবান একসঙ্গে গুঁটিয়ে ছোট হয়ে গেল যেন। দুধকুমার জড়ানো গলায় বলল, গৌড়কা' কুথায় ছিলে তুমি, দা'বাবু বসে আছে কত সময়।

গৌড়েশ্বর বলল, ও ঘর থেকে টুলটা নিয়ে আয় দেখি।

দুধকুমার থপথপিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। ভগবান মণ্ডল জুলজুল চোখে একবার গৌড়েশ্বর একবার বিজনকে দেখতে লাগল। টুল এসে গেল। গৌড়েশ্বর তার উপরে বসে বিজনকে জিজ্ঞেস করল, দাদা কখন এলেন?

বিজন জবাব দিল না।

গৌড়েশ্বর তখন দুধকুমারদের দিকে তাকায়, বলল, মাল খেয়ে এ বাড়িতে ঢুকবিনে, এটা কোন লোকের বাড়ি তা জানিস?

দুধকুমার হাসল বোকার মতো, বলল, গৌড়াকা' আমি দা'বাবুর পা টিপতে এয়েচি, চাঁদনি বলল আসতে।

গৌড়েশ্বর বলল, হয়েছে তো এবার যা, দাদা চা বলি?

মাথা নাড়ে বিজন, না, বলছি, আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হলো!

সে হবে খন, সব হবে, এই দুধে তোর স্যাঙাৎটা কী করতে—

দুধকুমার বলল, গৌড়াকা' ওসব কথা তো আগে হয়েচে, ভগবান তার সাইকিল হারিয়েচে, দা'বাবু বলেচে ওরে সাইকিল দেবে, ও এখেনে বায়াত্তর ঘণ্টা সাইকিল চালাবে কথা দেছে, কতবড় সাইকিলিয়া তা দেখতি পাবা।

যত্তো সব মাতালের কারবার, দাদা সাইকেল দেবে কেন?

দাদার ইচ্ছে। ভগবান বলে ওঠে।

অ্যাই চোপ, তোর বাড়ি ভোজেরহাট, এখেনে তুই বহিরাগত, কী করিস এখেনে তা আমি জানি নে।

দুধকুমার বলে উঠল, বকতিছ কেন, বকার কী হলো, গরিব মানুষ একটা সাইকিল নিতে পারে না, ও পাবে কুথায়?

গৌড়েশ্বর এবার বিজনকে বলল, এদের আসকারা দেন কেন?

বিজন বলল, তোমরা বসো, আমি যে কারণে এসেছি তা বলি।

ওরা বসবে কেন, ওরা কারা? গৌড়েশ্বর এবার ক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠল।

বিজন বলল, এ বাড়িটা কার?

আজ্ঞে আপনার?

আমার বাড়িতে কে আসবে কে আসবে না তা কি আমি বলব না?

আপনিই বলবেন, কিন্তু আপনি জগৎপুরের কী জানেন, তে রাত্তিরের বেশি এখেনে থেকেছেন যে সব জানবেন, জানি আমি।

কী জানো তুমি? এবার দুধকুমার বলে উঠল। তার সাহস ফিরে আসছিল বিজনের কথায়।

কী জানি মানে, সব জানি! গরগরিয়ে উঠল গৌড়েশ্বর মণ্ডল, আমারে ঘাঁটাবিনে দুধে, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব, আমি পরোয়া করিনে কাউরে।

দুধকুমারও ফুলে উঠতে লাগল উত্তেজনায়। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। জড়ানো গলায় বলল, কী বলবো জানি, ভাল জানি, বলো না কেন বটতলায় গে, আমার কিছু যায় আসে না।

তুই যা করছিস তা ঠিক না।

কী করচি?

কী করছিস তা তুই জানিস।

না আমি জানি নে।

ভেবে দ্যাখ দুধে, তুই কি একটা মানুষ!

তখন বিজন বলল, যদি ঝগড়া করতে হয় বাইরে গিয়ে করো, এখেনে না।

গৌড়েশ্বর কেমন লালচে চোখে বিজনের দিকে তাকায়, তারপর বলে, দাদা, আপনি এ জগৎপুরে নতুন, আপনি বিপদে পড়বেন।

কীসের বিপদ? দুধকুমার জিজ্ঞেস করল।

তুই ভাল জানিস তা, এ লোকটা শিক্ষিত মানুষ, আমাদের সঙ্গে এঁরে মানায় না, আমরা এঁর নখের যুগ্যি নই, ভাল মানুষটার তুই সব্বোনাশ করছিস দুধে, তোরা একসঙ্গে এরে শেষ করবি।

বিজন এবার সিধে হয়ে বসে, বলল, কী কথা হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি না। শুনুন গৌড়াবাবু, আমি বাড়ি খালি করাব।

আঁজ্ঞে?

হ্যাঁ, চাবিটাবি সব দিয়ে আপনি আপনার ঘরে ফিরে যান।

সে আমি দিচ্ছি, এখনই দিচ্ছি, আমি কি হা ঘরে নাকি যে এ বাড়ির ঘর ছাড়া আমার চলবে না, কিন্তু তারপরে?

তালাবন্ধ থাকবে।

নাকি ওরা এসে ঢুকবে?

কেউ না। ভগবান মণ্ডল ফুট কাটল।

অ্যাই চোপ! ধমকে উঠল গৌড়েশ্বর, তোরে হাজতে ঢুকিয়ে দিতে পারি জানিস, তুই ওর বাড়িতে কী করতে থাকিস?

ভগবান মণ্ডল কথাটা গায়েই মাখল না। বিজন বোসের কথাবার্তার ধারায় তার ভিতরেও জোশ্ এসেছে। চাবি নিয়ে বাড়ি খালি করাবে বিজন বোস, এর চেয়ে বড় কথা কী? সে বলল, দাদার বাড়ি, দাদা যা ইচ্ছে করবে।

ওই কথাই তো বলছি, লোকটার সব্বোনাশ করবি তোরা, আমি কি সব কথা পষ্ট করে বলব আরো।

বিজন বলল, থামুন, বলার হলে বাইরে গিয়ে বলুন।

না দাদা আপনারও জানা দরকার। আপনার মতো ভাল লোকের সব্বোনাশ হবে আর রাজ্য বসে বসে দেখবে তা তো হতি পারে না, পরে আমারেই দোষ দেবে সবাই, বউদি আমারে এ বাড়ির ভার দিয়ে গেছে, আপনার ভালমন্দ আমারে দেখতে হবে না!

দুধকুমার বলল, তুমি তো আচ্ছা লোক গৌড়কা', দাদাবাবু যা বলচে তা করো চাবি ওনারে ফেরত দে নিশ্চিন্ত হও।

চাবি আমি দিচ্ছি, কিন্তু কেন দেব তা জানতি হবে না।

তোমার জেনে কী হবে?

আমি জানব না তুই জানবি, এ বাড়ির সব কটা ইঁট আমি নিজে দাঁড়িয়ে গেঁথেছি, দাদা তো টাকা দিয়ে খালাস, কিন্তু এরে গড়ল কে, এই গৌড়েশ্বর।

হুঁ, মার পেটে ছা'র মতোন? ভগবান বলে উঠল।

গৌড়েশ্বর কঠিন চোখে ভগবানকে মেপে নিয়ে বলল, দাদা ওরে এখেন থেকে যেতে বলুন, ও কে, কেন এয়েচে এখানে, ও তো দুধের সব্বোনাশ করেছিল, বউ ভাগায় নি?

দুধকুমার বলল, না, সব মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা?

দুধকুমার অম্লান মুখে বলল, মিথ্যে কথা, চাঁদনি আমারে সব বলেচে, আমার বউ আমি বোঝবো, তুমি চাবি দাও।

তোরে দেব?

না দা'বাবুরে দাও, অনেকদিন ভোগ করেছে পাকা ছাদ, মোজেক মেঝে, প্যারিস করা দেয়াল, আর না।

গৌড়েশ্বর বলল, তোর কথায় দেব? দেব কি দেব না আমি বুঝব, আমার সঙ্গে দাদার বোঝাপড়া হবে, বাড়িটারে রক্ষে করছি আমি, তোরা হলে তো সব খুলে খুলে বিক্রি করে দিতিস।

বাজে কথা বলবা না গৌড়কা', তুমি গুরুজন বলে আমি কিছু বলতি পারি নে, তুমার কি পোবিত্তি, নিজির বউমার নামে কু কথা বলো, চাঁদনি তুমার বউমা না, তুমি তার শউর না?

বিজন উঠল। ঘর থেকে বেরোল। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে লাগল। বেলা পড়ে এসেছে। ছায়া নামছে জগৎপুরে। উঠতে উঠতে বিজনের কানে এল শঙ্খধ্বনি। গৌড়েশ্বরের খ্রিস্টান পুত্রবধূ সারা—সরস্বতী তাদের লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে খুব জোরে শাঁখ বাজিয়ে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে বিজন আরো অনেক শঙ্খধ্বনি শুনতে পেল। জগৎপুর জুড়ে শাঁখ বাজছে। সন্ধ্যা হয়ে এল। দূরে শিয়ালের ডাকও বুঝি শোনা গেল। যেমন হতো তাদের ধূলিহরে ঠিক যেন

তেমন। বিজন দূরে উত্তর পশ্চিমে তাকায়। শূন্য মাঠে বাড়িটা একা দাঁড়িয়ে। বোঝা যাচ্ছে না হাতনেতে দুধকুমারের বউ আছে কি না। নাকি ও এখন চুল বাঁধছে। কাচা কাপড়-জামা পরছে। কপালে সিঁদুর লাগাচ্ছে। ঘাড়ে বুকে পাউডার। দাদাবাবু তো আসবেই। না এসে পারবে? মাথা নামিয়ে আঁচল ফেলে তার স্ফুরিত দুই বুক দেখতে দেখতে ভাবছে, দাদাবাবু না এসে পারবে? ঘুরে পাছায় হাত রেখে বিড়বিড় করছে, পারবে ˘ কালিদাস বোসের নাতি? পাবে কোথায় এমন? এমন ভাবে ভালবাসতেই পারবে কে?

কালিদাস বোস তখন বিজনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। চাপা গলায় বলছে, যাবি নে, ও বিজন যাবিনে?

বিজন পায়চারি করছে ছাদে। দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে মাঠে বসে এই বাড়ির গড়ে ওঠা দেখেছে সে। মুঠোমুঠো টাকা বের করে দিয়েছে ইট বালি সিমেন্ট পাথর আনতে, কী হল তাতে?

হবে কী? চাপা গলায় ˘কালিদাস বলল, তোর কথা ভাবতে ভাবতে ভিজে গেল মাগিটা? এই বাড়ি আর তুই ওরে খেয়ে ফেলেছিস!

বিজন বলল, আমি এ বাড়ি রাখব না।

কী করবি না রেখে?

বেচে দিয়ে ফ্ল্যাট কিনব কলকাতায়, আমি পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের ধূলিহরে ফিরতে পারব না।

কেন পারবি নে, পেরেছিস তো, অমন একখানা মেয়েমানুষ পেয়েছিস, একেবারে দক্ষিণপাড়ার বাগদি বউ-এর মতো, ঠিক অমনি ছিল, অমন ডগমগে, অমন রসে ভরা, অমন দিঘির মতো, ডুবে মরেও আনন্দ, তুই ওর ভিতরে ডুবে মর বিজন, দেখে আমি আমার নয়ন সাথক করি।

তখন গৌড়েশ্বর আর দুধকুমার ঝগড়া করতে করতে উঠে এল উপরে। গৌড়েশ্বর বলল, দাদা কি দুধে আর ওর বউরে ঢোকাবেন এ বাড়িতে?

না। বিজন ঘুরে বলল।

তবে চাবি নে কী করবেন?

আমি এ বাড়ি রাখব না।

রাখবেন না মানে?

বেচে দেব গৌড়াবাবু, দাম পেলেই দিয়ে দেব, কী হবে, আমি তো এখেনে আসতে পারব না, এ জায়গাও যেমন ছিল তেমন থাকবে, এর কোনো বদল হবে না।

দুধকুমার আর গৌড়েশ্বর অবাক হয়ে বিজন বোসের কথা বুঝে নিতে চাইছিল।

পাঁচ

দুধকুমার আর গৌড়েশ্বর বসেছে মাটিতে। তিনি সেই চেয়ারে। ভগবান বেরিয়ে গেছে। গৌড়েশ্বর অনেকবার বলেছে দুধকুমারকে চলে যেতে। সে যায় নি। গৌড়েশ্বর তখন বলেছে, আমি আপনার বাড়ি যাব, বউদিকে জিজ্ঞেস করব, তারপর মেনে নেব, নিজ হাতে গড়া বাড়ি, দিয়ে দেবেন?

দুধকুমার বলল, এমনি দেবে নাকি, সেল করবে।

ওই হলো, কেন বিক্রি করবে?

দুধকুমার বলল, সেডা ওঁর ইচ্ছে, তোমার থাকার জন্যি তো দা'বাবু এ দালান হাঁকাননি, তুমি সুখ ভোগ করবা আর সবাই আঙুল চোষবে, তার চে' ঝেড়ে দেওয়া ভাল, কি দাদাবাবু ঠিক, আমি খদ্দের দেখছি।

গৌড়েশ্বর বলল, না এর ভিতরে তোর মাথা গলাতে হবে না, দাদার বাড়ি দাদার থাকবে, এখেনেই থাকবে।

তার মানে?

মানে দাদা যেমন আসে তেমন আসবে।

আর তুমি খাটে শুয়ে ঠ্যাং নাচাবা, হবে না।

দুধে, মুখ সামলে কথা বল।

তাই তো বলছি, গুরুজন বলে তুমি বেঁচে গেলে গৌড়কা', দা'বাবুর বাড়ি দা'বাবু যা বলবে তাই হবে, যদি বলে বাড়ি থাকবে তো থাকবে, না থাকবে তো না থাকবে, যদি বলে এ বাড়িতি দুধকুমার তার ফেমিলি নে থাকবে, তবে তাই হবে, যদি বলে বেচাকেনা হবে, মানতি হবে দা'বাবুর কথা।

গৌড়েশ্বর কী বলতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে। বলল, ঠিক আছে, আজ তো রাগের মাথায় বললেন দাদা, আমি চাবি দিয়ে দিচ্ছি, তালা দিয়ে যান, বাড়ি গিয়ে ভাবুন কী করবেন।

ভেবেই তো এসেছি।

বউদি জানে না?

জানে, আমি এ বাড়িতে আসতে পারব না।

কেন আসতে পারবেন না?

এ হলো ষাট সত্তর বছর আগের পৃথিবী, জগৎপুর-ধূলিহর।

গৌড়েশ্বর বলল, বুঝলাম না।

দুধকুমার বলল, আমি বুঝেচি, সরল কথা।

গৌড়েশ্বর জিজ্ঞেস করে, কী সরল কথা?

ও তুমি বোঝবা না গৌড়কা', বুঝতি হলি মনে প্যাঁচ রাখতি নেই।

গৌড়েশ্বর নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করল, কী বলছেন দাদা?

আমি বাড়ি বেচে দেব, কাগজে অ্যাড দিই।

কাগজে? আঁতকে উঠল গৌড়েশ্বর, কাগজে দিয়ে কী হবে?

হবে না কাগজে?

মোটেই না, বাড়ি করলেন যখন আমি ছিলাম, বাড়ি বেচবেন যখন আমি কি থাকব না দাদা, কিন্তু পরে না বলবেন না তো?

না বলব কেন, মনে মনে ঠিক করে এসেছি।

গৌড়েশ্বর বলল, ভদ্রাসন তো, তার নাম আবার ধূলিহর, আপনার দেশের বাড়ির নামে, বলছেন বটে, পারবেন না, আপনার মায়া জন্মায়নি?

মায়া তোমার হয়েছে গৌড়কা', তুমি শোয়া বসা কর নিজের ভিটের মতো লাল মেঝে ভেঙে মোজেক, পাথর বসা করালে দা'বাবুরে দে, কেন করালে, না তুমি ভোগ করবা, এমন আরামের মেঝে, দেয়ালের এমন তেলতেলে নরম গা, বাথরুম কমোড, ঝরনাজল, এতো প্রায়—কী বলব আমি, বলার উপায় খুঁজে পাচ্ছিনে।

বল না, বলে ফেল।

তুমি গুরুজন, বলি কী করে?

গুরুজন বলে মানিস, আমারে সব সময় হিংসে করিস।

হিংসে করার মতো হলে হিংসে তো করবই, বলছি এমন একখান বাড়ি, যা কিনা—তুমি তারে দখলে রাখবা, আর মায়া তুমার জন্মাবে না?

গৌড়েশ্বর বুদ্ধিমান লোক। কেনাবেচার কথা সে দুধকুমারের সামনে করতে চায় না যে তা বুঝতে পারছিল বিজন। কিন্তু সে তো বেচবে বলেছে, কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে, খদ্দের আসবে, তাকে বাড়ি দেখাবে, লেনদেন হবে—এই পর্যন্ত তাতে গৌড়েশ্বরের ভূমিকা কী? বিজন বলল, থাক ওসব কথা, আমি বলে দিলাম।

হুঁ, তা চাবি কি নিয়ে যাবেন?

যাব।

নিয়ে যান, আপনি গৌড়া মন্ডলকে চেনেননি দাদা, সে এ পর্যন্ত কোনো অসৎ কাজ করে নি, অশ্বত্থামা হত বলেছে কিন্তু ইতি গজ বলে নি, নেন চাবি, আমার মাল আমি পরে বের করব, সন্ধেবেলায় তা করলে এ বাড়ির অকল্যাণ হবে।

এতে তো কেউ থাকে না, কী অকল্যাণ হবে? দুধকুমার ফোড়ন কাটল।

তা তুই বুঝবি কী করে, তোর মাথায় ঘিলু থাকলে বউ ওসব করে বেড়াতে পারত না।

সাবধানে কথা বলবা গৌড় কা', গুরুজন বলে পার পেয়ে যাচ্ছ।

গৌড়েশ্বর বলল, সন্ধেবেলায় মাল বের করলে এ ভিটেয় যে বাস করবে তার অকল্যাণ হবে, সে আমি হই আপনি হন।

কবে বের করবেন?

আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, টায়েম মতো বের করে নেব।

ডুপ্লিকেট চাবি! দুধকুমার বলল, তা'লে তো থাকাই হচ্ছে।

বেচাকেনা হবে, যদি জানালা খুলে নে যায়, গ্রিল কেটে নেয়, এ বাড়ির দাম ওঠবে?

তাহলে আপনার কাছে থাকবে?

হ্যাঁ, আপনার ভাবতি হবে না, কাল আমি ফোন করব।

দুধকুমার বলল, এ কী রকম হলো, তুমি রয়ে যাবা?

তবে কে রইবে? আমি তো এরে রক্ষা করছি, আমি থাকব না তুই থাকবি, তোর বউ থাকবে?

বিজন গুম হয়ে গেল। সে একটা ফয়সালা আজ করবে। দুধকুমার উঠছে না। না উঠুক, সে বলল, বাড়ি রাখব না ডিসিশন নিয়ে নিয়েছি, মাল বের করে নিন, আমি বৃহস্পতিবার এসে চাবি নিয়ে যাব।

তাহলে খদ্দের দেখি? গৌড়েশ্বর জিজ্ঞেস করে।

আমি দেখব। বিজন বলল।

আপনি কী করে দেখবেন, আমিই দেখে দেব, ভাল একটা লোকের হাতে যাক।

দুধকুমার উসখুস করছিল গৌড়েশ্বর আর বিজনের কথোপকথনের ভিতর। সে না পেরে বলল, আমি ও তো দেখতি পারি।

গৌড়েশ্বর বলল, দ্যাখ নিয়ে আয়, কিন্তু দাদা আপনি একটা ঘর ভাড়া দিয়ে আর একটা রেখেও দিতে পারেন।

তাতে কী হবে?

বাড়িটা থেকে যাবে।

শুনে দুধকুমার বলল, ভাড়ার টাকা কি তুমি নেবা গৌড় কা'?

গৌড়েশ্বর বলল, আমি কারোর টাকা নিয়েছি এ পর্যন্ত, এই যে তিনবছর ধরে বাড়ি পাহারা দিচ্ছি, আমি কোনো টাকা চেয়েছি দাদার কাছে, কেয়ার টেকার রাখলে দিতে হত না?

তুমি আরাম পেলে, আবার টাকাও চাও? দুধকুমার প্রায় গরগর করে ওঠে।

আরামের কী রে, দায়িত্ব নেই?

মেয়েমানুষের মতো আরামের দালান কোঠা, তাতে বাস করছ, পাখার

হাওয়া খাচ্ছ, বাথরুমে চান করছ, আবার বলছ তার জন্য টাকা!

হ্যাঁ, দু হাজারের কম কেয়ারটেকার পেতেন না দাদা, প্রায় ষাট মাস হয়েছে, কত হাজার হয় বল দেখি দুধে।

দুধকুমার বলল, তাতে হলো কী?

ওটা তো আমার পাওনা।

বিজন টের পায় কথাটা তাকে শোনাচ্ছে গৌড়েশ্বর। বিজন খুব ঠান্ডা মাথায় শান্ত গলায় দুধকুমারকে বলল, খদ্দেরকে আমার মোবাইল নম্বরটা দিয়ে দিয়ো তো দুধকুমার, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলো।

আমি আমি কী পাব?

পরে কথা হবে।

গৌড়েশ্বর একটু থমকে গেল কথাটা শুনে। বুঝতে পারছিল টাকার হিসাবে বিজন বসু ক্ষেপেছে। সে বলল, আমরা দেখছি দাদা, আপনি ভাববেন না, আমি ওটা কথার কথা বলেছি, তাই বলে কি সত্যি?

দুধকুমার বলল, বাড়িটা ভোগ করলে এখন দালালিও করবা, ওটা আমি করলি হত না গৌড় কা', আমি তো এটা করি, করে থাকি।

করিস তো জমির দালালি।

বাড়ির হতি দোষ কী?

বুঝবিনে, বাড়ির দাম কী করে তুলতে হয় জানিস?

জেনে নেব।

আচ্ছা এখন যা দেখি, খদ্দের নিয়ে আয়।

দুধকুমার উঠল যেন বিশ্বজয় করে, বলল, আমার এটটু সল লেক যেতি হবে দা'বাবু, তুমি যদি যাও যেও, চাঁদনি তুমারে ভগবান মানে!

যাবেখন দাদা, আমি দিয়ে আসবখন, তুই যা।

দুধকুমার খুশি মনে বেরোল। দালালিটা তো করতে পারবে দশ বারো লাখ দাম উঠলে—ওফ! শিহরিত হলো যেন দুধকুমার। চম্পা চামেলি গোলাপেরও বাগে—গাইতে গাইতে সে চলল।

দুধকুমার চলে যেতেই গৌড়েশ্বর বলল, আমিই করব সব, এবার বলেন কত চান, মানে কত লাখ?

কত হতে পারে?

বেশি হবে না, ডেভলপ তো করেনি।

তবু কত?

খোঁজ নিতে হবে দাদা, দুধকুমারকে মাঝে মধ্যে নেশার পয়সা দিয়ে দিন, ও ওতেই খুশি, ওকে এরই ভিতরে ভেড়াচ্ছিনে।

বিজন বলল, কত হতে পারে আন্দাজ?

আপনি ঠকবেন না।

বিজন বলল, খদ্দের এলে আমাকে ডাকবেন, আমার নম্বরটা দিয়ে দেবেন, কথা বলে নেব।

সে আপনাকে ভাবতে হবে না, আপনি কি বেচা কেনা জানেন, ঠকে যাবেন, খদ্দেরের সঙ্গে কি কথা বলতে পারবেন?

কেন বলতে পারব না?

গৌড়েশ্বর হাসে, বলে, খদ্দেরকে দেখবেন একেবারে রেজিস্ট্রি অফিসে, সব তো দালালে করে।

দালালে তো খদ্দেরকে আনবে?

মাথা নাড়ে গৌড়েশ্বর, সব ডিল দালালের সঙ্গে হবে আমার।

আমি কোথায় থাকব?

গৌড়েশ্বর বলে, আপনি ঘরে বসে টাকা পেয়ে যাবেন, বেচা কেনার ঝামেলা অনেক কমে গেছে এখন।

কিন্তু কত দাম হবে আমি জানব না?

আমি বলে দেব আপনাকে।

বিজন মাথা নাড়তে লাগল, তাই কি হয়, আমার বাড়ি আমি বেচব না?

আপনিই তো বেচবেন, কিন্তু বেচার হ্যাপা সহ্য করতে হবে না আপনাকে।

বিজন বিড় বিড় করে, না এভাবে হবে না, আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুক খদ্দের, আমি দাম ঠিক করি।

দাম তো আপনি বলবেন, আমি জানিয়ে দেব, যা বলবেন তাই দিতে চেষ্টা করব।

কত হতে পারে দাম?

গৌড়েশ্বর বলল, দেখছি কত হতে পারে, আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।

না আমি কত দাম দেব?

বলি আগে, শুনুন আগে।

সে তো আমার দাম নয় গৌড়বাবু।

গৌড়েশ্বর বলল, তাহলে আপনার দাম আপনি ঠিক করুন।

বিজন পড়ল ধন্দে। সত্যিই তো এ বাড়ির দাম কত হতে পারে? জমি বাড়ির গায়ে তো গভর্নমেন্ট কোনো প্রাইস লিস্ট লাগায় নি যেমন, তেমনি স্ট্যাম্প ডিউটির জন্য লাগিয়েছেও। সে দাম অনেক, শুধু স্ট্যাম্প ডিউটি বাড়াবার জন্য। আসল দাম কম। কিন্তু তা কত? বিজন দেখছিল মসৃণ গোলাপি রঙের দেওয়াল, মোজাইক মেঝে, আলোর শেডগুলির বাহার। কিচেন,

টয়লেটের সৌন্দর্য চিন্তা করছিল বিজন। সেগুন কাঠের দরজা, জানালা, চমৎকার সব ফিটিংস—কত দাম হতে পারে?

গৌড়েশ্বর বলল, আমি খোঁজ নিই, আপনার কোনো চিন্তা নেই দাদা, গৌড়া আপনাকে ঠকাবে না, যা দাম তাই পাবেন, এ লোক একটা পয়সাও চায় না, আপনার বাড়ি কেমন রেখেছি বলেন।

বিজন সিগারেট ধরায়, বলল, ভাল, আপনাকে আমি ভরসা করি।

চাবি নেবেন না?

না থাক, খদ্দের দেখুন।

তাহলে উঠুন, দুধকুমারের বাড়ি যাবেন তো।

না যাব না।

যান না, কী হয়েছে, আমি কি জানি নে, সব জানি।

কী জানেন? বিজন চোখে চোখ রাখল।

জানি দাদা, তবে এ রোগ ওই বয়সে আমারও ছিল, আমার কি যাওয়া আসা হত না হাটগাছা, ও বয়সে দরকার হয়।

আপনি ভুল জানেন।

না ঠিক জানি। গৌড়েশ্বর হাসল, জানি দাদা সব জানি, আপনি যা করছেন করুন, আমি কিছু বলেছি।

বিজন রেগে যায়, বলল, খারাপ কথা বলছেন।

রাগছেন কেন, রাগার কী হলো, যদি আজ বলি কাল ওই ভগবান আর দুধকুমারই বলবে আপনি—

বিজন বলল, চাবিটা দিন, দুটোই দিন।

রাগছেন কেন দাদা, আমি কি বারণ করেছি, গৌড়া থাকতে আপনার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না, বেচার আগে এক রাত্তির এখেনে থেকে যাবেন, আশ মিটিয়ে ফুর্তি করবেন।

বিজন আর গলা তুলতে পারল না। সে অন্ধকারে পা দিতেই কালিদাস বোস তার পিঠে হাত দিল, যাবিনে আজ?

বিজন বলল, না।

কালিদাস বলল, চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত—যাবিনে কেন, সেজেগুজে বসে আছে তোর জন্যি।

গৌড়েশ্বর তার আগে আগে চলেছে। একবার ঘুরল। টর্চের আলো দেখল অন্ধকারে, বলল, ওসব হয়, পুরুষমানষের হবে না তো সে কিসের পুরুষ।

বিজন বলল, ও প্রসঙ্গে কথা তুলবেন না, আপনার জন্য আমি বাড়ি বেচে জগৎপুর ছাড়ব।

আমি কী করলাম?

কী করেন নি ভেবে দেখুন, তবে পার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেশান সব আছে আমার হাতে, আমার ক্ষমতা আপনি জানেন না।

জানি দাদা, কলকাতার লোকের ক্ষমতা বেশি হয়, কিন্তু আমি করলাম কী?

বিজন চুপ করে থাকল। বুঝে নিক। সব ব্যাপারে মাথা গলানোই তো ওর অপরাধ। গৌড়েশ্বর যেন বুঝে গেল হঠাৎ, বলল, আমি যাই, ঘর খোলা আছে, খদ্দের পেলেই জানাব, আর যদি সিদ্ধান্ত বদল হয় আমাকে জানিয়ে দেবেন, ভাল থাকবেন।

লোকটা চলে যেতেই বিজন দাঁড়িয়ে থাকল কিছু সময়। টর্চ নেভানো রয়েছে। এখান থেকে বাঁদিকের পথ মাঠে, মাঠের প্রান্তে চাঁদনির ভিটে অবধি পৌঁছে গেছে। সোজা পথ বাসস্ট্যান্ডের দিকে। বিজন ঠিক করতে পারছিল না, শেষে যখন সোজা পথে চলতে আরম্ভ করল, কালিদাস তার পথরোধ করল সামনে অন্ধকারের দেওয়াল তুলে, যাবিনে।

রটাবে।

রটাক, তাতে তোর মান বাড়বে।

না আমি ওর হাতে গিয়ে পড়ব, ব্ল্যাকমেইল করবে।

তাই বলে অমন যৈবন উচ্ছুগ্গো করতি বসে আছে সে, যাবিনে?

গৌড়েশ্বর খুব পাজি, বিপদে ফেলে দেবে।

দেবে দেবে, মেয়েমানুষের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ হয়ে যায়, আর একটু না হয় কলঙ্ক রটবে তোর, কেউ বিশ্বাস করবে কেউ করবে না।

না পারব না।

পারতি হবে তোর, বাড়ি বেচে দিচ্ছিস, আমি বেচতি দেব না।

কী করে দেবে না, তোমার কী ক্ষমতা?

ক্ষমতা! চ, চাঁদনি তোর জন্যি ওই যে মাঠে ঘুরছে, ওই দ্যাখ, একা একা তোর জন্যি, কী রকম ওর ঠমক, পাবিনে, যা!

ফণা নামানো সাপের মতো বিজন অন্ধকারে গড়িয়ে যেতে লাগল চাঁদনির দিকে। তাকে দেখে প্রায় ছুটে এল সে, দাদাবাবু! তুমি নাকি বাড়ি বেচি দিচ্ছ?

ছয়

দাদাবাবু, সত্যিই বাড়ি বেচি দিবা? চাঁদনি একা নয়, সঙ্গে দুধকুমার আর ভগবান এক যোগে বলল। তিনজনই অন্ধকারে ঘিরে রয়েছে তাকে। বোধহয় সে কখন ফিরবে তা আন্দাজ করে মাঠের অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল। বিজন হাঁটছে

দুধকুমারের ভিটের দিকে। তার পেছন পেছনে তিনজনই এক কথা বলতে বলতে আসছে। দুধকুমার বলছে, তোমার তো বেচে খাওয়ার দশা না দা'বাবু। তুমি গৌড়াকা'র ভয়ে বেচি দিবা?

কথাটা কি মিথ্যে? বিজন কি উদ্বিগ্ন হচ্ছে না? গৌড়েশ্বর ছাড়ছে না। প্রত্যেকবারই কায়দা করে রয়ে যাচ্ছে বাড়ির ভিতরে। বিজনকে এখন নতুন তালাচাবি আনতে হবে। গৌড়েশ্বর সেই তালাচাবির নাগাল পাবে না। কিন্তু তাই বা হবে কী করে, চাবিওয়ালা ডেকে যদি চাবি তৈরি করে নিয়ে ঢুকে পড়ে বাড়ি রক্ষার অজুহাতে, পারবে বিজন? আজই তো চাবি তার হাতে এসে যাওয়ার ছিল। দিচ্ছিল ও। কিন্তু ওই যে বলল, তার কাছে তো ডুপ্লিকেট চাবি আছে—

বাড়ির সামনে চেয়ার পেতে রেখেছিল চাঁদনি আগেই। বিজন সেখানে বসল। দুই পুরুষ এক রমণী তার সামনে বসে। অন্ধকারে চাঁদনির হাত বিজনের পায়ের পাতায়। হাত বুলোচ্ছে সে। তা টের কি পাচ্ছে না দুধকুমার আর ভগবান? পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে চাঁদনি বলল, বাড়ি যদি বিচেই দিবা করলে কেন?

বিজন বলল, করেছিলাম যা ভেবে, তা ঠিক হল না।

কী ঠিক হল না? চাঁদনি জিজ্ঞেস করল।

তা আমি বোঝাতে পারব না।

তখন ভগবান বলল, বোঝাও না, দেখি বুঝতি পারি কিনা।

হ্যাঁ, আমরা চাষাভুসো মেছো ছিলাম, এখন কী হয়েছি তা জানি নে, কিন্তু বুঝতি পারব না এমন ও কথা না। বিড়বিড় করে দুধকুমার বলল।

শুনে চাঁদনি বলে, তুমি এখন নেশাড়ু হয়েচ আর কী হবা?

নেশা মোর বাপ-ঠাকুদ্দাও করত, তা বলে কি তারা লাঙল ঠেলেনি নাকি জাল টানেনি?

তুমি তো ওইটেই করো।

কী করব, আমার যে ধেনো জমিও নেই, ভেড়িতি অংশ ও নেই, নেই যখন ওসব কাজ করিনে।

বিজনের বেশ সুখ হচ্ছিল। চাঁদনির হাতখানি কী নরম। পায়ের পাতা থেকে হাত ঈষৎ উপরে উঠে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। বলছে, তুমি বাড়ি বিচবা না দাদাবাবু, এত কষ্ট করে বাড়িটা করলে।

হ্যাঁ হ্যাঁ বিচ না না। বলে উঠল দুধকুমার।

ভগবান বলল, বিচা খুব সহজ দাদাবাবু, কিনতে গেলে পোঁদ ফেটে যায়। আমারও কি কম ছেল, যা বিচেছি তা কি আবার কিনতে পেরিছি, যা যায়

তা আর ফিরে আসে না।

আসে না জানি, ফিরিয়ে আনা যায় না?

ভগবান বলল, না, আমার সাইকিলটা কি ফিরানো গেল?

আর একটা সাইকেল তো কেনা যায়।

ভগবান বলল, সেটি কি আগের মতন হবে, আগের সাইকিলটার সঙ্গে আমার বুঝাপড়া ছিল দাদাবাবু, চব্বিশ ঘণ্টা, আটচল্লিশ ঘণ্টা তার উপর বসে আছি আমি, সে পড়বে না কিছুতেই, আমি বাইলেনস্ রাখব কী, সে বাইলেনস রেখে আমারে ধরে রাখত।

কথাটা বিজনের ভাল লাগল, বলল, তোমাকে আমি সাইকেল কিনে দেব ভগবান, তার সঙ্গে আস্তে আস্তে বোঝাপড়া করে নিয়ো।

ভগবান বিমর্ষ গলায় বলল, কম দিন লাগে! ধরেন যে কোঠাবাড়ি আপনি করলেন, অমন সোন্দর যে বাড়ি করলেন, তা কি একদিনে হলো, জমি দেখা পছন্দ করা, কেনা, মিউটিশন কনভারসন, ইট বালি পাথর রাজমিস্তিরি কত কিছু লাগল, কতদিন ধরে হলো, চলে গেলি আর অমনি করে পারবেন?

বিজন বলল, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দুধকুমার বলল, তোমার পাঁঠা তুমি লেজে কাটবা না ধড়ে কাটবা তা তুমিই জানো দাদাবাবু, কিন্তু কাটবা কেন?

বিজন বলল, যা ভেবে করেছিলাম তা হয় না।

কী ভেবে করেছিলে, ফেমিলি নিয়ে থাকবা তো?

ফেমিলি নিয়ে অন্য জায়গায়ও থাকা যেত।

দুধকুমার জিজ্ঞেস করে, তাহলে কেন?

বিজন বলল, বোঝাতে পারব না, বলছি ধূলিহর তো বাড়ির নাম।

হাঁ তুমার গাঁয়ের নাম দাদাবাবু, তা বলেছিলে একদিন, চাঁদনি বলল, সেই গাঁ এস জগৎপুরে ফিরাবা তাই বলেছিলে তো?

বিজন বলল, মনে রেখেছ তো, কিন্তু তা কি করা যায়?

কেন যাবে না, খুব যাবে।

তা হলে তো ষাট-বাষট্টি বছর আগে ফিরে যেতে হয়, বিজন বলে।

হুঁ, বুঝা গেল, তাই যাবে, আলাদা হবে এখেনে এসে। বলল দুধকুমার, তা হচ্ছিল না গৌড়া মণ্ডলের জন্যি, ওরে বের করি দাও, হয়ে যাবে সব, ধূলিঅর হয়ে যাবে তুমার।

না, তা হয় না, আমার বয়সই পঞ্চাশ হয়নি, ষাট-বাষট্টি বছর আগে আমি কোথায়? বলে বিজন চুপ করে থাকল।

বিজন কেন, কথাটায় বাকি তিনজনও নীরব। অন্ধকার যেন গাঢ় হলো

আরো। দুধকুমারের বউ তার পায়ের পাতায় আঙুল বোলাতে বোলাতে থেমে যায়। হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আছে তিনজনেই। কথাটা বুঝে ওঠার চেষ্টা করেও পারছে না। কিন্তু বুঝতে চাইছে খুব। না পেরে দমবন্ধ হয়ে আসছে যেন ওদের। তবু চেষ্টার কোনো বিরাম নেই। মাথার দুই রগে আঙুল চেপে ভগবান দুলছিল। চাঁদনি বিড়বিড় করছিল, আমার তো বত্তিরিশ তেত্তিরিশ হতি পারে, দু একবছর বেশি ও আমিই বা তখন কুথায়?

দুধকুমার বলল, এসব বোগাস কথা, এটা ঠিক গৌড়া মণ্ডলের বুঝান, দা'বাবু তুমি বাজে কথায় কান দিয়ো না।

ভগবান শুধু বলল, বোগাস না, গৌড়া মণ্ডল এতটা বলার হিম্মত রাখে না।

তাহলে এটা কলকেতার কথা, লোকের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এসব ভাবে, পয়সারও তো অভাব নেই। বলল দুধকুমার।

তিনজনে তিন রকম কথা বলার পর আবার চুপ। বিজন ভাবছিল উঠবে। চাঁদনি হাত সরিয়ে নিয়েছে। সে চাঁদনির দিকে তাকায়। অন্ধকার স্বচ্ছ আর তরল হয়ে এসেছে। চাঁদনির ছায়ামাখা মুখ দেখতে পাচ্ছে বিজন। সে নিশ্চুপ হয়ে ও বলতে চাইল, হাতটা সরিয়ে নিল কেন, ওই স্পর্শের জন্যই না সে বসে আছে এতসময়।

চাঁদনি বলল, বাড়ি গে ভাব তুমি, বিচার স্বভাব ভাল হয় নি, যে বিচতে আরম্ভ করে, বিচা-ঠাকরুন তারে দিয়ে সব বিচা করায়।

বেচা-ঠাকরুন কে? বিজন জিজ্ঞেস করে।

ও আছে। ওলা উঠো ঠাকরুন-এর মতো, তার শুধু ক্ষ্যায়মুযুলে স্বভাব, যা পারে বিচে খায়, আমার বাপের হয়ে ছিল, বাপেরে ঠাকরেন ধরেছিল, শেষে আমারেও বিচে দেবে ঠিক করেছিল।

বিজন বলল, এ বাড়ি আমি রাখতে পারব না।

কেন পারবা না, তুমি না পুরুষমানুষ!

বিজন বলল, পুরুষমানুষের মায়া কম হয়, আমি যে বললাম বেচে দেব, আমার তাতে কষ্ট হচ্ছে না তো!

দুধকুমার বলল, ওইটি মানেই বেচারামি ঠাইরেন তুমারে ধরেছে দা'বাবু, আমাদের মায়া বসে গেছে, আমার বউ পর্যন্ত সন্ধেয় ও বাড়ির দিকে তাকিয়ে পিদ্দিম দেখায়, পেত্যেক দিন যখন হয় একবার গিয়ে বাড়িটা ছুঁয়ে আসে।

বাড়ি তো থাকছে।

না থাকবে না, তুমি না থাকলি ও কোঠাবাড়ির মানে কী? দুধকুমার বলল, তুমি থাকলি ও কোঠাবাড়ি আমাদের নিজিদের মনে হয় দাদাবাবু, অন্য লোকের

হাতে গেলি তা আর মনে হবে না।

চাঁদনি ফোঁস করে উঠল, বিচো না বাড়ি, আমি সাঁজবেলা ওদিকি তাকায়ে থুক্ করব, লাথি দেখাব, মনে মনে গালি দেব।

দুধকুমার বলল, আমি আর ভগবান তো ছনছন করে আসব ও বাড়ির গায়ে পেত্যেক দিন।

বিজন বলল, ওটা ঠিক না, যে নেবে সে আমার চেয়ে ভাল হতে পারে, সন্ন্যাসীর মতো দেবতার মতো হতে পারে।

ছাই! তুমি আমাদের শিব ঠাকুর। বলল দুধকুমার।

চাঁদনি চাপা গলায় বলল, হাঁ হাঁ, আমি তোমারে মনে মনে জল মিষ্টি দিই পেত্যেক দিন।

বিজন বলল, আমি তো ঠাকুরদেবতার মতো কিছু করিনি।

ঠাকুরদেবতা করে কী? ফস করে জিজ্ঞেস করল দুধকুমার।

মানুষের মঙ্গল।

মানুষের মঙ্গল হচ্ছে? মঙ্গল হচ্ছে তো গৌড়াকা'র, কিন্তু ওকি মানুষ! ও যে ঢুকে পড়ল বাড়িতে।

দুধকুমার বলল, ঘাড় ধরে বের করে দাও, আমরা ও বাড়ির দেখাশোনা করি, এরপর তো দোতলা হবে, আমি কনটাক নেব, আমরা তিনজনে মিলে করে দেব, গৌড়ারে ঢুকতি দেব না, তুমি বিচা-ঠাকরুনের খপ্পরে পোড়ো না।

বিজন ভাবছিল সে কোন ঘোরের ভিতর যে জগৎপুরে এসে পড়েছিল। সে আর ইরফান। ইরফান এসে ফিরে গেল, তার জমিও বেচে দিল। যাকে বেচেছে সে নাকি বলছে, দিন যাক, দাম বাড়ুক, তখন আবার সেও বেচে দেবে। জগৎপুরে নাকি অনেক বড় বড় মানুষের মানে কলকাতার বাবুদের কেনা জমি আছে। পিলার লাগিয়ে কেউ, কেউবা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলে রেখেছে জমি। তারা কি এদিকে আসবে বসবাস করতে? বসবাস করবে কেন এখানে? কলকাতা, সল্টলেক সিটিতে নিশ্চিন্ত বসবাসে আছে তারা। তাহলে তারা জগৎপুরে এল কেন জমি কিনতে? কিনে রাখল, এখন মাটি তো সোনা। দিনদিন দাম বাড়ছে। জমি কোথায়? এরপরে রাস্তা ব্যতীত মানুষের হেঁটে চলে বেড়ানোর জায়গাও থাকবে না। তারা সব কিনে রেখেছে, দরকার না হলে হস্তান্তর করে দেবে। ব্যাঙ্কে অত টাকা বাড়ে না যেভাবে বাড়ে জমিতে। কিন্তু বিজন তো তা করতে আসে নি এখানে। এত বয়স ধরে জমি বাড়ির ধারে কাছে না থেকে, পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে কিনা জমি কেনাবেচায় নামবে? তা হতে পারে? তাহলে তো আর রবীন্দ্রনাথর গান শোনা, কবিতা লেখার গোপন প্রচেষ্টা, কোথাও গুলি চললে তার বিপক্ষে গলা ফাটানো ব্যর্থ হয়ে

যাবে। ব্যর্থ হয়ে যাবে কোনো চেনা মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়লে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। বিজন বলল, এ বাড়ি আর ভাল লাগছে না দুধকুমার।

ভাল লাগবে দা'বাবু, বাড়ির ভিতরে বসে গৌড়া মণ্ডল বসে ঠ্যাং নাচালে কার ভাল লাগে বলো।

এ জায়গাও আর আগের মতো লাগছে না দুধকুমার।

লাগবে কী করে, যদি দ্যাখো ওই হারামি তার নাতি নিয়ে আদিখ্যেতা করচে তুমার খাট-বিছানায় বসে।

না না, তা নয়, আমার বাড়ি থেকে কেউ আসতে চাইছে না।

চাইবে না তো, মণ্ডলের নাতি দেয়ালে খারাপ কথা লিখেচে পেনসিলে তা দেখেচ?

সে তো মুছে দিয়েছে।

লিখবে কেন, ঐটা কি পাবলিকের পিচ্ছাপখানা যে যা পারে লিখবে, ও দেওয়াল কি মণ্ডলের বাপের সম্পত্তি? কিন্তু আর একটা খবর তো তুমি জানো না দা'বাবু।

বিজন অবাক, জিজ্ঞেস করল, কী খবর?

দুধকুমার বলল, তুমার দেয়ালে ন্যাংটো মেয়েছেলের ছবিঅলা ক্যালেন্ডার লাগিয়েছিল গৌড়া কা', তা তুমি জান?

বিজন বলল, কই কবে?

এখনো রাতি টাঙায় হারামিটা, আমি জানি।

তুমি আর কী জানো দুধকুমার?

তুমার দেয়াল নষ্ট করে ও পেত্যেক দিন।

তুমি রাত্তিরে যাও ও বাড়িতে?

যাই। শালা একদিন আমারে বলে ও বাড়ি ওর।

বিজন গর গর করে উঠল, তারপর নিভেও গেল আগুনের ফুলকি যেমন নেভে, বলল, ওই জন্য তো বাড়ি রাখব না।

চোরের উপর রাগ করে মাটিতি ভাত খাওয়া, বের করে আমার হাতে দ্যাও, আমি রামকিষনো ঠাকুর, যিশু ঠাকুর, মা কালী মা দুগ্গা আর শিবঠাকুরের ক্যালেন্ডার লাগিয়ে দেব দা'বাবু?

বিজন বলল, এই জন্যে তো মায়া চলে গেছে দুধকুমার।

মায়া গেলি হলো, আমরা কেউ না, আমরা তিনটে পেরানী তুমার দিকে চেয়ে থাকি, তা কি তুমি জানো না?

বিজন বলল, আমি তোমাদের কিছুই তো করিনি।

করবা কী, আমরা তো আশায় আছি, তুমার দালান আমরা দেখাশুনো করব,

চাঁদনি তুমারে কী ভক্তি করে, কাকা জেঠা, বড়োদাদার মতো দ্যাখো।

চাঁদনি বলল, হ্যাঁ দাদাবাবু, তুমি যদি চলি যাও বাড়ি বিচে আমি অনাথ হই যাব, আমার কপাল এই রকম।

দ্যাখেন দিনি দাদা, ওরে দেখলি আপনার মায়া হয় না? ভগবান বলল।

বিজন বলল, ষাট বছর আগের ধূলিহর আমি ভোগ করব কী করে, তাই হয়নি।

ওডা কথার কথা দা'বাবু, তুমি আসলে গৌড়াকা'রে ভয় করো।

কেন ভয় করব?

সে তুমি জান, হারামি তোমাকে নাচাচ্চে, তোমার বাড়ি ওঠার সময়ে বহুৎ টাকা ঝেড়েচে, কেন বলো দেখি তুমি চুপ করে থাকো?

বলতে পারব না দুধকুমার।

আমি তো জানি তুমি একটা দেবতুল্য মানুষ, চাঁদের কলঙ্ক আছে তুমার নেই, চাঁদনি তা আমারে বলেচে, তবু কিনা তুমি ওই হারামির হাতে নাচচ, দা'বাবু একবার আমাদের সুযোগ দাও।

তখন চাঁদনি বলল, তুমরা যাও দেখি, আমি দাদাবাবুরে বুঝাই, দাদাবাবু তুমারে সেবা করি, তুমি একটু থাকো।

বিজন বলল, না না আমি এবার যাব।

চাঁদনি চাপা গলায় বলল, দাদাবাবু, তুমি আমার শিবঠাকুর, তুমার পায়ে ফুল দেব দাদাবাবু, আমারে পুণ্যি করতি দাও।

হাঁ দাও দাদাবাবু, ভগবান বলল, আমরাও পুণ্যি করি।

তখন চাঁদনি বলল, যাও না, কোলড্রিং নিয়ে এস, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে? বাড়িটায় খুব লোভ কিন্তু লোকটার ভালমন্দ দেখবা না।

বিজন বলল, না চাঁদনি আমি এবার যাব।

যাবা কেন, এতটা হাঁটবা কেন, এই তুমরা টেসকি ডেকে আনো সললেক থেকে, দাদাবাবু টেসকিতে যাবে, যাও না, যা বলি বুঝতি পার না, কানে কালা নাকি মাথায় ঘিলু নেই।

মুহূর্তে ভগবান আর দুধকুমার দৌড় দিল অন্ধকারে। আর বিজন একা বসে থাকল চেয়ারে। তার সামনে অন্ধকারের অবয়ব নিয়ে চাঁদনি। চাঁদনি বলল, ওরা জানে দাদাবাবু ধুয়া তুলসিপাতা, দাদাবাবু কোনোদিন মেয়েমানুষের দিকে ফিরে তাকায় না।

বিজন বলল, ওরা কি গাধা! আমি যাব এখন।

উঠে দাঁড়ানো বিজনকে চেপে বসিয়ে দিয়ে চাঁদনি বলল, না যাবা না, কুথায় যাবা দাদাবাবু, তুমি আমার সম্পুত্তি, আমি তুমারে যেতি দিলি তো যাবা,

আজ তুমারে নে আমি শোব।

বিজন কুঁকড়ে যায়। এ কার সামনে দাঁড়িয়ে সে? গরগর করছে সেই নরম মেয়েমানুষটি যাকে সে আদর করেছিল স্নেহ ভরে, কামনা ভরে। তার হাত ধরে ফেলেছে চাঁদনি, বলল, বাড়ি বিচে কেটে পড়বা দাদাবাবু, আমি কুথায় যাব?

তোরে টাকা দিয়ে যাব।

টাকায় সব হবে?

আমি এ ছাড়া কী করতে পারি বল।

বাড়ি রেখে দেবা, বাড়িতে মোরে তুলবা, ও কোঠাবাড়ি আমার বাড়ি যেমন তুমি আমার।

বিজন বলল, পরে হবে, আমি যাব এবার।

ওরা টেসকি আনবে, এই বুকে হাত দ্যাও দেখি, বুঝবা চাঁদনির কত কষ্ট, বাড়ি তুমার বিচা হবে না'

পরে কথা হবে।

না পরে না, এখন বলো, আমার তো সব নিয়েছো দাদাবাবু, তারপরেও ওরা জানে তুমি দেবতা, আমি ছাড়ব না।

চাঁদনি আমি তোমারে পুযিয়ে দেব।

কী পোযাবা পুরুষমানুয, ওটা পুষানো যায়, তুমার টাকায় আমি থুক করি, আমি বাড়ি বিচতে দেব না, এই বলে রাখলাম, শুনতি পাচ্ছ বিজন, আমি তোমার বে করা বউ-এর চেয়ে বেশি, আমার যৈবন তার চেয়ে বেশি, বুঝলে কত্তাবাবু!

সাত

নাগিনী চিনত না বিজন। নাগিনীর মুখোমুখি হয়নি কখনো সে। এখন স্থির হয়ে বসে তার হিস হিস শুনতে শুনতে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। কোথায় কালিদাস বোস। তার প্রতি ঘেন্না হচ্ছে বিজনের। এ কী করল সে? এখন বেরোবে কী করে এই অন্ধকার থেকে?

অনেক সময় উদ্ধত ফণা দুলিয়ে সাময়িক স্তব্ধ হয়েছে চাঁদনি। বিজনের সামনে, খুব কাছে এসে তার উপরে গরম নিঃশ্বাস ফেলছে। বিজনের জবাব শুনতে চাইছে। বিজন কী বলবে, তার মুখে কোনো কথা জোগাচ্ছে না। চাঁদনি তার হাত বাড়িয়ে দিল বিজনের মাথার উপর। চুলে বিলি কাটতে লাগল একটু ঝুঁকে, নিম্নস্বরে বলল, রাগ করলে তুমি?

বিজন কোনোরকমে বলল, হাতটা সরা।

না সরাব না, তুমি আমার, আমি যা করব তোমাকে তা সহ্য করতে হবে।

বিজন বলল, আমি নিরুপায়, আমি পারব না।

কী পারবা না?

সরে যা, আমি এ বাড়ি রাখতে পারব না।

তুমি আমার দিকে তাকাও কত্তামশাই।

বিজন মাথা নিচু করে থাকল। তার মাথাটা ঝপ করে তুলে দেয় দুধকুমারের বউ, বলল, তুমি কি ভেবেছ আমি তুমার বাড়ির লোভ করি।

বিজন বলল, জানি না।

জানিনার কী মানে, হয় হ্যাঁ বলো না হয়, না বলো।

বিজন চুপ করে থাকে।

না আমি করিনে, কিন্তু আমার লোভ তুমার উপর।

শিহরিত হলো, কেঁপে উঠল বিজন, বলল, আমি তো বুড়ো হয়ে যাব ক'দিন বাদে।

তাতে কী হলো, আমিও তো বুড়ি হয়ে যাব।

তার অনেক দেরি।

তুমি চলে গেলে কালই আমি বুড়ি হয়ে যাব কত্তা, তুমি আমার যৈবন কাঠি, তুমার ছুঁয়ায় আমার যৈবন থাকপে।

বিজন মাথা তুলে চাঁদনির চোখে চোখ ফেলে বলল, আমি তোরে কী দিলাম যে এমন কথা বলিস!

তুমি আমারে যা দেছ ও মর্কট দুটো তা দেয়নি, দুটাই শয়তান, ওরা আমারে দিয়ে তুমার বাড়ি দখল করতি চায়।

জানি, তাহলে না বেচে কী করব?

বিচলে আমি কুথায় যাব কত্তা, তুমি কি বোঝো না দুটো লোক আমারে কী ভাবে রেখেছে এখেনে।

বিজন বলল, বাড়ি তো দখল করে নেবে, তখন?

চাঁদনি বলল, পারবে নি, ওরা ঘুর ঘুর করবে, পারবে নি।

কিন্তু গৌড়েশ্বর যে বেরোয় না।

না বেরোক, তুমার বাড়ি তুমার, সে তো রক্ষে করছে বটে।

বিজন বলল, তুই কার পক্ষে চাঁদনি?

চাঁদনি ঝুঁকে পড়ে বিজনের গালে ঠোঁট ঘষে দিয়ে বলল, তুমার পক্ষে, বাড়িটা করলে, বিচে দিলে তুমি আর আসবে নি হেথায়, আমি গলায় দড়ি দেব।

এ কী বলিস?

তাই দেব তাই দেব, তুমি আমার কত্তা, তুমি না থাকলি আমি কী নে বাঁচব জগতে, আমারে কেউ দ্যাখে না, কেউ ভালবাসে না কত্তা।

বিজন বলল, ঠিক আছে যেতে দে এখন।

যদি বাড়ি বেচো আমি তুমার বাড়ি চলে যাব, আমারে বারো মাসের ঝি করে রেখে দিও, তাও থাকব কত্তামশায়।

বিজন বলল, তা কি হয়?

তাহলে আলাদা ঘর দেখে আমারে রেখে দিও, তুমি তা পারবা।

বিজন বলল, আমার সে ক্ষমতা নেই।

ক্ষমতা না সাহস? আবার তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল চাঁদনি।

আমারে এখন যেতে দে, ভাবি আমি।

যা ভাবনা ভেব, কিন্তু আমি যা বললাম ওইটা সত্য, মরার আগে লিখে যাব তুমি দায়ী, সেই কাগজ নে ওই হারামি দুটো তোমার কাছে যাবে, সে ভাল হবে?

বিজন উঠে দাঁড়াল, বলল, এখনই তো বিক্রি হচ্ছে না।

আমি সব খদ্দের ভাগিয়ে দেব।

বিজন বলল, তাই করিস, এখন আমি যাব।

চলে যাবা, ওরা যে টেস্কি আনতে গেল।

ওরা আসবে না, ধারেকাছে অন্ধকারে বসে আছে।

আর একটু বসা যাবে না কত্তা! চাঁদনি অনুনয় করল।

না আমার আর ভাল লাগছে না।

আমারে ভাল লাগছে নি কত্তা?

বিজন বলল, বাড়িটা করে আমি নিজের সব্বোনাশ ডেকে এনেছি।

আনবাই তো, কে তুমারে ধূলিয়ারে ফিরতি বলেছিল! অন্ধকারে চাঁদনির গলায় আর কেউ যেন কথা বলল। বিজন চমকে উঠল। বুঝতে চেষ্টা কবল ওই কথার উৎস কোথায় বোঝা গেল না।

চাঁদনি আবার বলল, ধূলিয়ার এমন হবে জেনেই তো এয়েচিলে।

জানতাম না, আমি দুগ্গাদাসের নাতি।

নাতিটাতি বাদ দ্যাও, তুমার ভিতরে অনেক দিনের উপোস ছিল গো, তুমি উপোসী বাঘ গো, তা আমি পেত্থম দিনে দেখেই বুঝেছি, দেখেই আমার ভিতরের রক্ত চলকে উঠেছিল, টের পেয়েছিলাম এ আমার জন্যি এয়েচে, ভগবান পাঠালেন, আমি তুমার জন্যিই বসেছিলাম গো, জানতাম ভগবান কাউরে একেবারে মারেন না, সবার জন্যি সব আছে।

বিজন বলল, হয়েছে আমি এবার যাই।

তুমার খিদের মুখে আমি অন্ন দিই নাই কত্তা? জিজ্ঞেস করতে করতে তার বুকের উপর শিকড় ছেঁড়া গাছের মতো ভেঙে পড়ল দুধকুমারের বউ।

বিজন কেঁপে উঠল। দুহাতে ধরল তার দুই কাঁধ, বলল, শান্ত হও।

না হব না, আমি তুমার কাছে থাকতি চাই।

আমি তো আছি।

না তুমি নেই, তুমি বাড়ি বিচে দিয়ে পালাবা, আমি এ যৈবন কেন তুমারে উচ্ছুগ্‌গো করেছি তা তুমি জান না, আমি কুথায় যাব?

বিজন বলল, আচ্ছা তোমার কথা থাকবে।

কী থাকবে?

তোমার ইচ্ছেই থাকবে।

বাড়ি বিচা হবে না? বিজন দুহাতে জাপটে ধরে জিজ্ঞেস করল চাঁদনি।

বিজন বলল, না, না।

সত্যি বলছ তুমি?

হ্যাঁ, তুমি একটু শান্ত হও, তোমার জন্য বাড়ি থাকবে।

শুনে বিজনের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে চুমু দিয়ে চাঁদনি বলল, আমারে তুমি তুইতোকারি করলে ভাল লাগে কত্তা, মনে হয় ওর চেয়ে ভালবাসার ডাক হয় না! তাহলি বাড়ি থাকবে?

হ্যাঁ থাকবে।

আহ্, তুমার এই কথা শুনে আমার ভিতরে বিষ্টি হতি লেগেছে কত্তা, বিষ্টিতে আমি ভিজে গেলাম গো, ওফ তুমি যে কী মানুষ! আমি তুমার কাছে কী চেয়েছি বলো, শাড়ি গয়না টাকা?

না, কোনো দিন না।

আমি কি বলেচি তুমার বাড়ি লিখে দিতে?

না।

যেদিন বলব সেদিন লাথি মেরে চাঁদনিরে দূর করে দিয়ো, আমি শুধু তুমারে চাই কত্তা, তুমার গলা শুনলি আমি যে কী হয়ে যাই, আমার সব্বো অঙ্গ কাঁপতি থাকে, এই দ্যাখো তুমি, বুকে হাত দাও, দ্যাখো কীর'ম শক্ত হয়ে গেছে।

বিজন আর পারে না। কোথায় ঁকালিদাস বোস, সেই কামুক চরিত্রহীন পূর্বপুরুষ? তার দেখা নেই। তার গলার স্বরও নেই কানের কাছে। অথচ সে কিনা চাঁদনির দু বাহুতে আটকা পড়ে আছে। চাঁদনি তাকে ছাড়বে না, কিন্তু সেও ছিটকে বেরোতে পারছে না। কী সর্বনাশা ঘোরের ভিতরে পড়ল সে।

এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। চাঁদনি তাকে ছেড়ে দিল, নরম গলায় বলল, দুটা চুমা দিয়ে যাও কত্তামশায়।

বিজন ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে যেতে সে তার মাথাটি দুই স্তনের অন্তর্বর্তী উপত্যকায় চেপে ধরল এক ঝটকায়, জড়ানো গলায় বলল, এখানে চুমা দাও, দাঁত বসায়ে দাও দু'বুকে, দাগ করে দাও।

বিজন ঠোঁট চেপে ধরেই মুখ তুলে আনল, বলল, তোর দুই পুরুষ দেখে ফেলবে।

দেখতি বয়ে গেছে তাদের, ওরা খালপাড়ে একটা মাগীর খোঁজ পেয়েচে, সেখেনে যায়, আমারে ছুঁয়ে দ্যাখে না।

বিজন বলল, তাহলে রেখেছে কেন?

রেখেচে, রাখতি হয় রেখেচে, তুমার জন্যি রেখেচে।

দুধকুমার যে পাগল হয়ে আমাকে বলত তোকে ফিরিয়ে আনার কথা?

বুঝিনে বাবু, পুরুষমানষের কথা কিছুতেই বুঝা যায় না।

ভগবান?

ওই এক কথা বাবু, এক একদিন সেও যে চায় না তা নয়, কিন্তু খালপাড়ে সেও যায়।

বিজন বলল, দুজনকে নিয়ে তোর কষ্ট হয় না?

আমি তো তুমারে নিয়ে থাকি কত্তা, মনে মনে তুমিই থাক সঙ্গে।

আমি তাহলে যাই?

যাও, চলো আমি তুমারে এগিয়ে আসি।

না, আমার টর্চ আছে সঙ্গে।

যাব না বলচ?

হ্যাঁ, ঘরে থাক, তুই কেন যাবি, একা তো ফিরতে হবে।

যাও তবে, সাবধানে যেও, ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করো, ঠিক মতো ঘুমায়ো কত্তা, আমার কথা মনে করো না বেশি,আমি তুমার আছি, ভগবান আর দুধকুমার আমার কেউ না।

বিজন বলল, তাহলে যাই।

হ্যাঁ এস। বলে তার হাতটা ধরে নিজের মুখের উপর চেপে ধরল দুধকুমারের বউ, চোখ ভর্তি জল। জড়ানো গলায় বলতে লাগল, আমি তো গাঙে ভাসা মানষির মতো, আমি কুথায় গে ঠেকব নিজিই জানতাম না, তুমি কতবড় মানুষ কত্তা, কী সোন্দর তুমার দালানখানি, কী সোন্দর তুমার বুকখানি, মাথা রেখে কত নিশ্চিন্ত! গাঙে, তুমি একখান বড় নাও।

বিজন বলল, শান্ত হয়ে থাকিস।

থাকব, এস এবার।

বিজন এগোতেই অন্ধকারে সে ছুটে এসে পিছন থেকে তাকে আঁকড়ে ধরল, ওফ! তুমারে ছাড়ি কী করে কত্তা, আদর করে যাও, না হলি আমি মরে যাব কত্তা।

আজ আর না, রাত হয়েছে।

কী যেন ভাবল সে, বলল, আচ্ছা যাও।

বিজন দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল। ভেড়ির ধারে উঠে হন হন করে এগোতে লাগল। সাড়ে আট। যদি বাস না পায়? ট্যাক্সি অবশ্য মিলবে। টর্চের আলোয় অন্ধকারে ছোবল মারতে মারতে বিজন ধূলিহর থেকে কলকাতার দিকে যেতে লাগল। তখন তার পিছনে ঁকালিদাস বোসের সাড়া পেল, এ কী করলি?

কী করলাম? বিজন অন্ধকারের দিকে তাকায়।

মাগীর কথায় সিদ্ধান্ত বদল করলি?

ঠাকুদ্দা তুমি যাও।

যাব, কিন্তু মেয়েমানুষের কথায় পুরুষমানুষ নিজের মত বদলে ফেলে?

আমাকে একা থাকতে দাও।

একাই তো থাকবি, তুই ওর কথাতে বাড়ি রেখে দিলি?

তাতে কী হলো, বাড়ি তো থাকবে, তুমি খুশি তো।

মোটেই না, ও এবার বাড়িও নিয়ে নেবে। খুনখুনে গলায় ঁকালিদাস বলল, মেয়েমানুষের কথায় যে পুরুষমানুষ গলে মাটি হয়ে যায়, সে আবার পুরুষমানুষ! তোর জন্যি আমার কষ্ট হচ্ছে, তোর ঠাকুদ্দা এমনি ছিল।

আহ্! তুমি যাবে কি না বলো।

যাব, কিন্তু এটা কি তোর শেষ মেয়েমানুষ?

তার মানে?

এতেই তোর দম ফুরিয়ে গেল, ভোগ করবি ছাড়বি, ঠিক পথে যাচ্ছিলি, কিন্তু এটা কী করলি, চোখের জলে ভুলে গেলি!

বিজন নিশ্চুপ হয়ে হাঁটছিল। তার সঙ্গে ছায়ার মতো ঁকালিদাস বোস চলছিল। ঁকালিদাস ফিসফিস করছিল, গৌড়ার ছেলের বউটা, ওই যে সারা না সরস্বতী, তারে দেখিস নি?

তুমি তোমার মতো গলে পচে মরতে বল আমারে? বিজন ভর্ৎসনা করে ওঠে, আমি কি তোমার মতো ভাব?

ভেবেছিলাম, এখন দেখছি সব ভুল, তোর ঠাকুদ্দা জিতে গেল।

আমার ঠাকুদ্দা? তার নাম আনো কোন মুখে?

একেবারে দুগ্গাদাস।

খবদ্দার, তুমি সরে যাও।

তুই এটা গোপন রাখবি, না তোর বউ জানবে?

বিজন আর কথা বলছিল না। কিন্তু কালিদাস বলে যাচ্ছিল। বলছিল, এরে বলে প্রবঞ্চক। এরে বলে ঠগ। এ কাজ সে জীবনে করেনি। এমনভাবে ভোগ করেছে যে সে মেয়েমানুষ টের পেয়েছে সে আসলে ভোগেরই সামগ্রী। তার বেশি কিছু নয়। সে নিজেও ভোগ করেছে তাকেও ভোগ করতে দিয়েছে। আর কেউ কেউ বিনিময়ে কিছু পেয়ে বুঝে গেছে ওইটিই তার প্রাপ্য। দাম। কেউ ভালবাসা নিবেদন করার সাহস পায়নি। ভালবাসাই যদি হবে তো দশটাকে ভোগ করবে কী করে পুরুষমানুষ। আর ভালবাসলে তো জ্বলেপুড়ে মরতে হয়। যেমন মরেছিল দুর্গাদাস আর সেই জন। কেউ জানত না কিন্তু তা হয়েছিল। বিজন সেই রাস্তায় হেঁটেছে। বাঘ হয়ে হরিণকে ভালবাসা যায়? ও মেয়ে তো অভাবে তোরে ধরেছে।

শুনতে শুনতে বিজনের ঘাড় ঝুলে পড়ছিল। কালিদাস সত্য বলছে কি? তার ঠাকুর্দা দানশীল মানুষ ছিলেন, মায়ামমতায় ভরা ছিল তাঁর মন। সেই মানুষের জীবনে অন্য এক নারী ছিল! হতে পারে তা? তাহলে তা কেউ জানত না? জানত কিন্তু কেউ উচ্চারণ করত না। তাতে দুর্গাদাস শুধু কষ্টই পেয়েছে। নিজের জন্য, নিজের গুণবতী বউ-এর জন্য আর সেই রূপবতীর জন্য। দুর্গাদাসের গুণবতী মায়াবতী বউটিও কষ্ট পেয়েছে আন্দাজ করে করে। আর সেই নারী তো কিছু না পেয়ে পেয়ে—। এর মানে কী? এসব সম্পর্ক গড়া কেন? যে সম্পর্ক এগোয় না সে সম্পর্ক না হওয়াই তো ভাল। না গড়াই তো মঙ্গল।

তুমি কী বলছ ধরা যাচ্ছে না।

তুই ও মাগীর সঙ্গে কী সম্পর্ক গড়েছিস?

ও আমারে ভালবাসে ঠাকুদ্দা।

খি খি করে হাসল কালিদাস, বলল, ও দুটো পুরুষের সঙ্গে শুতে বাধ্য, তারপর তোর প্রেমে পড়ল! পেটের ভাত আর লোভের জন্য তোরে ভালবাসল!

ঠাকুদ্দা এ নিয়ে কথা বলো না।

ও মাগী তোরে ভালবাসতি যাবে কেন, কোন দুঃখে, বাড়িটার দখল ও নেবেই, গেলি ওরে ভোগ করতে, আর পড়লি প্রেমে, এখন তোর বউকে বলতে পারবি তুই আর একজনকে ভালবাসিস?

বিজন চুপ করে থাকে। কী করে বলবে সে কবিতাকে। তাকে কি সে ভালবাসে না। কবিতা তার বোনের বাড়ি বাপের বাড়ি দুদিন গিয়ে থাকলে

সে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে না মনে মনে? চোখের আড়াল হলে উতলা হয়ে ওঠে না কি? এর নাম কি ভালাবাসা? বুঝতে পারে না বিজন। তবে বুঝেছে ওই দুধকুমারের বউ-এর যে টান সে টান কবিতার ভিতর নেই। যেন কোনোদিনই ছিল না। এখন তেমন মনে হয়। এর মানে কি কবিতাকে সে ভালবাসে না? শরীরে শরীর লাগে না কত বছর! বেশ ছিল তাতেই। শরীর কোনো দাবিই করত না। মরে গিয়েছিল শরীর। কবিতারও আগ্রহ বিশেষ ছিল না। নেই এখনো। সেই মরা শরীর জাগিয়ে তুলল ওই চাঁদনি। যেদিন দুধকুমারের সঙ্গে ওকে ফিরিয়ে আনতে গেল ভোজেরহাটে ভগবান মণ্ডলের বাড়ি, যেদিন চোখে চোখ মিলল, সেদিনই জাগল এই ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। বিজন বলল, কবিতা থাকুক তার মতো, এ থাকুক এর মতো।

কবিতা টের পেয়ে যাবে।

কী করে টের পাবে?

মেয়েরা টের পায়, দুগ্গাদাস অত লুকিয়েও লুকোতে পারেনি, তার চোখ দেখেই ধরে ফেলেছিল বউ, তোর ঠাকমা, দুঃখ পেয়েছিল, দুঃখ ধারণ করে বাকি জীবন কাটাল, তুই না বললেও তোর বউ বুঝে ফেলবে, দরকারে তুই ঘুমঘোরে বলে দিবি সব, তখন কী হবে রে?

তাহলে আমি কী করব ঠাকুদ্দা?

কালিদাস বলল, মাগীরে হটা, বলবি ভোগের জন্য গিয়েছিলি, ভাল ভোগ করেছিস, তার দাম হাতে তুলে দিবি, বেশি কথা বললে পাঁচকান করতে এলে তোর বউকে জানাতে চাইলে সব অস্বীকার করবি, বলবি টাকা খেঁচার জন্য ওসব বলছে, বাড়ির উপর লোভের জন্য...... শোন, মিথ্যের চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই।

আট

ঁকালিদাস বোস তাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিল। বাসে তার পাশে বসে তার কানে গুন গুন করতে লাগল। বাস থেকে নেমে তাকে বোঝাতে বোঝাতে দরজা অবধি এল। বিজন যখন তাকে বিদায় দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটের ডোরবেলের সুইচে আঙুল রাখল, তখন বুঝল ঁকালিদাস বোস—তার ছোটঠাকুদ্দা তার উপকার করেছে। দুধকুমারের বউ প্রেমের ভান করলেও তার তাতে সায় দেওয়া ঠিক হয়নি। তার ভিতরে ঘুমন্ত আগুন ছিল, তা খুঁচিয়ে দিয়েছিল ওই মেয়েই। তাতে ভোগ যা হয়েছে দু'জনের হয়েছে। উপোস কি শুধু তার ছিল, ওর ছিল না? ওই ভগবান আর দুধকুমারে কি তার খিদে মিটত? মনেই ধরেনি

ওই মর্কট দুটোর কাউকে। উপায় নেই তাই ধরে আছে। ভগবানের কাছে যেতে দিয়ে, দুধকুমার কি কিছু পায়নি? আবার ফিরিয়ে এনে ওকি গুনাগার দিতে হচ্ছে না দুধকুমারকে? ভগবান তো ছাড়ছে না জগৎপুর।

সে কবিতাকে বলল, আলটিমেটাম দিয়ে এলাম।

সে তো প্রত্যেকবার দিচ্ছ।

না ও, বাড়ি আমি রাখব না।

কবিতা চুপ করে থাকল কিছু সময়, তারপর বিড়বিড় করে বলল, পারবে তো, কষ্ট করে করেছ।

ও বাড়ি থাকবে না কবিতা।

থাকবে না না, তবে সমস্যা হবে।

আমার আর জগৎপুরে মন বসছে না।

ওখানে না থাকলে মন বসবে কী করে?

তুমি চাও ও বাড়ি থাকুক!

কবিতা হাসে, বলে, আমি কিছুই চাই না, এখেনেই আমার চলে যাবে, তুমি কী চাও তা ভেবে দ্যাখো।

কথাটায় বিজন একটু ধন্দে পড়ল। তাহলে ঁকালিদাস বোসের কথা কি সত্য হতে আরম্ভ করল? গায়ে চাঁদনির গন্ধ পেল তার বউ কবিতা? সে একটু গুটিয়ে গেল, বলল, বাড়ি নিয়ে অত টেনশন চলে না, তুমি তো যাবে না।

নিয়ে গেলে যাব, তুমিই বা কি যাবে?

বিজন চুপ করে থাকে। সে যদিও যেত, আর কি পারবে? দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে দুধকুমারের বউ। বেঁচে থাকার জন্য বিজনকে তার চাই। দুচোখে কী প্রেমের আকুলতা! তার চেয়ে অন্তত বিশ বছরের ছোট, তাকেই আঁকড়ে ধরল শেষ পর্যন্ত! কিন্তু ওই মেয়ে যদি এই শহরে আসে, বিজন ওর দিকে তাকাতে পারবে? বন্যেরা বনে সুন্দর—যাট বছর আগের জগতের এক টুকরো পড়ে আছে, ওর কথা ভুলে গেছে সবাই।

সবাই কারা?

যারা দেশ গড়ে, যেমন মন্ত্রী, আমলা, রাজনৈতিক নেতা—সবাই ভুলে গেছে ও জায়গার কথা, আমি গিয়ে ধাক্কা মারতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছি।

গৌড়েশ্বর রাজি? কবিতা জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ রাজি।

দুধকুমার, তার বউ?

বিজন ঢোক গিলল, ওরা কে যে রাজি হবে না, হবে বলে ভাবতে হবে।

তাহলে তোমার গৌড়েশ্বরই বা কে?

ও তো বাড়িতে ঢুকে রয়েছে।

কোন অধিকারে?

কবিতার কণ্ঠস্বরে, বলার ভঙ্গিমায় বিজন অবাক হলো। তাহলে কি সব জেনে গেল কবিতা? তার মাথা নিচু হয়ে গেল। ইস! তাকাতে পারছে না সে। বলা যায় না। ষাট বছর আগের মানুষ যেভাবে কথা বলত সে ভাবেই ওরা মানে দুধকুমার, ভগবান আর চাঁদনি টেলিফোনে কি সব বলে দিল কবিতাকে। সে চলে আসার পর চাঁদনি হয়ত ভেবেছে শেষ অবধি দাদাবাবু চলেই গেল! বিজন বলল, ঢুকে তো আগেই পড়েছিল।

ওই দালালটা কে, ও তো চোর, তোমার সিমেন্ট চুরি করে ওর বাথরুম তৈরি করেছিল মনে নেই?

হ্যাঁ, কিন্তু ও স্বীকার করেনি।

স্বীকার করে তো মূর্খ, স্বীকার করেনি তাই মিথ্যেটা সত্যি হয়ে যাবে?

না তা কেন হবে, কিন্তু ভালয় ভালয় বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেলে বাঁচি, আমরা ওখানে থাকি না, বাড়িটা পড়ে আছে, ওর কথা শুনতেই হবে, আজ বের করে দিতে দিতেও দিলাম না।

কবিতা বলল, দুধকুমারকে দিয়ে পাহারা দেওয়াতে পারতে।

ও-ও তো লোভী।

লোভ কার না থাকে, তবে তোমার গৌড়েশ্বরের মতো নয়।

তা নয়, তবে বাড়িতে বসে নেশা করত আরামে।

বারণ করে দিতে, করত না।

বাড়ি তো বিক্রিই হয়ে যাচ্ছে, আর ঝামেলায় দরকার নেই।

দুধকুমার ফোন করেছিল, তুমি গৌড়েশ্বরকে খদ্দের দেখতে বলেছ।

হ্যাঁ, দুধকুমারও দেখবে বলেছে।

উঁহু, গৌড়েশ্বর বলেছে দুধকুমারের খদ্দেরকে ও বাড়ি দেখাবে না, চাবি ওর কাছে, বাড়ি ওর।

এসব কখন হলো?

এই তো কিছু সময় আগে।

আমি তো জানি না।

তুমি জানবে কী করে, তোমার সাক্ষাতে তো হয়নি।

বিজন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ও। না এর সঙ্গে চাঁদনি পর্ব জড়িয়ে নেই। সে আর জগৎপুর যাবে না, ধূলিহর যাবে না, এখানে বসে বেচে দেবে।

দামটা যুক্তিযুক্ত হলে বিক্রি করতে কী আছে। সে জিজ্ঞেস করল,

দুধকুমারের সামনে তো বিক্রির কথা হলো, গৌড়েশ্বর তো বলল তাকেও খদ্দের আনতে।

পরে গিয়েছিল গৌড়েশ্বরের কাছে, তুমি তখন চলে এসেছ।

বিজন চুপ করে থাকল। আগের কথাটা বলেই সে ভয় পেয়েছিল ভিতরে ভিতরে। দুধকুমাররা যদি বলে তাকে তার বউ-এর কাছে বসিয়ে ওরা গিয়েছিল গৌড়েশ্বরের কাছে, বলেছে নাকি? কবিতা কি জেনেও কথাটা লুকিয়ে রেখেছে। দুধকুমার আর ভগবান যে দুটো আস্ত শয়তান। হয়ত ইনিয়ে বিনিয়ে সব কথা বলে দিয়েছে, বাড়ির খদ্দের তারা আনবে। আনলে দালালি পাবে। দালালি তো কম নয়।

চুপচাপ হয়ে গেল কবিতাও। বাড়ি নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধতার ভিতরেই ফোন বাজল বিজনের। ফোন ধরে বিজন সাড়া দিল, হ্যালো।

ওপারে গৌড়েশ্বর, দাদা কি শুয়ে পড়লেন?

না, না এখন তো সবে পৌনে দশটা।

আমি আপনার ধূলিয়রের ছাদে বসে আছি, কী আরামের বাড়ি দাদা, কী সুখ, একদিন আপনারা এসে রাত কাটান।

বিজন জিজ্ঞেস করল, ফোন করলেন কেন?

হ্যাঁ বলছি, বলছি এ বাড়ি কি সত্যিই বেচে দেবেন?

বলে তো এলাম।

না মানে বউদির মতামত নিয়েছেন?

বিরক্ত হলো বিজন, বলল, সে সব তো আমার পার্সোনাল ব্যাপার, আমি কাগজে অ্যাড দিচ্ছি।

দিন, তবে তাতে আমার ঝামেলা হবে, খদ্দের আসবে, দেখাতে হবে, ওটা আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন।

এসব কথা তো আগে হয়েছে।

আপনি কি দুধকুমারকে পরে পাঠালেন, ও খদ্দের আনলে আমি বাড়ি দেখাব না, ও বিরাট শয়তান, আপনার কি মনে নেই ওর জমির উপর দিয়ে ট্রাক এসেছিল বলে সাতশো টাকা নিয়েছিল।

ভুলেই গিয়েছিল বিজন। সাড়ে চার বছর আগের কথা। সবে ইট পড়বে। বাড়ির সামনের রাস্তার প্রায় অর্ধেক ছিল দখলে, গৌড়েশ্বর আর ওর গুষ্টির। ট্রাক ঢোকাতে হলে পেছনের মাঠ দিয়ে ভাল। সেই ট্রাক আটকে দিয়েছিল দুধকুমার। তার জমিতে ট্রাকের চাকা, সে কেন ছাড়বে? বুঝিয়ে ও কিছু হয়নি। পরে বিজনের সন্দেহ হয়েচিল ওই টাকা আদায়ের পেছনে গৌড়েশ্বরের ইন্ধন ছিল। জিজ্ঞেস করতে হবে দুধকুমারকে। এতদিন বাদে?

বিজন বলল, পরে কথা বলব।

ও পারবে না, ওই মাতালের কথা কে বিশ্বাস করে!

বিজন বলল, হবে, পরে দেখা যাবে, একটা দুটো আনুক।

গৌড়েশ্বর বলল, আপনি ছায়ার কথা ভুলে গেলেন? ওর বউটা সাত হাত ঘোরা, ও তাকে লেলিয়ে দিয়েছে আপনার দিকে দাদা, এতদিন বলতে বাধো বাধো ঠেকছিল, আজ আর না বলে পারলাম না, বিপদে পড়ে যাবেন।

গৌড়েশ্বর মণ্ডলের কণ্ঠে যেন শাসানির সুর টের পেল বিজন। সে ফোন কেটে সুইচ্‌ড অফ করে দিল। অন্ধকারে মাথার রগ চেপে ধরল। সব কেমন জটিল হয়ে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। গৌড়েশ্বর তার বদনাম করবে, ওকে বাড়ি বিক্রির দায়িত্ব না দিলে, অবশ্য তা অস্বীকার করতেই পারে বিজন। কবিতা তো গৌড়েশ্বরকে দেখতে পারে না। কবিতার কাছে বলার মতো একটা যুক্তি থাকবে তার। কিন্তু তাকে তো মিথ্যে বলতে হবে। স্বাভাবিক ভাবে প্রতিবাদ করতে হবে। কী ভাবে করবে? সে পারবে? কালিদাস বোসের মতো পারবে?

কবিতা এল তার পাশে, কার ফোন, গৌড়েশ্বরের?

হ্যাঁ, ও দুধকুমারকে খদ্দের আনতে বারণ করেছে।

বারণ করার ও কে?

এ তো অনেকবার বলেছ কবিতা।

না লোকটা অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

খারাপ লোককে না ঘাঁটিয়ে কাজটা উদ্ধার করার কথাই ভাবা দরকার।

দুধকুমার যদি থাকত, বিক্রি করতে হত না।

দুধকুমার না ঢুকলে বোঝা যাবে না ও কেমন, ওর জমিতে ট্রাক দাঁড়িয়েছিল বলে সাতশো, আর ছাদ ঢালাই হওয়ার দিন ওর জমিতে পার্মানেন্ট ছায়া পড়েছে বলে তিনশো, মনে আছে?

হেসে ফেলল, কবিতা এই জন্য লোকটাকে আমার মন্দ লাগে না, ওর ভিতরে একটা আর্টিস্‌টিক সেন্স আছে।

কী বলছ তুমি, পাকা মাথা, এখন দাদাবাবু দাদাবাবু করে, ও সময় কী ভাবে গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করেছে।

কথাটা তো সত্যি। কবিতা মেঝেতে বসল কবিতা। অন্ধকারে তার মুখে হাসি ফুটল। কী চমৎকার ছিল দুধকুমারের সেই আচরণ! ছাঁদ ঢালাই-এর দিনে সে নিজেও তো ছিল বিজনের পাশে। মিস্ত্রিরা গান গাইছে মসলা তুলতে তুলতে—ঠিক বেলা তিনটের সময় টলতে টলতে হাজির দুধকুমার। পুব দিকে নিজের জমিতে বসল পা ছড়িয়ে। গৌড়েশ্বর বলল, এয়েচে, দেখেছেন, মাল খেয়ে টং।

গৌড়েশ্বর ঝামেলা পাকাতে গিয়েছিল দুধকুমার গান ধরতে। কোন একটা চালু হিন্দি গান গলা দুলিয়ে দুলিয়ে গেয়ে যাচ্ছিল সে নিজের মনে। গৌড়েশ্বর হাঁক মেরে বলেছিল, অ্যাই, এখেনে মাতলামো করিস নে।

সে গৌড়েশ্বরকে পাত্তা দেয়নি। তবে গান বন্ধ করে বসেছিল কিছু সময়, তারপর উঠে আসতে আসতে বলল, এটা কী হলো?

কী হলো? গৌড়েশ্বর তাকে বলেছিল, এদিকে বউদি দাদা আছে, তুই এদিকে আসিস নে।

আসব না, আমি আমার জমিতে থাকব, কিন্তু এটা কী হলো?

ছাদ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস নে।

তুমার দাদারে ডাক, কুথায় সে লোক? গর্জন করে উঠেছিল দুধকুমার, তুমি বড্ডো মাতব্বরি করচ গৌড়কা', আমারটা আমি বুঝে নেব।

নিবি নিবি, এখন যা।

কুথায় যাব, আমার জমিতি আমি আছি।

থাকবি, থাকবি, কিন্তু এখেনে কাজ হচ্ছে।

তুমি দাদারে ডাক।

কী হচ্ছে দুধে, এবার কিন্তু আমি খারাপ হবো।

কেন রে গৌড়া মণ্ডল, তোর কী, আমি জমি বেচেছিলাম হাটগাছার ভবেন মিদ্দেকে, সে বেচেছে দাদারে, দাদার জমি আমারই জমি ছেল এক কালে, এখন হাত ঘুরে দাদা বিজন বোসের কাছে—

মাতাল তার জমির ইতিহাস বলতে আরম্ভ করেছিল। জানে সব কবিতা। জেনেছিল সেই দিন। গল ব্লাডারে পাথর হয়েছিল। সেই পাথর বের করতে হাটগাছার ভবেন মিদ্দেকে শস্তায় ছেড়ে দিয়েছিল আট কাঠা। ভবেনের কাজই হলো জমি কিনে ফেলে রেখে দাম বাড়লে বেচে দেওয়া। এই করে হাটগাছায় তার দোতলা বাড়ি, তার থামগুলোতে চকচকে রঙিন পাথর। ভবেনের কাছ থেকে বিজন কিনে দালান হাঁকাল, তার ছাদ ঢালাই চলছে কিন্তু সে কী পেল?

কী পাবি তুই, জমি বেচে যে খায় সে কিছু পায়?

কিন্তু আমার যে গল বেলাডারে ইস্টোন, আচ্ছা ও দা'বাবু গল বেলাডার কুথায় থাকে বলো দেখি, গল বেলাডারে আমার জমি খেল, কিন্তু আমি ছাড়ব না।

অ্যাই অ্যাই হট এখেন থেকে।

কী হট হট করছ, আমি গরু না ছাগল, দাদাবাবু আমার হাজার টাকা লাগবে, পাক্কা হাজার, ছাদ ঢালাই করছ, আজই লাগবে।

বিজন একটু ভয়ে পেয়েছিল। এ কোথায় এল সে? কথায় কথায় টাকা

দাবি করে দুধকুমার। গৌড়েশ্বরকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল আগে থেকেই। তার মনে হয়েছিল গৌড়েশ্বরই মাতাল দুধকুমারকে এখানে এনে ঝামেলা পাকানোর ব্যবস্থা করেছে। বিজন বোসের কাছ থেকে কিছু যদি খিঁচে নেওয়া যায়। বিজন বলেছিল, এখন যাও।

তুমিও বলচ দা'বাবু, আমার সাত-পুরুষের জমির উপর তুমার দালান খাড়া হচ্চে, গল বেলাডারে আমার জমি খেয়ে নিল, তুমি তারপর যা করলে তা তো আমার সাড়ে সব্বোনাশ, ট্যাকা বের করো।

গৌড়েশ্বর গর্জন করে উঠেছিল, দুধে তুই যাবি কিনা।

দুধকুমার ও পাল্টা গর্জে উঠেছিল, তুই সরবি কিনা গৌড়কা'।

তুই যা বলছি।

তুই যা বলচি গৌড়কা', আমার জমির ওপর দালান উঠছে, তুই কেন?

শালা মাতাল।

তাতে তুমার কি দাঁতাল?

দুই বেড়ালে ঝগড়া লেগেছিল। দুই হুলোয় গরগর করছিল। কিন্তু হঠাৎ দুধকুমার থেমে গিয়ে বিজন আর কবিতাকে ডেকেছিল, আপনারা মানী মানুষ, তুমরা আমার নমস্য, পন্নাম লাও দা'বাবু। বলছি আমার যে কী সব্বোনাশ হলো, ওই টুকুন জমিনে শীতকালে আমি বিকেলে রোদে পোয়াতাম, সকালে রোদে পোয়াতাম, বিকেলেরটা গেল, নিয়ে নিলে তুমরা।

কী গেল? হকচকিয়ে গিয়েছিল বিজন।

রোদ গেল বাবু, তুমি চেরকালের মতন আমার রোদ খেয়ে নিলে।

কবিতা ছিল বিজনের পিছনে। তাকে দেখে গৌড়েশ্বর বলতে চেয়েছিল, আপনি কেন বউদি, আপনি আমার বারান্দায় গিয়ে বসেন। কিন্তু কবিতা শোনেনি, এগিয়ে এসে দুধকুমারকে বলেছিল, কী বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো।

তাহলে আমার জমিনে আসেন, দুধকুমার নিজের খালি জমির দিকে হেঁটে গিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়ল। চমৎকার ছায়া। বিজন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে বলো, এবার তো ট্রাক দাঁড়ায় নি তোমার জমিতে।

দুধকুমার বলল, টেরাক তো দুঘণ্টা এক ঘণ্টার জন্য, কিন্তু এডা যে চেরকাল হলো, তুমার দালানের ছায়া পড়েচে কেন আমার জমিনে?

তার মানে? বিজন অবাক।

এই দ্যাখো দিদি, আমি তুমার ছোট ভাই তুমি আমার ভগ্নি, এডা কী হলো, তুমার দালানের ছায়া এখেনে চেরকালের মতো পড়ল, এ জমিনে বসে শীতকালে বিকেলের রোদ খাওয়া আমার জেবনের মতো ঘুচলো।

কবিতা বিস্মিত হয়েছিল। মুগ্ধ হয়েছিল। তখন পশ্চিমে সূর্য ঢলেছে অনেকটা, তাদের নির্মীয়মান বাড়ির পুবের জমির ফালি দুধকুমারেরই। সেখানে ছায়া পড়েছে নতুন দালানের। এই ছায়ার বয়স বেশি নয়। লিন্টেল পার হয়ে ছাদের লেভেল পর্যন্ত গাঁথনি হয়ে যেতেই দুধকুমারের জমির উপর নিয়মিত ছায়া পড়তে লাগল পড়ন্ত বেলায়। সেই ছায়া নিয়ে কতবার কথা বলছে দুধকুমার, আক্ষেপ করছে, এ ছায়া আর ঘুচানো যাবে না, এডা আমার দুঃখের ছায়া বড় ভগ্নি, আমারে কিছু দাও।

বিজন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কবিতা বলেছিল, আমরা স্যরি, ছায়া যে ঘুরান গেল না দুধকুমার।

স্যরিতে চিড়ে ভেজে বড় ভগিনী, যা দিয়ে গেলে তা আমার সাত পুরুষ হটাতে পারবে না, হাজার হাজার ছায়ার ভিতরে আর একটা জন্মাল দিদি, দুধকুমারকে বঞ্চিত করো না, সে এই ছায়ায় এখন রোদের জন্যি গড়াগড়ি দেবে,আমার যে কী হলো তা আমি বুঝতি পারচি।

সেই থেকে দুধকুমারের প্রতি কবিতার পক্ষপাতিত্ব। ছায়া দেখিয়ে গৃহ প্রবেশের সময় ও টাকা আদায় করেছে সে আবার। তিনশো টাকা পেয়ে খুব খুশি হয়ে ঢিপ করে প্রণাম ঠুকেছিল দুধকুমার। বলেছিল, ভগ্নির মতো বলে সে ছেড়ে দিল, না হলে কি এটা ছাড়া যায়!

কবিতা বলল, দুধকুমারকে ঢুকিয়ে গৌড় মণ্ডলকে বের করে দাও, ওর জমিতে পাকা ছায়া দিয়েছি আমরা, সেটা কি ঠিক হয়েছে?

নয়

পথেই ধরেছে দুধকুমার, দাদাবাবু, আমি ভেবিছিলাম কাজটা আমিই করব, আমার বড় ভগ্নি আর দাদাবাবুর ধুলিয়ার আমি বিচে দেব, কিন্তু হবে না।

দুপুরে এক পাত্তর ঢেলে বসে আছে দুধকুমার। আন্দাজ করে বসে আছে বহুসময় ধরে। আগের রোববারে বিজন বোস আসেনি, এ রোববারে কি আসবে না? দুধকুমার বলল, আমার কিছু বেত্তান্ত আছে দা'বাবু।

চলো বাড়িতে আগে যাই।

না ওখেনে হারামিটা তোমারে ঘিরে থাকপে।

বিজন বলল, তাহলে কোথায় বলবে?

না আমার বাড়িও নে যাওয়া যাবে না, চাঁদনি বলেছে ও বাড়ি বিচা হলি ও বিষ খাবে, গলায় দড়ি দেবে।

বিজন বলল, তাহলে এখেনে বলো।

তাই তো বলচি গৌড়া হারামি আমারে বলে দিয়েছে বাড়ির তিসীমানায় যেন আমি না যাই।

কেন?

আমি একটা খদ্দের জোগাড় করেছিলাম, বাড়িতে ঢুকতেই দিল না, বলল, পারমিশন নেই।

বিজন চুপ করে থাকল। দুধকুমার ভাল রকম ঢেলেছে গলায়, কথা জড়িয়েও যাচ্ছে, কিন্তু তাতে কি ভুল বলছে কিছু? সিধে হয়েও আছে। ওই যে বলছে সল্টলেক থেকে খদ্দের এনে দিয়েছিল ভগবান। আমার ও চেনা, চাকরি আছে, একটা ছেলে, তার কিনা মাথা খারাপ প্রায়।

মানে?

মানে জড়ভরত বলতি পারেন, বুদ্ধি-সাদ্ধি নেই, তার জন্য কিনবে।

সে থাকবে? বিজন অবাক, সে থাকবে কী করে?

বাপ মার সঙ্গে তিনি থাকবেন, খেলবেন, হাসবেন, জিনিসপত্তর ভাঙবেন, ছাদে দাঁড়ায়ে নুনু দেখাবেন, এই সব হবে, গৌড়াশুয়ারের বাচ্চা, ঢুকতেই দিল না।

বিজন বলল, অত গালি দিচ্ছ কেন লোকটাকে?

গালি দেব ছাড়া কী করব? ও একটা মানুষ! জন্তু।

তোমার কাকা তো?

ছাড়েন কাকা, গেরাম সম্পক্কে সবাই খুড়ো ভাইপো, ও আমার শত্তুর, খদ্দেরকে ঢুকতেই দিল না, বলল দাদা তাকে পাওয়ার দিয়ে গেছে।

বিজন বলল, চলো বলে দিচ্ছি।

যাব, কিন্তু আর একটা কথা, ও কিন্তু তলে তলে খদ্দের ঠিক করছে, আপনারে ঠকায়ে শেষ করে দেবে।

বিজন বলল, সহজ না।

খুব সহজ, ও আপনারে বশ করেছে দা'বাবু, শালা বশীকরণ জানে।

বিজন জিজ্ঞেস করল, ভগবান কোথায়?

আবার কোথায়! ওর সাইকিল তো হল না এখনো।

হবে। বিজন ফস্ করে বলে ফেলল।

কেন হবে, ও কে, ওরে সাইকিল দেবেন কেন আপনি?

তুমিই তো বলেছিলে।

বলেছিলাম যখন তখন একরকম, ও তলে তলে গৌড়া মণ্ডলের সঙ্গে লাইন করছে যে তা কি আমি জানিনে?

বিজন বলল, তোমার খদ্দের তো ভগবান এনেছিল বললে।

হাঁ, ওর পরেই এডা হয়েচে, ও বুঝেচে গৌড়ার রাজার শক্তি, ওর সঙ্গে আঁতাত করে চলতি হবে, আমারে সেডা বুঝাচ্ছিল।

তুমি বুঝলে পারতে।

ওই তো বলচি দা'বাবু, গৌড়া আপনারে বশীকরণ করেচে, এরপরে হয়ত দেখা যাবে গৌড়াই আপনারে বাড়িতি ঢুকতি দেচ্ছে না, তখন আপনার কী হবে, কী হবে ধূলিয়ারের?

বিজন দাঁড়িয়ে পড়েছে। এবার গরম যাবে। ক'দিন আগে কালবৈশাখী হলো, আকাশে মেঘও আসছে মাঝেমধ্যে। বর্ষা নামলে বিজনের বড় মন খারাপ হতো এই জগৎপুর-ধূলিহরে এসে। কত কালের মেঘ, কত দূর থেকে ভেসে আসে, হয়ত ওপারের ধূলিহর হয়েই এল, অথবা এপার থেকে ওপারে গিয়ে ধূলিহরের মাটি ভেজাবে। এখন এই মুহূর্তে মেঘের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওসব কিছু মনেই হলো না, মনেই হলো না বহুযুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল—বিজন স্পষ্ট দেখতে পায় গৌড়েশ্বর বলছে, ঢোকা হবে না পারমিশন নেই।

কার পারমিশন?

কেন মালিকের?

গৌড়বাবু আমি এসেছি।

যেই আসুন আপনি, লাভ হবে না, আমারে পাওয়ার দেওয়া আছে, এ বাড়ি আমি রক্ষণাবেক্ষণ করি।

আমি বিজন বোস, ধূলিহর আমার।

গৌড়েশ্বর মণ্ডল বলল, কাল সকালে আসবেন, আমার আজ খুব ঘুম পাচ্ছে,এখন হবে না।

বিজন ডাক দিল, ও দুধকুমার!

দা'বাবু! আমার বড় ভগ্নি কেমন আছে?

ভাল, কিন্তু এ কী হতে পারে?

কী বলচ বুঝা যাচ্ছে না।

গৌড়ার অত সাহস হবে?

সাহস দিলি হবে না কেন, ও কার হুকুমে আমার খদ্দেরকে ভাগিয়ে দিল, আর কি অমন পাব? অনেক টাকা, ভগবান শুধু ঘুরিয়ে নিয়ে হাজার টাকা পেয়েচে।

তুমি পাওনি?

পেতাম যদি ভিতরে ঢুকতে দিত।

তারপর?

বিক্রি হলি থিরি পার্সেন্টি হিসেব করে, তা বাদে আপনার থেকেও থিরি পার্সেন্টি, ভাল হতো।

বিজন বলল, চলো গৌড়াকে বলে দিই।

বললি হবে না।

হবে না কেন, বাড়িটা তো আমার।

না দা'বাবু, বাড়ি ওর, আপনি বলবেন কিন্তু ও টায়েমে না করে দেবে, তবে আমিও দেখে নেব, আমিও ছাড়ব না।

এখন খদ্দেরকে ডেকে পাঠাও না, মোবাইলে ধরো। বিজন বলল।

আজ গে হবে না, পুজো দিতে যাবে পীরতলায়।

পীরতলা সে কোথায়?

আছে দক্ষিণ পুবি আমিই বললাম পীরতলা নে যেতি।

কী হবে তাতে?

ওই জড়ভরতের মাথা ঠাণ্ডা হবে, খুব দুঃখ করছিল লোকটা, ওর নাম প্রিয়তোষ নন্দী, পুলিশের অফিসার। খুব শান্ত আর দুঃখী।

হুঁ। বিজন শুনল, কিছু বলল না। দুধকুমার বলে যাচ্ছে, কত জায়গায় হত্যে দিয়েছে, হিল্লি দিল্লি করে কত ডাক্তার দেখিয়েছে, হবার উপায় নাই, মাথায় কিছু নাই, আছে শুধু রাগ, রাগলে সব ভেঙেচুরে দেয়, রাগটা কমলি হয়ত মাথায় কিছু ঢুকত।

বাড়ি এসে গিয়েছিল। দুধকুমার তার সঙ্গেই বাড়ির ভিতরে ঢুকছিল। বাঁদিকের ঘরে ঢুকে মেঝেতে বসে দেওয়ালে ঠেস দিল দুধকুমার, হেঁকে বলল দা'বাবু ফ্যানটা চালায় দাও।

কে রে! লুঙ্গির গিঁট বাঁধতে বাঁধতে পেরিয়ে এল গৌড়েশ্বর, দুধকুমারকে ওই অবস্থায় দেখে রাগে গরগর করতে লাগল, অ্যাই বেরো।

দুধকুমার চোখ বুজে হাওয়া খাচ্ছে। বিজন বসেছে ইজি চেয়ারে। গৌড়েশ্বর আবার গর্জন করল, বেরো বলছি।

কুকুর না বেড়াল যে বেরোব। দুধকুমার চোখ বুজেই বলে ওঠে।

আবার মাল খেয়ে ঢুকেছিস, বেরোবি কি না বল।

তুমার কথায়, তুমি কে?

আমার পাওয়ার আছে, দাদার বাড়ির ভার আমার উপর।

তুমি কেউ না, তুমার কথাও শুনা হবে না, দা'বাবু—আমার বড় ভগ্নিপোত এসে গেচে, এবার তুমি ফোটো।

অদ্ভুতভাবে রাগ সামলে গৌড়েশ্বর হেসে ফেলল, তোর বড় ভাগ্নিপতি! পাগল!

মোটেই পাগল না, তুমি অনেক খেয়েচ, এবার যাও।

তুই খাবি, পারবি? গৌড়েশ্বর কথাটা বলে বিজনের দিকে ফেরে, বলে, দাদা ওই ঘরে চলুন খবর আছে।

খবর এই ঘরে বলো না।

না হবে না, দাদা আসুন।

বিজন উঠল। উঠে পাশের ঘরে যেতেই গৌড়েশ্বর দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল, চাপা গলায় বলল, একা আসবেন, ওকে রাস্তা থেকে কাটাতে পারেন নি?

কী বলবেন বলুন।

বলছি খদ্দের হয়ে গেছে, এখানে বসেই রেজিস্ট্রি হবে।

আপনি দুধকুমারের খদ্দেরকে ঢুকতে দেননি?

কেন দেব, ওই নন্দীকে, পুলিশকে বেচলে আমার কী হবে, ওকে আমি চিনি, শুধু বাড়ি দেখে বেড়ায়, কেনে না, আগে একবার এসেছিল!

আগে এসেছিল কবে?

তা মনে নেই, নিজে নিজে দেখে গিয়েছিল বাইরে থেকে।

কে বলল?

কে বলবে, আমি নিজে দেখেছি, সারাদিন বাড়ি পাহারা দিই কী করতে, এ রাস্তা দিয়ে কারা যায় সব আমার জানা।

তখন তো বাড়ি বিক্রির কথা ভাবা হয়নি।

কিন্তু এসেছিল, পুলিশ তো, ওর অভ্যেস হলো লোকের বাড়ির উপর নজর দেওয়া, চোখটা ভাল না, অথচ ওর কম তো নেই।

বিজন খাটে পা ছড়িয়ে বসে বলল, লোকের বাড়ি দেখে বেড়ায়! এ হতে পারে! দেখে কী হবে?

কিছুই হবে না জেনেও লোকের বউ-ঝির উপর নজর কি দেয় না মানুষ?

বিজন চুপ করে থাকল। কথাটা সত্যি বলছে গৌড়েশ্বর, নাকি মিথ্যা?

মিথ্যা মিথ্যা, মিথ্যা বলতে ওর জুড়ি নেই। বানাচ্ছে সব কিন্তু মনে হচ্ছে একেবারে সত্যি। বিজন বলল, আপনার নতুন খদ্দের?

আপনি কত নেবেন বলুন।

সাড়ে আট নয়। বিজন বাড়িয়ে বলল।

আগে তো সাত ছিল দাদা।

আগের কথা ভুলে যান। বিজনের গলায় যেন দার্ঢ্য ফুটে ওঠে। সে নিজে পরিতৃপ্ত হয়। বাড়িটা তো তার। খদ্দের তার কাছে না এসে গৌড়েশ্বরের কাছে আসছে কেন? গৌড়েশ্বর বলল, সাড়ে সাত দেব দাদা, তবে চিন্তার

কিছু নেই। এখেনেই রেজিস্ট্রি হবে, আপনি হাতে হাতে পেয়ে যাবেন।

বিজন শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করল, কোথাকার খদ্দের, দিন দেখি টেলিফোন নম্বরটা, যোগাযোগ করি।

ওরাই করবে।

নম্বরটা রেখে দিই, কখন দরকার পড়ে।

নম্বরটা নেই, তবে ও আসবে দু'চার দিনের ভিতর।

বিজন বলল, যে কিনবে সে তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

ওসব সিস্টেম এখন নেই দাদা, যিনি বেচবেন তাঁর সময় নেই, যিনি কিনবেন তাঁরও নেই, এসব কাজ আমরা করি, রেজিস্ট্রির দিনে কেনারাম বেচারামের দেখা মেলে। বলে হাসতে লাগল গৌড়েশ্বর।

কতয় ঠিক হচ্ছে?

আপনি সাড়ে সাত পাবেন, আপনাকে তো দালালিও দিতে হবে না।

বিজন বলল, তবু কাকে বিক্রি করছি সে দেখব না, আমার পছন্দ অপছন্দ থাকবে না?

গৌড়েশ্বর ঘরের ছিটকিনি খুলতে খুলতে বলল, আপনার কথা আমার খুব ভাল লাগে, খদ্দের নিয়ে পছন্দ অপছন্দ থাকে? টাকা থাকলেই হলো? ঠিকঠাক দিচ্ছে কিনা সেইটা দেখতে হবে।

বিজন আগের ঘরটিতে ঢুকে দেখল দুধকুমার নেই। সে ইজি চেয়ারে বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে ওই দূরে দুধকুমারের ভিটে দেখা যায়। বিজন অনেকক্ষণ শূন্যে তাকিয়ে এবার শরীর এলিয়ে চোখ বন্ধ করল। গৌড়েশ্বর তার বউমা সারার সঙ্গে কথা বলছে, বলছে, দাদার জন্য কফি করে নিয়ে আয়।

বিজন চোখ খুলে বলল, কফি না চা?

কেন, কফিই খান না আঙ্কেল। গলা রিনরিন করে বলল সারা।

হ্যাঁ যা যা, কফিই আন। গৌড়েশ্বর হুকুম করল।

বিজন আবার চোখ বুজল। গৌড়েশ্বরের এই খ্রিস্টান পুত্রবধূকে সে অনেকদিন দেখেনি। সেই মগরাহাট না মথুরাপুরে তার বাপের বাড়ি গিয়ে বসেছিল। বিজন জিজ্ঞেস করল, বউমা কবে এল?

দিন সাত, ছেলেকে পাঠালাম আনতে।

ভাব হয়েছে?

ভাব আর কী, ঘি আর আগুন, ক'দিন বাদে ধরবে, এখনও তাতের ভিতর আছে তো।

বিজন জিজ্ঞেস করল, আপনার ছেলের কু-অভ্যাসটি গেছে?

আঁজ্ঞে কু অভ্যাস আর কী, পুরুষ মানুষের একটু আধটু ওসব না থাকলে হয় না, বউমার ও নিয়ে মাথাব্যথা করা ঠিক না।

বিজন আবার জিজ্ঞেস করল, আপনার এ মত ছেলে জানে?

জানে, আমিই তো বউমাকে বলেছি, বউমা হলো ঘরের লক্ষ্মী, তার কাজ সংসারটা ধরে রাখা, বেটাছেলে দশদিকে ঘোরে, তারে নিয়ে মাথাব্যথা করলে সংসারে শান্তি থাকে।

বিজন বলল, স্বামীর ভাগ দিতে চায় মেয়েরা?

আপনি কী বলেন, পুরুষমানুষের এসব না হলে চলে?

বিজন চুপ করে থাকল। কথা বিপজ্জনক দিকে যাচ্ছে। সারা কফি নিয়ে এল। গৌড়েশ্বর টুল এনে রাখল বিজনের সামনে। গৌড়েশ্বর বলল, বউমার রান্নার হাত খুব ভাল, আপনারে খাওয়াবে বলছিল, একদিন আসেন সকালে।

বিজন কফির কাপ ঠোঁটে তুলতে তুলতে ভাবছিল সে বোধহয় জগৎপুর-ধূলিহর-এ বেড়াতে এসেছে গৌড়েশ্বর মণ্ডলের কাছে। এ বাড়ি গৌড়েশ্বর মণ্ডলের, অন্তত তার ব্যবহারে তেমন প্রকট হচ্ছে।

সেই সময় বাইরে কাদের গলা শোনা গেল। গৌড়েশ্বর উঠে গিয়ে দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখেই বলল, পরে পরে, এখন গেস্ট আছে।

না না কাগজপত্র দেখাতে হবে।

চাপা গলায় গৌড়েশ্বর ধমকায়, বলছি না বাইরের লোক আছে।

আমরা তাহলে বসি।

না ঘুরে এস।

কখন আসব?

আটটা নাগাদ।

এখন তো পাঁচ বাজে, তিনঘণ্টা কোথায় ঘুরব?

যাও তো, যাও।

আরে হামার মৌসি এসেঁছে ইলাহাবাদ থেকে, দেখবে।

আহ্! না বলে আস কেন?

বলেছিলাম তো সানডেতে আসব কাগজপত্র নিতে।

সে তো সকালে।

সকালে অত ধূপ, ওর ভিতরে মৌসিকে আনি কী করে?

তখন বিজন গলা তুলে ডাকল, কে এসেছে গৌড়াবাবু?

আজ্ঞে কেউ না।

ডাকুন, ভিতরে ডাকুন।

না না, ডাকব না, প্রত্যেকদিন আসছে, আজ মৌসি দেখবে, কাল পৌসি

মানে পিসী দেখবে, তারপর চাচা ভাতিজা ভাই বহেন, খুড়ো ভাইপো—সবাই দেখে যাবে, আগে অ্যাডভান্স করো পরে দ্যাখো, ফোকটে এতবার দেখা হবে না।

কিঁউ গৌড়াবাবু? বলতে বলতে দরজায় নিপাট একটি ভাল মানুষের মুখ, হামি মকান খরিদ করব, দেখব না।

বিজন উঠে দাঁড়াল, আপনি কে? বুকটি ধক করে উঠল বিজনের।

হামি সার রাজেশ ত্রিপাঠী, হামার বাড়ি ইলাহাবাদ থেকে বিশ কিলোমিটার নর্থে, গিরিনগর, লেকিন হামি কলকাত্তায় সেটল্‌ড।

বিজন বলল, আমি বিজন বোস, এ বাড়ি আমার।

আপনার, আপনি মালিক আছেন, গৌড়াবাবু শুধু বলছে মালিকের সঙ্গে দেখা হবে না, আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ।

গৌড়েশ্বর বলল, ঠিকই তো বলেছি, দাদা কি তোমার মতো ভ্যাগাবন্ড। রোজ এক একজন করে নিয়ে আসছ বাড়ি দেখাতে, টাকা কিছু অ্যাডভান্স করো, ক্যাশে করবে বুঝলে।

দশ

বিজন অনুমতি দিতে গৌড়েশ্বর চুপ করে থাকল। রাজেশ ত্রিপাঠী তার আশি ছোঁয়া মেসো আর সত্তর পার করা মাসিকে ঘর ডাইনিং কিচেন টয়লেট দেখাতে লাগল। মেসো চোখে ভাল দ্যাখে না, মাসি তো ঘোমটার ভিতর থেকে মুখই বের করে না প্রায়। বিজন বসে বসে রাজেশের হিন্দি শুনতে লাগল। গৌড়েশ্বর বিড় বিড় করে, এইরকম ডেইলি হচ্ছে দাদা, এক খদ্দের কতবার দেখবে?

বিজন বিমর্ষ হচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে বাড়িটা সত্যিই চলে যাবে। রাজেশের ভালই পছন্দ হয়েছে। প্লাস্টার অফ প্যারিসের প্রলেপ দেওয়া দেওয়ালে বুড়ো মেসোর হাত ছুঁইয়ে দিয়ে বলছে, দেখিয়ে আপ, ক্যায়সে ওয়াল! কিত্‌না সুন্দর বোলিয়ে আপ।

হাঁ হাঁ, বহুৎ সুন্দর।

রাজেশ মাসিকে বলছে, বাড়ি হয়ে গেলে তাদের এখানে এনে রেখে দেবে, তখন বহুৎ আনন্দ হবে।

গৌড়েশ্বর বলল, বলছি বাড়ি নেবে তো অ্যাডভ্যান্স করো, পুরো ক্যাশে দিতে হবে, কিন্তু কানেই নিচ্ছে না।

অ্যাডভান্স নেব আমি বলেছি?

বলেন নি, কিন্তু নিতে হবে দাদা, টাকা না হয় আমার কাছে জমা থাকবে,

কিন্তু তাতে ওর চাঁড় হবে, বাড়ি কি ফোকটে করা যে ডেইলি দেখবে, আমি তো আজ ঢুকতেই দিতাম না।

না অ্যাডভান্স চাই না, ওতে বাঁধা পড়ে যেতে হবে।

নো দাদা, তিনমাসের মধ্যে কিনতে হবে, নইলে টাকা ফরফিটেড—এই রসিদ দিলেই হবে।

তখন মাসি-মেসোকে পাশের ঘরে বসিয়ে রাজেশ ত্রিপাঠী একমুখ হাসি নিয়ে ঢুকল। বহুৎ পসন্দ হয়েছে সাব। হামার মেসো ইস্কুল টিচার ছিলেন, এখন বয়স হয়েছে, কানে কম শুনে, আঁখোতে কম দ্যাখে, কথা বুঝতে টায়েম নেয়, লেকিন সমঝদার মানুষ, বলল, আচ্ছা মকান, এখন আপনার মোবাইল নম্বরটা দিন।

গৌড়েশ্বর আচমকা খেপে উঠল, এই তুমি যাও তো, আর আসবে না, আমরা তোমাকে বাড়ি বেচব না, অন্য খদ্দের ঠিক হয়ে গেছে।

কিঁউ, হামি কী করলাম? রাজেশ ঘাবড়ে গেল।

গৌড়েশ্বর বলল, আমি যে কথা বলেছি তার একটাও তুমি শোনোনি, বার বার বাড়ি দেখা হবে না।

আপনি তো দেড়শো রুপিয়া করে নিয়েছেন, নেন নি?

দেড়শো রুপিয়াতে হয়ে গেল! বলেছি পঞ্চাশ হাজার নিয়ে এসো, তারপর তিন মাসের ভিতর কিনে নেও, কানেই নিচ্ছ না।

রাজেশ ত্রিপাঠী ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। বলল, গৌড়াবাবু, হামি আগে আটবার দেখেচি, আটবারে হামি বারোশ টাকা দিয়েছি দেড়শো করে, আজ ভি দেড়শো দেব, কিন্তু কাগজপত্র তো হামি পাইনি।

টাকা অ্যাডভান্স করলে কাগজ পাবে, আমি তো বলেছি সব ঠিকঠাক আছে।

বিজন বুঝতে পারে সব। বাড়ি দেখিয়ে গৌড়েশ্বর টাকা নিচ্ছে। সে বলল, আমার নম্বরটা নিয়ে যান আপনি, যোগাযোগ করবেন।

হামি তো ওইটাই চাইছি, গৌড়াবাবু বলছে হবে না, কিন্তু মালিক না দেখে কাগজ না দেখে হামি কাকে অ্যাডভান্স করব?

বলছি না আমাকে পাওয়ার দেওয়া আছে দাদার, আমাকেই তো সব করতে হবে।

কাগজ!

কাগজ হবে, বাড়ি পছন্দ, টাকা ছাড়ো তারপর পাবে।

বিজন বুঝতে পারছিল রাজেশ ত্রিপাঠীকে গৌড়েশ্বরের খপ্পর থেকে সরাতে হবে। ইস! যতজন বাড়ি দেখে যায়, গৌড়েশ্বর টাকা নেয়! বিজন বুঝতে পারছিল পুরোটা না হলেও তার ধূলিহর বেহাত হচ্ছে একটু একটু করে।

সে তার মানিব্যাগ বের করে কার্ড এগিয়ে দিল রাজেশ ত্রিপাঠীকে, ফোন করবেন।

হাঁ হাঁ, হামি এইটাই চাইছিলাম, মকান দেখব মালিক দেখব না?

গৌড়েশ্বর বলে উঠল, এ খদ্দের ঠিক না দাদা, আমি তো ওকে দলিল, পরচার জেরক্স দিতাম, কিন্তু দেব কেন, যদি না কেনে? না নেয়?

না নিলে না নেবে। বিজন বলে উঠল।

আর পরচা দলিলের জেরক্স ওর কাছে থাকবে? গৌড়েশ্বর অবাক।

ফেরত দেবে তো।

কী ফেরত দেবে দাদা, জেরক্স করে রেখে দেবে নিজের কাছে, এইভাবে কত জালিয়াতি হয়েছে, বাড়ি বেচে দেবে ও-ই সব কাগজ দিয়ে।

কথাটা ভাল করে বুঝে নিতে চাইছিল রাজেশ ত্রিপাঠী। দু চোখ কুঁচকে গৌড়েশ্বরের কথায় মনোযোগী হয়ে উঠতে চাইছিল, বলল, হামি ঠিক বুঝতে পারছি না গৌড়াবাবু, কিলিয়ার করে বলেন।

কী কিলিয়ার করব, পরচা দলিলের জেরক্স দেব কেন, যদি না নেও।

নিব তো, হামার তো পসন্দ হয়েচে, শুধু হামার চাচি আসবে গিরিনগর থেকে বারো তারিখ, তবে চাচি হামাকে বলেছে হামার পসন্দ হলেই হবে, তার মানে হয়ে গেল, তবু একবার দেখাব।

চাচি দেখবে, এখনো দ্যাখেনি?

কবে দেখল, চাচি তো ইউপিতে।

গৌড়েশ্বর বলল, আর আমি কাউকে ঢুকতে দেব না ভিতরে।

কিঁউ? আপনি তো দালালি পেয়ে যাচ্ছেন।

গৌড়েশ্বর খেপে গেল, দ্যাখো মুন্না তুমি মুখ সামলে কথা বলবে, আমার সময়ের দাম নেই? তুমি ডেইলি পাঁচ সাত জন করে এনে দেখাবে, ঘর নোংরা হয় না, তুমি রুপিয়া নিয়ে এসে কথা বলো।

কাগজ দিন, হামি সার্চ করাব।

কাগজ ফোকটে হয় না।

বাহ্ হামি খরিদ করব কাগজ দেখব না?

না, তোমাকে আমি কতটা চিনি, কাগজ নিয়ে তুমি যদি আর না আসো।

রাজেশ ত্রিপাঠী বলল, হামি তো ওরিজিনাল নিচ্ছি না, জেরক্স নেব।

কিন্তু জেরক্স থেকে জেরক্স করে নিজের কাছে রেখে দিয়ে যদি না কেনো?

হামি তো কিনবই।

কিনবে তো অ্যাডভান্স করো, কাগজ নেবে অথচ কিনবে না, পরে যদি জালিয়াতি হয়, রেস্ট্রি অফিসে গিয়ে রেস্ট্রি করে দাও।

কী বোলছেন আপনি? পারডন।

ভালই বুঝছ, এরকম কেস আকছার হচ্ছে, জগৎপুরে দুটো হয়েছে, তখন দাদাকে মামলা লড়তে হবে।

আপনি ভাল করে কথাটা বোলেন।

বললাম তো।

রাজেশ ত্রিপাঠী খুব গম্ভীর স্বরে বলল, হামার পিতাজী নিজ হাতে গিরিনগরে ইস্কুল বসিয়েছে হামাদের জমিনে, প্রতি বচ্ছর গরিব আদমিকে একদিন খাওয়ায়, দান করে, কারোর কাছে এক রুপিয়া ধারে না, বরং লোকে বহুৎ রুপিয়া মেরে দিয়েছে, জমিন জাল করে নিয়েছে, হামি জালিয়াত আদমি?

তুমি তো বলছ তোমাদের জমি ওইভাবে চলে গেছে।

হাঁ গেছে, তা বোলে হামি করব?

করতেই পাব, তোমাকে আমি চিনি?

আপনি বহুৎ ফালতু বাত কবেন গৌড়াবাবু, আপনি প্রত্যেকবার দেড়শ রুপিয়া নিয়েছেন জোর করে করে, মকান হামার খুব পসন্দ্ না হলে থোড়ি দিতাম, এভাবে দালাল নেয় না।

অ্যাই বাজে কথা বলবে না মুন্না।

বাজে কথা আপনি বলছেন, হামি জালিয়াত আছি?

কী করে জানব?

হামি যা ডিল মালিকের সাথে করব।

করলে হলো, উনি বেচাকেনার কী বোঝেন, ভগবান তুল্য মানুষ, যা করব আমি করব।

রাজেশ ত্রিপাঠী ডাকল, মৌসি!

চলে যাচ্ছ? গৌড়েশ্বর জিজ্ঞেস করে।

হাঁ হামার পুরা নাম আপনার নাম প্রায় সেইম আছে, হামি রাজ্যেশ্বর ত্রিপাঠী, আপনি গৌড়েশ্বর, লেকিন হামরা দু'জন দুরকম হচ্ছি, স্যার হামি আপনার বাড়ি চলে যাব, এ মকান হামি কিনবই, এ মকান দেখলে মন শান্ত হয়ে যায়, মনে হয় ঠাকুর মন্দির আছে।

সত্যি? জিজ্ঞেস করল বিজন। সে আর গৌড়েশ্বর রাজেশের কথার ভিতরে মাথা গলাচ্ছে না। সব কথা শুনে তার জ্ঞান হচ্ছে। এই জ্ঞান হলো দিব্য জ্ঞান। গৌড়েশ্বরকে যত দেখছে মুগ্ধ হচ্ছে। প্রতিভাবান পুরুষ। যতবার ঢুকেছে রাজেশ ত্রিপাঠী, দেড়শো টাকা করে নিয়েছে। এখন তার অজ্ঞাতে অ্যাডভান্স নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। তা পঞ্চাশ হাজার তো হবেই। আর সেই টাকা হজমও করে ফেলত নিশ্চিত। বিজন এত সবের ভিতরেও রাজেশ

ত্রিপাঠীর কথায় মুগ্ধ হয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, বাড়িটা কী করে এত ভাল লাগল?

ও হামি বলতে পারব না সার, লেকিন হামি সাচ বলছি, মন্দির লাগে।

বিজন জিজ্ঞেস করে, আমার নিজের তো তা মনে হয় না?

হামি টের পেয়েছি সার, যেদিন এ বাড়িতে পা দিয়েছি, ভিতর থেকে ঠাকুর যেন ডাকল, আও বেটা ভিত্‌রে আও।

কোন ঠাকুর?

রামকিষনো ঠাকুর।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ?

ইয়েস সার, হামি বেলুড় মঠের শিষ্য আছি, হামার ফেমিলির সবাই দীক্‌সা নিয়েছে বেলুড় মঠে, ঠাকুর হামাকে বলছে এই মকান ভাল।

বিজন বলল, তাই যদি বলেন ঠাকুর, তবে তো আমাকে রেখে দিতে হয়।

তা যদি রাখেন হামি কিছু বলব না, তবে এ মকানে ঠাকুর আছে।

বিজন বলল, তাহলে আপনি তৈরি হন।

হাঁ সার, কাগজ পত্তরের জেরক্স তো চাই।

গৌড়েশ্বর গুম হয়ে গেছে। টের পাচ্ছে তার চেয়ে ও চালাক, বুদ্ধিমান এই মুন্না মানে রাজেশ ত্রিপাঠী। এমন কথাটি বলেছে যে বিজন বোস মুগ্ধ। কল্পনাতে ও আসেনি গৌড়েশ্বরের যে এমন হতে পারে। কিন্তু সে তো হাল ছাড়বার মানুষ নয়, হেসে বলল, ওটা আমি টের পাই।

কী টের পান? বিজন ঘুরে জিজ্ঞেস করে।

ঠাকুর আছেন।

কী ভাবে টের পান?

আমি তো দাদা এ বাড়িতে থাকি, ওঁর মুখে স্তব শুনি আমি।

বিজন বলল, এতদিন তো বলেন নি।

কেন বলব, এতো আমি শুনতে পাই, আমার বউমা ছেলে পায় না।

বিজন উদ্দেশ্যটা টের পায়। তাই আর কথা বাড়ায় না। সে চুপ করে যেতে গৌড়েশ্বর ডাকল রাজেশ ত্রিপাঠীকে, এই মুন্না শোনো।

ত্রিপাঠী বলল, বলুন।

এদিকে এস।

ত্রিপাঠী এগিয়ে গেল গৌড়েশ্বরের সঙ্গে। গৌড়েশ্বর ঘরের বাইরে গিয়ে বলল, ফোকড়ামির জায়গা পাওনি। আজকের দেড়শো দাও, আর আমাকে এড়িয়ে কিনতে গেলে অসুবিধে হবে তোমার।

ই সব আপনি কী বোলেন মণ্ডলবাবু, হামি সারকে ডাকি।

খবদ্দার না, পরচা দলিলের জেরক্স তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে ঝামেলায় পড়বে।

রাজেশ বিমর্ষ হয়ে বিজনের কাছে ফিরে গেল, বলল, ও হামাকে থ্রেট করছে।

ডাকব?

নেহি স্যার, কিঁউ কি ও হলো ই মন্দিরের পাণ্ডা, পুরী জগন্নাথ মন্দিরে গেছেন তো, পাণ্ডা হামার তিনশো রুপিয়া চোট করে দিল, পাঁচশো দিলাম, তিনশো ফেরত না দিয়ে বলল দিয়েছে।

বিজন বলল, বাড়ি তো আমার।

জানি তো, আপনি জগন্নাথ ঠাকুর।

বিজন হেসে পেলে, তাই হয় নাকি?

হয় স্যার, হামি আপনাকে দেখে বুঝেছি আপনার ভিতরে ভি ঠাকুর আছেন, বলছে ভয় কী রে পাগল, হামি তো আছি, বাসের পিছনে লিখা থাকে দেখেছেন?

আপনি কী করেন ত্রিপাঠীবাবু?

হামার সার দুটা বিজনেস বসে গেল, এখন সরকারে কাজ করি।

কী কাজ?

ও স্যার কম্পিউটার চালানোর কাজ, হামি জানি।

কী ব্যবসা ছিল?

এস টি ডি বুথ, সব ফ্রিতে ফোন করে যেত, উঠেই গেল।

আর একটা বিজনেস?

কম্পিউটার শেখানোর ইস্কুল, ও ভি সেই হলো, শিখে যায় লেকিন পয়সা দেয় না, এখন হামি ভাল আছি, বলতে বলতে মেসোকে ডাকল রাজেশ ত্রিপাঠী, মকান ঠিক হলো তো, চলিয়ে জি।

বিজন জানালা দিয়ে দেখছিল বুড়ো মেসোকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। এক মাথা ঘোমটা মাসি যাচ্ছে পেছনে পেছনে। এই তিনজনের সবার আগে হাঁটছে গৌড়েশ্বর মণ্ডল। লুঙ্গি, হাফ হাত পাঞ্জাবি। মোটা সোটা গোলগাল কালো হুলোর মতো গোঁফে যেন জিভ বুলোতে বুলোতে হাঁটছে। তাকে অনুসরণ করছে ভারতবর্ষ—রাজেশ ত্রিপাঠী দিগর।

দিন পাঁচ ছয় বাদে রাজেশ ত্রিপাঠী এল বিজনের কাছে ফোন করে। একা নয়, সঙ্গে এক বৃদ্ধ, বলল, হামার চাচা আছে স্যার।

কী চমৎকার ঝোলান গোঁফ তাঁর নাকের নীচে। কোন একটা সার না ট্রাকটরের বিজ্ঞাপনে বিজন এমন ছবি দেখেছে। মাথায় হলুদ রঙের একটি

পাগড়িও আছে। ধুতি পাঞ্জাবি। বিজন বলল, নমস্কার চাচাজি।

চাচাজি বলল, নমস্তে, বাবু, ম্যায় বিনায়ক সিং হুঁ, এক গাঁওলি আদমি, ই রাজেশ আচ্ছা আদমি হায়, বহুৎ আচ্ছা লেড়কা, মকান উসকো দিজিয়ে বাবু, উসকা গলতি মাফ করো।

বিজন কিছু বুঝতে পারল না, বলল, কী হয়েছে তো জানি না ত্রিপাঠী বাবু, বিক্রি করব না বলেছি নাকি?

রাজেশ ত্রিপাঠী বলল, মণ্ডল ডেইলি থ্রেট করছে, বলছে তার টেন পার্সেন্ট এখনই দিয়ে দিতে।

কী টেন পার্সেন্ট?

আট লাখের টেন পার্সেন্ট, আশি হাজার।

ও চাইছে?

ইয়েস সার। হামি পারব না, আপনি ওকে বলে কমিয়ে দিন।

বিজন বলল, কমিয়ে দেব মানে, ও টাকা নেবে কেন?

হাঁ বাবু লিবে, দালালি তো জরুর দেনে হোগা। বলল বিনায়ক সিং নামের গ্রাম সম্পর্কের চাচা। না, সে বাড়ি দ্যাখেনি এখনো, কিন্তু শুনেছে পবিত্র মকান। রাজেশ খুব ঠাকুর দেবতা মানে। ঠাকুর দেবতা তাকে রক্ষাও করেন। আশি হাজার দালালি দিলে বাড়ি কিনবে কোন টাকা দিয়ে?

বিজন বলল, দালালিই দেবে, বাড়ি কিনতে হবে না।

দুটি লোক অবাক হয়ে বিজনের কথাটি বোঝার চেষ্টা করছে। তার রসিকতা বুঝতে অনেকটা সময় নিল বিনায়ক সিং, আকর্ণ বিস্তৃত হেসে বলল, এহি তো হো রহা হায় বাবু, ম্যায় শুনা হায় আপ এক সাচ্চা আদমি, মকান পবিত্ত, সব কুছ হো যায়েগা, লেকিন এ কৌন হ্যায়?

বিজন বলল, দিতে হবে না এক পয়সাও নয়।

নেহি বাবুজি, খুশ কর দেনে হোগা, লেকিন টেন পার্সেন্ট জাদা হ্যায়, আপ কিরপা করো বাবুজি!

আমি কি চেয়েছি টাকা?

নেহি, লেকিন ওতো আপকা আদমি হায়।

বোঝা গেল সব। এ কাহিনি শুনে কবিতা রাগারাগি করতে লাগল। রাজেশ ত্রিপাঠী এক বাক্স লাড্ডু এনেছিল। ব্যাগ থেকে বের করে তার হাতে দিল। বিনায়ক সিং বলল, সাক্সাত ভগয়তী!

এই গাঁয়ের চাচাও বাড়ি দেখবেন ত্রিপাঠীবাবু?

ইয়েস স্যার, লেকিন ডর লাগছে, ও বলছে এবার দুশো রুপিয়া লাগবে দেখতে, আর আশি হাজারের দশহাজার নিয়ে যেতেই হবে।

যেতে হবে না, আপনি সার্চ করে দেখে নিন, স্যাটিসফায়েড হলে টাকা জোগাড় করুন।

ও হোয়ে যাবে, লোন লিব, লেকিন চাচা দেখতে পাবে না?

কী হবে, একেবারেই দেখবেন।

আপনি কবে যাবেন?

যেদিন যাব সঙ্গে যাবে আপনার চাচা?

হাঁ স্যার, দেখবে বলে অতদূর থেকে এল, বহুৎ ইমানদার আদমি, কোবরেজ ছিল, হাটে হাটে ফ্রি ট্রিটমেন্ট করে এখনো, দেখুন আপনি চাচাকে, এমন ইমানদার আদমি কি বাড়িটা দেখতে পাবে না?

বিজন নয় কবিতা বলল, পাবে, দেখলে আমরা ধন্য হয়ে যাব, প্রণাম চাচাজি।

এগারো

অনেকটা সময় থেকে রাজেশ ত্রিপাঠী আর তার গ্রাম সম্পর্কের চাচা বিনায়ক সিং হাসতে হাসতে বিদায় নিল। এবার সব কিছু খোঁজ নেবে, তারপর কিনবে। সার্চ আর আনুষঙ্গিক কাজ মাসখানেকের ভিতর হয়ে যাবে। আর ব্যাঙ্ক লোন পেতে বড়জোর একমাস!

ওরা চলে গেলে কবিতা জিজ্ঞেস করল, সত্যি বিক্রি হয়ে যাবে!

কী করব?

মানে আমাদের বাড়ি আমাদের থাকবে না?

বিজন বলল, কী করে থাকবে?

ওর যে নাম ধূলিহর, তাও না?

না ওটা থাকবে, ত্রিপাঠী বলেছে যেমন আছে তেমনি রেখে দেবে।

আবার আমরা উদ্বাস্তু!

বিজন বলল, যাদের যেমন হওয়ার কথা, তেমন হচ্ছে।

না মানে আমাদের ভাগ্যে বাড়ি নেই?

বিজন চুপ করে থাকে। নেই যে তা সে বুঝতে পারছে। আমতলির বাড়িতে কী সুন্দর বসে আছে সন্তোষ চক্রবর্তী। আর উঠবে না কোনোদিন। আর বিজনেরও সাধ্য নেই ওকে তোলে। লোকটা বেশ প্রতিপত্তিও করে ফেলেছে ওখানে। একরাশ ছেলেমেয়ে নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তিন বিঘের ওপর ভিটে পুকুর বাগানে। জগৎপুরের বাড়িতে তো গৌড়েশ্বর ঢুকে আছে। কী ভাবে যে ঢুকে গেল! বিজনও তাকে বের করতে পারল না কোনোরকমে। না পেরে বিক্রির সিদ্ধান্তই নিয়ে নিল।

রাজেশ ত্রিপাঠীরা চলে যাওয়ার পর মন খারাপ হয়ে গেছে। বিজন দুপুরে বেরিয়ে পড়ল। জগৎপুর তাকে টানছে। বাড়িটা তাকে টানছে। আর টানছে দুধকুমারের বউ। আজই মনে হচ্ছে বাড়ি আর থাকবে না। জগৎপুর ধূলিহর থেকে তার বিদায় আসন্ন। রাজেশ ত্রিপাঠী কিনবেই। শেষ অবধি দুশো টাকা দিয়ে না হয় চাচাজিকে দেখিয়ে আনবে। যত জনকে সে দেখিয়েছে, কেউ বিরূপ মন্তব্য করেনি। সকলেই নাকি একমত যে ও বাড়িতে দেবতার বাস। ঠাকুর আছে। ও বাড়ি নিলে মঙ্গল হবে। মঙ্গল কি বিজনের হয়েছে? ওরা কি জানে ও বাড়িতে সব সময় বসে থাকে ँকালিদাস বোস, তার পূর্বপুরুষ। সেই লোকটির কথা শুনলে ত্রিপাঠী কি এগোবে? দুপুর থেকে ँকালিদাসের হাওয়া লাগছিল বিজনের গায়ে। তারপর যখন হাঁটতে আরম্ভ করল, পিছনে পিছনে সে। ँকালিদাস তার কানে কানে বলল, আমার গলা শুনেছে ওই লোক।

তার মানে?

আরে আমি তো শখের যাত্রা করতাম, ওই ত্রিপাঠী আমার গলা শুনেছে, বুঝতেই পারেনি।

ঠাকুর্দা! তুমি ঠাকুর রামকৃষ্ণর গলা শুনিয়েছ?

না আমার গলাই শুনেছে ও, ভেবেছে ঠাকুরের গলা।

এটা কি ঠিক হলো ঠাকুদ্দা?

ँকালিদাস বোস বলল, আমি তো ডেকেছিলাম রাজেশ এলি, আয় আয়।

তুমি ডাকতে গেলে কেন?

আমি কেন ডাকব, ও যে ডাকা করাল, বাড়িটা ওর এত ধরেছে মনে। বেচে দিচ্ছি তোমার জন্য।

আমি কী করলাম!

বুঝে নাও।

বিজন হাঁটছিল একা একা। আকাশের মেঘ ছায়া দিয়েছে জগৎপুর জুড়ে। জল থৈ থৈ করছে ভেড়িতে। কালো গভীর সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে বিজনের। কী সুন্দর লাগছে! যদি জগৎপুরের ধূলিহর সে রেখে দিত, এই রকম ঈশ্বরের পৃথিবীর ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে পারত এ জীবনে কতবার। আর সেই যাত্রায় যে সুখ তা দেবে কোন কলকাতা শহর?

ँকালিদাস বোস বলল, আমি কি ধূলিহর এমনি ছাড়িনি, এই কারণে।

বোঝা গেল ঠাকুর্দা রাজেশ ত্রিপাঠী ঠকে যাবে!

যাবে তো কী হয়েছে?

লোকটা ভাল মনে এসেছে।

তাতে হলো কী?

ও বাড়িতে ঠাকুর নেই, আছ তুমি, তুমি তো ঠাকুরের উল্টো।

শয়তান বল, শয়তান।

বিজন বলল, তুমি আমার পূর্বপুরুষ, বয়স একশো পাঁচ ছয় তো হবে, তোমাকে ওসব বলি কী করে?

কালিদাস বোস বলল, নারে আমি শয়তান, এ বাড়ি শয়তানের মন্দির, বুঝলি কিছু।

না বুঝিনি।

তুই বেচে দিচ্ছিস, আমি আটকাতে পারতাম, কিন্তু মায়া হলো, তোর ভিতরে তো দুগ্গাদাও আছে, দুর্গাদাস বোস, সে লোকটার দয়ামায়া ছিল তো সত্যি, তবে কিনা তার একটা মেয়েমানুষও ছিল, কিন্তু তার দিকে এক পাও এগোতে পারেনি।

আহ্ ঠাকুদ্দা বাদ দাও।

বাদ দেব কেন, তুই ধুরোল থেকে চলে যাচ্ছিস, সব জেনে যা।

যা জানি তাই থাক।

শুনতে ভয় পাস তাই তো, আহা দুগ্গাদার কথা মনে পড়লে এখনো আমার চোখে জল এসে যায়। তারা শুধু তাকিয়ে থাকত পরস্পরের দিকে, এমনই মনের ভয় ছিল দুগ্গাদার।

এ আমি জানি ঠাকুদ্দা।

সব সময় আমরা যতটা জানি, জানি না তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি, তোর রাজেশ ঠাকুর মন্দির ধরে নিয়ে শয়তানের মন্দিরে ঢুকুক।

আমি তো ঠকাতে পারব না। বিজন বিড়বিড়িয়ে বলে।

তুই ঠকাবার কে, যে ঠকবার সে আপনিই ঠকে যাবে। কালিদাস বোস বলল।

তাহলে লোকটা তোমার পাল্লায় পড়ে যাবে?

আমিও ওকে ছুঁয়ে থাকব, ও ভাববে ভগবান ওকে ছুঁয়ে আছে।

তারপর? তারপর তো ওই রাজেশ ত্রিপাঠী কালিদাস বোসের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরবে। ওকে নিজের পথে নিয়ে যেতে কত সময়? শয়তান আর ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথমে তো শয়তানই জেতে। ঈশ্বর তাকে জন্ম দিয়েছেন মানুষের সঙ্গে। মানুষের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ জারি আছে সবসময়। কালিদাস বোস খুনখুনে গলায় দিন দুপুরে অপরূপ মেঘের ছায়ায় হেসেই যাচ্ছে। শোনাচ্ছে সে কতবার জিতেছে। বিজনকে তো শেষই করে দিত। শেষে কিনা মায়া হলো তাই ছেড়ে দিল। ধূলিহর থেকে যা তুই বিজন। কিন্তু যে আসবে তাকে আমার পথে নামাব।

বিজন বলল, আমি খুব অন্যায় করছি, রাজেশ ত্রিপাঠীকে এ বাড়ি তাহলে বেচব না।

তুই বেচা না বেচার কে, বেচারাম ঠাকুর যাকে ধরবে তার কোনো উপায় নেই, তোরও কোনো উপায় নেই, আমি মেয়েমানুষ পুষতে জমি বেচতাম, তুই মেয়েমানুষের হাত থেকে বাঁচতে বাড়ি বেচতে বাধ্য হচ্ছিস, আমার হাতে সব ছেড়ে দে।

বিজনের মন খারাপ হচ্ছিল। ওই যে দুধকুমারের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বিজন তার বাড়ি ঢুকে পড়েছে। ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাওয়া দিচ্ছে ঠাণ্ডা, মোলায়েম। বিজনের মনে হচ্ছিল ভগবানের স্পর্শ। ঁকালিদাস বোস এই হাওয়ায় সুবিধে করতে পারছে না। বিজন দেখছিল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আঁচল উড়িয়ে দুধকুমারের বউ আর একটি পুরুষমানুষ মাঠ ধরে হাঁটছে। এতদূর থেকে পুরুষ মানুষটাকে বোঝা যাচ্ছে না। তবে দুধকুমার নয়, ভগবান হতে পারে। ভগবান ছাড়া কে হবে? ভগবানের সঙ্গে কি আবার ভোজেরহাট খোদহাটি চলল দুধকুমারের বউ?

বিজন বিড় বিড় করল, ওই দ্যাখো ঠাকুর্দা।

ঁকালিদাস খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিজনের কাছে এসে দাঁড়াল বোধহয়, বলল, আসলে তো ও ভগবানের দখলে, ভগবান মণ্ডল।

আমি তাহলে কে?

বাড়ির মালিক।

মাথা ঝাঁকিয়ে বিজন বলল, বিশ্বাস করি না।

ঁকালিদাস বোস বলল, না বিশ্বাস করিস না করবি, তবে রাজেশ ত্রিপাঠীকে নিয়ে আমি অন্য খেলা খেলব, আসুক সে।

আসবে না।

আসতে বাধ্য, কিনবে এ বাড়ি।

আমি বেচব না।

তোর কী ক্ষমতা, আসল মামলা তো তোর ঠাকুদ্দা দুর্গাদাসের সঙ্গে এই ঠাকুদ্দা কালিদাসের, তুই তো নিমিত্ত মাত্র।

বিজন বলল, শয়তানের সঙ্গে ঈশ্বরের—ঠাকুরের?

হ্যাঁ তাই, তোর ঠাকুরই আমার জন্ম দিয়েছে এমন করে, তারে আমি ছাড়ব না, একবার হারার আগে অনেকবার জিতব, আমি এ বাড়ি শ্মশান করে দেব।

কী বলছ তুমি ঠাকুদ্দা?

খুন খুন করে হাসল ঁকালিদাস বোস, বলল, সব শূন্য করে দেব, যে ক'টা লোক বাস করবে তারা কেউ কাউকে চিনবে না, অশান্তিতে মরবে।

রাজেশ ত্রিপাঠীর কথা বলছ?

হুঁ, যে কিনবে তার কথা।

সে কোন অন্যায়টা করল?

যে অন্যায় না করে তারে মেরেই তো সুখ।

বিজন টের পায় এর চেয়ে বড় সত্য আর হয় না। নিরীহ মানুষ তো শয়তানের হাতে মরার জন্যই জন্মায়। গাঁয়ে-গঞ্জে মরছে এমন কত! গণ হিংসায় মরছে, ভূমিকম্পে মরছে, বন্যায় মরছে, ঝড়ে মরছে। এরা সব রাজেশ ত্রিপাঠী। বিজন ছাদের ধারে এসে আলসে ধরে ঝুঁকে পড়ে বলল, দেখি কেমন পার?

তার মানে, কী বলতে চাস?

বিজন বলল, পারবে না।

কী করে পারব না?

বিজন বলল, পারবে না ঠাকুদ্দা, একজন যেমন মারে অন্যজন বাঁচায়ও তো।

উপরে উঠে এল গৌড়েশ্বর মণ্ডল, বলল, একা একা কেন দাদা?

আর কে আসবে? ঘুরে দাঁড়ায় বিজন।

বাড়ি থাকবে না, বউদি তো আসতে পারত।

বিজন বলল, বাড়ি দেখার জন্য ত্রিপাঠীর কাছ থেকে আর টাকা নেবেন না গৌড়াবাবু।

গৌড়েশ্বর বলল, টাকা নিয়েছি কে বলল, লোকটা এক নম্বরের মিথ্যেবাদী, ওকে না বেচাই ভাল।

সেটা তো আমার সিদ্ধান্ত।

তা সত্যি, কিন্তু আমি কি ওইরকম একটা প্রতিবেশী নিয়ে বাস করব? আমার কোনো মতামত নেই? অবজেকশন দেব।

অবজেকশনের কোনো জায়গা নেই।

গৌড়েশ্বর বলল, কাদের নিয়ে আমি বাস করব তা আমাকে দেখতে হবে না?

এসব তো গায়ের জোরের কথা।

গৌড়েশ্বর হাসল, ধুর, আপনি কি ভেবেছেন আমি সত্যি বলছি, আপনার বাড়ি আপনি বেচবেন তাতে আমার কী বলার আছে, তবে ত্রিপাঠীকে না দেওয়া ভাল।

কাকে দেব তাহলে?

খদ্দের আমি দেব।

ওকেও তো আপনি দিয়েছেন।

না, ওকে তো বলিনি বাড়ি দেব।

তবে দেখতে দিচ্ছেন কেন?

দেখুক না, মন্দির দর্শন করুক না, কিন্তু বাড়ি ও পাবে না।

বিজন বুঝতে পারছিল খদ্দের হাত থেকে ফসকে গেছে। দালালির টাকা গৌড়েশ্বর পাবে না। তা যদি হয় তবে তাই হোক। গৌড়েশ্বর অন্য খদ্দের আনুক। আনবে সে। বেশি দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তার আগে বিজনকে বলতে হবে রাজেশ ত্রিপাঠীকে সে দেবে না। মুন্না মানে ত্রিপাঠী খুব চতুর লোক। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া সে বন্ধ করবে।

বিজন বলল, দেখুন তাহলে।

দেখছি, আপনি ঘরে বসে রেজিস্ট্রি করবেন, আমার পড়শি আমার মনের মতো তো হবে।

তাই হলো। বিজন বলে দেবে রাজেশকে সে এই বাড়ি রেখে দেবে এখন। গৌড়েশ্বর লোক আনছে অসম থেকে। যোগাযোগ হয়ে গেছে এর ভিতরে। ওখানে বিস্ফোরণে প্রায় সব দিন লোক মরছে। ব্যবসা করা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, জঙ্গিদের মাসে পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার দিতে হয়।

বিজন বলল, আমার সঙ্গে কবে আলাপ হবে?

হবে, একেবারে রেজিস্ট্রির সময়।

দরাদরি?

আমি তো আছি দাদা, ঠকাব না।

তাহলে ত্রিপাঠী পাবে না?

না পাবে না।

বিজন মনে মনে বলল, না পেলে বেঁচে যাবে, ওর সংসার ছিন্নভিন্ন করে দেবে শয়তান কালিদাস বোস।

ফিরছিল বিজন। ফিরতে ফিরতে মাঝ পথ থেকে কালিদাসকে পেয়ে গেল। কালিদাসই যেন তার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, রাজেশই পাবে, ওর নিয়তি ওকে টানছে।

না ঠাকুর্দা পাবে না।

হ্যাঁ পাবে, ওর সঙ্গে ওই গৌড়া শয়তানের ছেলের বউকে লটকে দেব, দুটো সংসার জ্বলে যাবে।

কী করো তুমি, একটুও মায়া নেই?

না নেই, দুগ্গাদার নাতি বলে বেঁচে গেলি তুই, না হলে দুধকুমারের বউ মাগি তোরে গিলে নিয়েছিল প্রায়।

ঠাকুদ্দা তুমি যাও।

যাব না, যাব বলে আসি নি, মরার আগে মেরে যাব।

চুপ করে থাকে বিজন। বিজন ফিরছিল বিমর্ষ হয়ে। কী করবে বুঝতে পারছে না। রাজেশ ত্রিপাঠী লোকটাকে ভাল লেগেছে। ওকে বাড়িটা দিলে সে হয়ত নিশ্চিন্ত থাকত। কিন্তু গৌড়েশ্বর হতে দেবে না। আবার রাজেশ ত্রিপাঠী পেলে দুধকুমারের বউ আর গৌড়েশ্বরের ছেলের বউ কি লোভ ত্যাগ করে বাড়ির মায়া ত্যাগ করত? গৌড়েশ্বর সব পারে। ও বাড়িতে ঢুকেছে যখন বেরোবে? লোভের তো সীমা নেই। তাতে যত রকম কৌশল সম্ভব তা প্রয়োগ করতই।

ফোন এল। মোবাইল দেখল বিজন। রাজেশ ত্রিপাঠী বলল, সার কি বাইরে, আমি রাজেশ বলছি, কাল কি দশহাজার দেব গৌড়েশ্বরকে?

ও কী বলেছে?

ইয়েস সার, ফোনে এখনই বলল।

আমি তো বলিনি।

জানি সার, ওই জন্য তো ভেরিফাই করলাম।

ও ফোন করেছিল না আপনি?

আমার চাচা বিনায়ক সিং কাল মকান দেখতে যাবে, তাই ফোন করেছিলাম।

বিজন বলল, মকান দেখতে হবে না।

কিঁউ সার, কথা তো হয়ে গেল।

বিজন বলল, আপনাকে কিনতে হবে না।

কিঁউ স্যার, স্যার আমি কাল সকালে আপনার কাছে যাব।

ফোন কেটে দিল বিজন। হাঁটছিল সে। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল কিছুই না হোক ওই গৌড়েশ্বরের পড়শি করে রাজেশ ত্রিপাঠীর মতো ভালমানুষকে সারা জীবনের মতো বিপন্ন কি সে করতে পারে? এখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। লোকটাকে বাঁচাবে না ওই চক্রব্যূহে ফেলে দেবে?

বিজনকুমার বসু নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরেও বিমর্ষ মনে নিজের সঙ্গেই মনে মনে কথা বলতে লাগল। তার নিজের তো যাচ্ছে, সেই যাওয়ার চেয়ে ও রাজেশ ত্রিপাঠীর ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সে সবচেয়ে বেশি। মনে মনে ডাকতে লাগল, ঠাকুর্দা, ও ঠাকুর্দা। দুর্গাদাস বোসকে ডাকছিল সে। সেই ভালমানুষটি যদি এখন তার পাশে ছায়ার মতো দাঁড়ান কালিদাস বোস, শয়তানটাকে হটিয়ে দিয়ে, তবেই না বিজন নিজে বাঁচে, রাজেশ ত্রিপাঠীদেরও বাঁচাতে পারে।

চতুর্থ পর্ব

এই যে এখন রাজেশ ত্রিপাঠী এসে বসে আছে। বিজনের এখনো দেখা করার সময় হয়নি। লোকটাকে ফাঁসাবে? গৌড়েশ্বর আর দুধকুমার চাঁদনির ফাঁদে ফেলে ৺কালিদাস বোসের দোসর করে দিয়ে বিজন ঘরে ক'টা টাকা তুলবে। এতকাল যে ঠাকুর্দার কোনো দেখা ছিল না, তিনি এসে দাঁড়াচ্ছেন স্বর্গ থেকে। আসতে বাধ্য হয়েছেন ছোট-ঠাকুর্দা দুরাচারী ৺কালিদাস বোসের ছায়া থেকে বিজনকে সরাতে। এখন রাজেশ ত্রিপাঠীকেও তিনি সরাতে চান। ওই রকম একটি ভালমানুষ, যার প্রায় কোনো ছায়াই পড়ে না মাটিতে, অমন আলোময় মানুষটাকে কিনা একটা দালাল বদমাশ গৌড়েশ্বরের হাতে তুলে দিয়ে আসবে বিজন? আর ওদিক থেকে পাকা দালান মোজাইক টাইলস ফোয়ারা বাথটাবের লোভে গৌড়ার ছেলের বউ সারা আর দুধকুমারের বউও একসঙ্গে টানবে রাজেশকে।

টানবে টানবে। ৺কালিদাসই ওদের দিয়ে টানাবে। আর ওই চাঁদনির শরীরের খিদে খুব। এখন আরো বেড়েছে ৺কালিদাসের প্ররোচনায়। বিজনের বাড়ির লোভে বিজনকে রেখে দিত বটে, ছাড়তে পারত না কিছুতেই, কিন্তু বিজনের তো বয়স হয়েছে। মাথার চুলে পাক ধরেছে। বিজনের শক্তি আর কত? নতুন পুরুষ পেলে কার না ভাল লাগে। ওই জগৎপুরে তেমন পুরুষ কই? সব তো তাড়ি মদ গিলে পড়ে আছে হেথাহোথা। তাদের পৌরুষও ক্ষীয়মান। সব যেন কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ, সুতোর মতো ভেসে আছে।

বিজন ঢুকল ঘরে, কী মনে করে রাজেশবাবু?

রাজেশ বলল, সেদিন ফোন করেছিলাম যে।

আমি তো বাড়ি বেচব না বলেছি।

হামি তো কাল হামার রিলেটিভকে দেখালাম।

শুধু দেখিয়ে যাবেন?

নো সার, পারমিশন যদি দেন সার্চ করিয়ে নি, মিউটেশন তো আছে আপনার, পর্চাও আছে দেখেছি।

সব আছে।

সে হামি জানি, গৌড়া কোনো পেপার দেবে না।

পেপার তো ওর কাছে নেই।

বলছে যে আছে।

মিথ্যে কথা।

রাজেশ বলল, দুধকুমার বলল আপনার কাগজ ওর কাছেও আছে।

আছে নাকি?

বলল, ওর বউ বলল।

বউ-এর সঙ্গেও দেখা হলো? বিজন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

হাঁ হলো, ওর বাড়ি নিয়ে গেল দুধকুমার।

বিজনের মনে পড়ল কতদিন যায়নি জগৎপুর ধূলিহরে। অতিকষ্টে নিজেকে আটকে রেখেছে। টানছে বাড়ি টানছে মেয়ে। দুধকুমারের বউ-এর টানই বেশি। বিজন ফোন করেছিল গৌড়েশ্বরকে, খদ্দের খুঁজুন, আনুন।

গৌড়েশ্বর খুব খুশি। তাহলে রাজেশ ত্রিপাঠী-মুন্না হচ্ছে না। হচ্ছে না খুব ভাল হয়েছে। মুন্না শুধু দেখেই যাবে। ওর কত টাকা আছে? পারবে দশ লাখ দিতে বারো লাখ দিতে? আরে দাদা যতটা পারা যায় তুলে নেওয়া দরকার। আপনার পরিশ্রম যায়নি? টেনশন হয়নি? হয়নি আবার! ছুরি দেখিয়ে ভ্যানরিকশা পাঁচটা এনে মাঝরাত্তিরে সব ইঁট তুলে নিয়ে যায়নি পুবদিকের মানুষ? কবিতা বলে ও কাজ গৌড়েশ্বরের। নিঘঘাত ও লাগিয়ে করিয়েছে। থানায় গিয়েছিল বিজন। থানা থেকে তদন্তেও এসেছিল। মিস্ত্রী মজুররা ঠক ঠক করে কাঁপছিল। ছুরি তো তাদের বুকে ধরেছিল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তাদেরই তোলে পুলিশ। তখন টাকা দিয়ে বেরোতে হয় হাজত থেকে। কাজও চলে যায়। কিন্তু তা হয়নি। থানার ও.সি. শুধু বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। এই জায়গায় বাড়ি করছেন, জমি আর পেলেন না?

জমি কই?

কই মানে টাকা ফেলুন, পাবেন।

বিজন বলেছিল, এ বাড়ি আমার পূর্বপুরুষের ভিটে।

তার মানে?

আমাদের দেশের বাড়ি।

আপনি কি এখানকার লোক?

বিজনের সব কথা মন দিয়ে শুনেছিল ও.সি.। হেসে উঠে বলেছিল, পাগলামি করছেন, আপনার ইট তো যাবে, এরপর বাড়িই তুলে নিয়ে যাবে দেখবেন, লাইফ নিয়ে ওসব চলে?

কীসের কথা বলছেন?

আরে সার আপনি সিটির লোক, সিটি অফ ক্যালকাটা, আপনি কিনা এখানে

ধূলিআর না কী এস্টাব্লিশ করতে চাইছেন, ইজ ইট পসিব্‌ল? লাইফের টুয়েন্টি ইয়ার্স অফ এজ ফিরিয়ে আনতে পারবেন?

বিজন বলল, চেষ্টা করছি, বাড়ির নাম হবে ধূলিহর।

বললেন তো, ওতে লাভ কী, কিন্তু আপনার স্পট সিলেকশন ভুল হয়ে গেছে।

তো সেই ও.সি. কিছু ইট ফেরত এনেছিল। কার পুকুরে ডোবানো ছিল। পুকুরের চোদ্দ শরিক, কাকে অ্যারেস্ট করবে পুলিশ? চোরাই ইট মিলেছিল পাঁচ মাইল পুবে জোতভীম মৌজায়। ওখানে গৌড়েশ্বরের শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরবাড়িরও অংশ আছে সে পুকুরে, এক আনা এক গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি। এক আনা এক গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি শেয়ারে কি ইট ডোবান যায় চুরি করে? বিজন এখনো সে হিসেব করতে পারেনি। বরং ভুলেই গেছে চুরির ঘটনাটা। সেই সব টেনশনের টাকা তুলে নিতে বলছে গৌড়েশ্বর। ইট তার শ্বশুরঘরের লোক, তার শালাবাবু যে চুরি করায়নি, বলবে কে? বিজন বিড়বিড় করল, এমন চুরি-ডাকাতি দেখতেও ভাল, শুনতেও ভাল।

রাজেশ ত্রিপাঠী বলল, কী বলছেন সার?

বিজন বলল, ও বাড়ি কিনবেন না।

কিঁউ, কেন, ও বাড়িতে ভগোয়ান আছে।

না নেই।

হাঁ সার আছে, আপনি টের পাননি, আমি পেয়েছি।

বিজন বলল, জগৎপুর ভাল জায়গা না।

ভাল হয়ে যাবে, আপনার বাড়ি হয়েছে ভাল হয়ে যাবে, ধূলিআর হয়েছে ভাল হয়ে যাবে।

বিজন তাকিয়ে থাকল রাজেশ ত্রিপাঠীর মুখখানির দিকে। খুব স্পষ্ট, একেবারে জলে ধোয়া। এখনো জলের প্রলেপ রয়ে গেছে যেন। মুখখানি স্মিত হাসিতে ভরা। রামকৃষ্ণদেব রামকৃষ্ণদেব লাগে যেন। গালে দাড়িটি থাকলেই হয়ে যেত। বিজন এ মানুষকে ঠকাতে পারবে না গৌড়েশ্বর আর দুধকুমার চাঁদনির হাতে রেখে এসে। সে জিজ্ঞেস করল, দুধকুমার কী বলল?

বলল, সব করে দেবে ও।

কী করে দেবে?

সার্চ করে দেবে, দলিল লেখা রেজিস্ট্রি সব করে দেবে, ও জায়গায় তো রেসট্রিকশন আছে কেনাবেচায়, পারমিশন ও এনে দেবে।

এই সব করছে নাকি?

হাঁ সার এসবই নাকি করে।

আমি তো জানি না।

বলল, দোতলাও তুলে দেবে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়ে দেবে, ফেমিলিটা ভাল মনে হয়।

তাই?

হাঁ সার গৌড়েশ্বরের মতো রুপিয়া খোর বদমাশ না, ও আপনার বাড়ি নিজের বাড়ি বলে ভাবে, বলে ও যা বলবে তাই হবে।

বিজন জিজ্ঞেস করল, দুধকুমারদের ভাল লেগেছে?

ইয়েস সার, সিম্পল আছে, ওর বউটাও ভাল।

ভাল?

ইয়েস সার, মানুষের ভিতর সিমপ্লিসিটি না থালে মানুষ ভাল হয় না, ওদের ভিতরে আছে।

বিজনের বুকের ভিতরে গুরগুর মেঘ ডাকল। চাঁদনির মুখখানি ভেসে উঠল চোখের সামনে। দুধকুমার এবারও তার বউ-এর কাছে নিয়ে গেছে হবু মালিককে। আর রাজেশ ত্রিপাঠীর চোখে ঘোর লেগেছে। ঘোর তো তার চোখে এখনো লেগে। মায়াঞ্জন। ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে বিজন, পারছে না যে তা এখন টের পাচ্ছে। ঈর্ষা হচ্ছে রাজেশকে। রাজেশকে মায়ায় ভুলিয়েছে হয়ত দুধকুমারের বউ। না হতেও তো পারে। সে বাড়ি বেচবে শুনে কেঁদে ভাসিয়েছে। বিজনবাবুকে, কত্তাকে সে হারাতে পারবে না। বিজন টের পাচ্ছিল সে জড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। চরিত্রহীন হয়ে যাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা। কিন্তু তা কী করে হবে সে? এতদিনের রক্ষা করা চরিত্র। অত সহজে দিয়ে দেবে? কিন্তু লোভ যে যায় না। ওই টসটসে মুখ, বড় বড় চোখ, ঈষৎ স্খলিত ভরাট দুই স্তন, ভারী নিতম্ব, উরু নিয়ে দুধকুমারের বউ তাকে বেঁধে ফেলছে শিকলে। শিকল ছিঁড়ে সে বেরোতে পারছে না। তার সব কীর্তি গৌড়েশ্বর জানে। জানে যে সে আভাস দেয়। দেয় বলে ভীরু বিজন গৌড়েশ্বরকে তার বাড়ি থেকে বের করতেও পারছে না। তখন যে হাটে হাড়ি ভেঙে দেবে। লোকটার মুখের আগল নেই। লোকটা বলেছে রাজেশ ত্রিপাঠী তার মাধ্যমে আসেনি, তাকে দালালি দেবে না তাই রাজেশ ত্রিপাঠীকে বিক্রি করা যাবে না বাড়ি।

বিজন বলল, ও বাড়ি কিনে লাভ হবে না আপনার।

খুব হবে সার।

মণ্ডল ডিস্টার্ব করবে।

একবার ঢুকি, আমি দেখে নেব।

বিজন জিজ্ঞেস করল, দুধকুমার কী বলল?

ওই সব তো বলল, হেলপফুল, ওর সঙ্গে গৌড়ার হিচ আছে, আমাকে

বলেছে কোনো অসুবিধে হবে না, ও আমাকে কাগজের সব কপি দেখাল, বলল সব দিয়ে দেবে জেরক্স করে।

বিজন চুপচাপ হয়ে গেল। দুধকুমারের বউ ওই কাগজপত্র তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। তোমার বাড়ির কাগজ কত্তা! আমারে দাও।

কেন তুমি কী করবে?

রেখে দেব।

রেখে দিয়ে কী করবে?

তোমার বাড়ির 'পচ্চা' দলিল, আমি রাখব কত্তা।

হবেটা কী?

হাত বুলোব কত্তা, এতে তুমার বাড়ির কথা সব লিখা আছে তো, এই দ্যাখো আমার গা কেমন কেঁপে যাচ্ছে, এ তো তুমার। তুমার গন্ধ রয়েছে এতে।

ফটো কপিগুলো নিয়েছিল চাঁদনি। তা আবার কপি করে রাজেশকে দেবে বলেছে। এই রকম কপি গৌড়েশ্বরের কাছে নেই। বাড়ি আছে তার কাছে, বাড়ির কাগজ নেই। কাগজ আছে চাঁদনি দুধকুমারের কাছে, বাড়ি নেই। তবে কাগজের দাম কম নয়। কাগজ দেখাতে পারলে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মানো যায়। তাতে লোকে কিনতে অগ্রসর হয়। গৌড়েশ্বর যতই বাড়ি দেখাক, কাগজ না দেখলে ও বাড়ির দিকে কেউ এগোবে না।

রাজেশ ত্রিপাঠী বলল, আমি কিছু অ্যাডভান্স করব।

না না দরকার নেই।

কেন সার, বাড়ি তো আমিই নেব।

বিজন বলল, ভেবে দেখুন।

বাবা মা মামাজি আঙ্কেল গাঁও-এর আদমি সবাই দেখেছে, তারা সবাই বলেছে এমন মকান তার হয় না, আপনি ধূলিআর নাম দিয়েছেন কেন না আপনার গাঁও-এর নাম ওই ছিল, হামি দেব গিরিনগর, হামাদের গাঁও ওইটা আছে, ধূলিআর গিরিনগর একসঙ্গে থাকবে।

গিরি আছে আপনার ওদিকে?

হাঁ, ছোটো পাহাড়, গাঁও ঐ পাহাড়ের নীচায়

এই জগৎপুরের সঙ্গে তা মিলবে?

হাঁ মিলে যাবে।

কী করে মিলবে?

মিলালে মিলে সার, সব এই ভিতরের কথা, অন্তর মিলায় যদি তবে কে না মিলাবে বলুন।

বিজন অবাক হয়ে লোকটাকে দেখছিল। রাজেশ নয় এ যেন আর এক বিজন। যখন যে জমি কিনতে গিয়েছিল এই রকম ছিল না? এই রকম ঘোর

লাগা চোখে গৌড়েশ্বরকে বলেছিল এখানে সে ধূলিহর গ্রাম তুলে আনবে।

আশ্রম? কোন ঠাকুর? গৌড়েশ্বর জিজ্ঞেস করেছিল।

না! না! আমাদের গ্রাম ছিল।

ভাল ভাল আপনারা আসুন তবে না এ জায়গার উন্নতি হবে। গৌড়েশ্বর বলেছিল।

রাজেশ ত্রিপাঠী বলল, ঠিক আছে তো সার, হামি কুছু অ্যাডভান্স দিই, আপনি রিসিভ করুন, হামি বাড়ি ফিরে সবাইকে বলি হয়ে গেল পাকা কথা, এখন সার্চ করা, তারপর লোন তুলা।

লোন পাবেন?

হ্যাঁ পাব, আমার উকিলও ঠিক করা হয়ে গেছে, ও তুলে দেবে, ব্যাঙ্কে গেলে এখন লোন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে, দিস ইয়ার ইজ দ্য ইয়ার ফর হাউজ ফর হোমলেস।

আপনি তো হোমলেস নন।

হামার হোম কোথায়?

কেন গিরিনগরে।

হামার কাম কাজ সব এখানে, গিরিনগরে হোম থেকে কী হবে?

বিজন বলল, ঠিক আছে!

অ্যাডভান্স মানে বায়না?

নানা ওসব নেবে না, সার্চ করুন তারপর হবে।

সার্চ করতে হয় তাই করব, ব্যাঙ্ক সার্চ রিপোর্ট পরচা দলিল দেখতে চাইবে, কপি জমা নেবে লোন এপ্লিকেশনের সঙ্গে, তাই ওসব কথা, এগ্রিমেন্ট ও চাইবে, বায়নার কাগজ দিলে হামার সুবিধা হবে!

বিজন বলল, আজ থাক রাজেশ বাবু।

রাজেশ না হামি মুন্না, হামাকে মুন্না বলুন সার, ঠিক আছে আজ যাচ্ছি, কবে আসব বলুন, ও মকানে হামি ধূলিআরের নীচয় গিরিনগর লিখব, বাংলা হিন্দি বোথে, ও মকানে ভগোয়ান আছে, হামাকে দিতেই হবে।

দুই

সন্তোষ চক্রবর্তী এসেছে আমতলি থেকে। সঙ্গে তার কিশোর পুত্র, এগারো বারো হবে। সন্তোষ বলল, কোনোদিন কলকাতা দ্যাখেনি, নিয়ে এলাম।

ভাল করেছেন।

সন্তোষ চক্রবর্তী সঙ্গে এক প্যাকেট বসিরহাটের কাঁচাগোল্লা সন্দেশ নিয়ে

এসেছে, বলল, অনেকদিন আপনাদের সঙ্গে দেখাও হয়নি।

শনিবার রবিবার বিজনের ছুটি। শনিবারের বারবেলায় সন্তোষ চক্রবর্তী তার ফ্ল্যাটে এসে ঢুকেছে। গালে দাড়ি রেখে ওর ভিতরে সাধু সাধু ভাব। ছেলেটির দুটি চোখ আগ্রাসী। বিস্ময় নিয়ে বিজনের সাজানো ঘর দেখছে। বিস্ময়ের ভিতরে এক ধরনের ঈর্ষাও বুঝি তৈরি হয়েছে সেই কিশোরের চোখমুখে। বিজন জিজ্ঞেস করল, এখান থেকে কোথায় যাবেন?

কোথাও না, এখেন থেকে বাড়ি।

খাবেন দুপুরে।

না না আমরা খেয়ে এয়েচি ছোটবাবু, আটটায় বেরুইচি, ওর মা ভাত করে দিয়েছিল, সঙ্গে রুটি তরকারি টিফিনও আছে।

তা বললে হয়, গৃহস্থের বাড়ি এলেন, ব্রাহ্মণ মানুষ।

সন্তোষ চক্রবর্তী আত্মগরিমায় ভরা মুখে হাসল, তারপর বলল, আপনার নোতন বাড়িতি গে পেটপুরে খেয়ে আসব।

ঠিক আছে সে হবে, আবার হবে কিনা তাও বলা যায় না, অতদূর কি পৌঁছতে পারবেন?

অনেকদূর?

হ্যাঁ, যাট বছর পিছনে।

তার মানে? সন্তোষ চক্রবর্তী হাঁ হয়ে গেল। কী বলে লোকটা তা না বুঝতে পেরে বছর বারোর কিশোর পুত্রের দিকে তাকিয়ে বলল, ছেলেটা ভাল ব্রেন পেয়েচে, ক্লাসে ফার্স্ট হয়।

বাহ্! বেশ ছেলে, কী নাম?

ছেলেটি বলল, আঁজ্ঞে করুণাঘন চক্রবর্তী।

করুণাঘন! কে দিল নাম?

করুণাঘন বলল, বাবা।

তখন সন্তোষ জিজ্ঞেস করল ছেলেকে, ছোটবাবুর কথা ধরতে পারলি?

করুণাঘন বলল, উনি টাইমের কথা বলছেন।

তার মানে?

করুণাঘন বিজনের দিকে তাকিয়ে বলল, তাই তো ছোটবাবু?

বিজন জিজ্ঞেস করে, কোন ক্লাস?

সেভেনে উঠলাম।

সন্তোষ বলল, বয়সের চেয়ে উঁচুতে পড়ে, কিন্তু পারে।

বাহ্! ছেলে আপনার দুঃখ দূর করবে সন্তোষবাবু।

সন্তোষ জিজ্ঞেস করল, ছোটবাবুর কথাটা বুঝিয়ে দে দেখি।

করুণাঘন বলল, ও তুমি বুঝবা না বাবা, টাইমের কথা বলছেন উনি, সিক্সটি ইয়ারস এগো তুমি কোথায়?

তার মানে?

বাড়ি চলো বুঝিয়ে দেব।

বিজন অবাক হয়ে শুনছিল পিতাপুত্রর কথোপকথন। ছেলেটিকে বয়সের চেয়ে বুদ্ধিমানই মনে হয়। সে জিজ্ঞেস করল, তুমি এইচ জি ওয়েল্স-এর টাইম মেসিন পড়েছ?

ইংলিশের সার ক্লাসে গল্পটা বলেছিলেন।

আর?

করুণাঘন বলল, ইংলিশের স্যার বই দেন আমাকে।

ইংরিজি বই পড়তে পার?

করুণাঘন বলল, পারি।

গুড! আজ আমি তোমাকে বই দেব নিয়ে যেয়ো।

করুণাঘন হাত কচলায়। তখন সন্তোষ বলল, ভগবান কাউকে একেবারে মারেন না ছোটবাবু, সাত মেয়ের পর তো, এটি অষ্টম গর্ভ, সাতটা মেয়ের দুটো মরেচে জন্মের সময়।

থাক!

হ্যাঁ থাক। বলে সন্তোষ চক্রবর্তী চুপ করে বসে থাকল। কেন এসেছে তা ধরতে পারছে না বিজন। না বলে কয়ে হঠাৎ? সন্তোষ তার ছেলেকে বলল, তুই জানালায় গিয়ে দাঁড়া।

ছেলে চাইছিল তা। জানালায় দাঁড়িয়ে পরেশনাথ মন্দিরের চুড়ো, বাইরের পাঁচিলের উপর বেড়াল, কাক, শালিক দেখাতে লাগল। কবিতা ঢুকল ঘরে। সন্তোষের ছেলেকে দেখে অবাক হয়ে গেল, এত বড় হয়ে গেছে!

হ্যাঁ বউদি।

সবাই ভাল?

হ্যাঁ ভাল, সবাই ভাল।

মেয়েরা?

কপালে আছে, ভাল-মন্দ জানি নে।

বিয়ে দিতে ক'জন?

দুটো এখনো, তবে আমার উপায় নেই।

উপায় নেই মানে।

বিয়ে দেবার কোনো উপায় নেই।

তা বললে হয়!

সন্তোষ বলল, সর্বস্বান্ত হব বউদি, ছেলেটার জন্য তো কিছু রাখতে হবে, ওরা জুটিয়ে নেবে।

এসব কথা বিজন আগেও শুনেছে। বেলা এগারোটার সময় ছুটির দিনে তার এসব ভাল লাগছিল না। সন্তোষের কথার ধরনই এইরকম। নিজের দারিদ্রকে পুঁজি করে লোকের কাছ থেকে কিছু না কিছু আদায় করতে চায়। কবিতাও চুপ করে গেছে। সন্তোষের কথায় সে নিজেকে যেন অপরাধী মনে করছিল। সন্তোষের ওই অবস্থার জন্য দায়ী তারা। তাদের একটি পুত্র একটি কন্যা। তারা কত ভাল আছে। ইস! কেন ভাল আছে তারা?

বিজন জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ যে?

অনেক দিন কোনো যোগাযোগ নেই।

যোগাযোগ কী করে হবে?

সন্তোষ বলল, না মানে আমিও রাখতে পারিনে, আসলে দুর্ভিক্ষর পরে জম্মো, আমার গা থেকে দুর্ভিক্ষ ছাড়াচ্ছে না।

কোন কথা কোন কথায় নিয়ে গেল সন্তোষ। লোকটার সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি। কিন্তু আচমকা বসিরহাটের কাঁচাগোল্লা নিয়ে এল কেন? বিজন বলল, খেয়ে যাবেন।

না ছোটবাবু, এখেন থেকে যাব বিড়লা তারামণ্ডলে, ওরে দেখাব।

কবিতা জিজ্ঞেস করল, ছোটমেয়েটাকে আনতে পারতেন।

কী হবে?

তারামণ্ডল দেখত।

সন্তোষ হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসে, বলে, মেয়েমানুষের আবার তারামণ্ডল! কবিতার মুখ কালো হয়ে গেল। উঠেই গেল। সন্তোষ চক্রবর্তী ডাকল, বউদি বসুন, আপনাদের তো বাড়ি হলো।

হলো, বলে কবিতা চলে গেল।

সন্তোষ বলল, কবে যাবেন?

কোথায় আমতলিতে?

না ছোটবাবু, নতুন বাড়িতে।

যাব, দেখি! বিজন উদাসীন হয়ে বলল। আসলে বাড়ির কথা সে বাড়াতে চাইছে না। সন্তোষকে দেখে তো আমতলির বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। বাড়িটা দখলই করে নিল লোকটা। আর উঠবে না। সেও যাবে না। বিজন চুপ করে আছে। সন্তোষকে এই মুহূর্তে আর পছন্দ হচ্ছে না।

সন্তোষ জিজ্ঞেস করে, কত পড়ল?

পড়ল মানে?

মানে খরচ, ক'লাখ?

বিজন বলল, সব হিসেব করিনি।

মোজাইক করেছেন না পাথর?

বিজন বলল, পাথর, মোজাইকও হয়েছে ডাইনিং স্পেস-এ।

বাহ্! বাথরুমে পাথর তো?

হুঁ।

টাইল্‌সও লাগানো হয়েছে?

হয়েছে। বলে বিজনের মনে পড়ে গেল কী দিয়ে ভাত খেয়েছিস এর কথা। ওই আমতলিতেই কাহার বালক চানু গরমের দুপুরে তাকে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার দুপুরের খাদ্য তালিকা জানতে চাইত। চানুর কোনো দুপুরে ভাত জুটত কোনো দুপুরে জুটত না। বিজনের কাছে ডাল ভাজা, তরকারি, মাছ, টকের কথা শুনে শুনে নিজের খিদে মেটাত যেন সে। সন্তোষ চক্রবর্তী গৃহহীন মানুষ, পরের বাড়িতে পরের করুণায় বাস করে। বিজনের কাছ থেকে শুনতে শুনতে নিজগৃহের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে একটু একটু করে।

সন্তোষ জিজ্ঞেস করল, দোতলা করবেন না?

করব।

হ্যাঁ করে নিন, ঝুল বারান্দায় দাঁড়াবেন।

আর? বিজনের বিচিত্র লাগে সন্তোষকে। এই সব খোঁজ নিতে কাঁচাগোল্লা হাতে করে ছেলেকে নিয়ে সক্কালে তার বাড়িতে হানা দিল? সন্তোষ জিজ্ঞেস করল, দেওয়ালে ডিসটেম্পার?

হ্যাঁ, হাল্কা গ্রিন রং।

খুব সুন্দর হয়েছে ঠিক, বলছি দেওয়াল একেবারে প্লেন হয়ে গেছে?

তাই তো হবে।

জানি প্রাইমার প্যারিস আবার প্রাইমার তারপর রং?

কী করে জানলেন?

সায়েবদের ঘর এই রকমে হতো তো, কোম্পানিতে।

বিজন জিজ্ঞেস করল, জমিটমি কিনলেন?

না, জমি কেনার উপায় নেই, বাংলাদেশিরা বর্ডার পার হয়ে জমি কিনে আবার ওপারে চলে যাচ্ছে।

তা হয় নাকি?

হচ্ছে ছোটবাবু, ওদের হাতে অনেক টাকা, এসমাগলিং-এর টাকার কোনো হিসেব থাকে?

বিজন বলল, ওর ভিতরেই তো কিনতে হবে।

পারব না, বলছি আপনার বাড়ির সামনে বাগান করবেন?

করব।

গ্যারেজ করবেন তো?

করব।

একটা মারুতি কিনে নেবেন।

বিজন বলল, নেব।

তাহলে তো আপনাদের আর একটা বাড়ি হলো।

হলো।

সন্তোষ চক্রবর্তী বলল, যাদের হয় এমনি হয়, কথায় বলে ভগবান যারে দেন—

বিজন বলল, হ্যাঁ তাই, আমি আর একটা ফ্ল্যাটও বুক করেছি।

কোথায়?

এই কাছেই, ডিসেম্বর নাগাদ পজেশন পাব। বিজন ইচ্ছে করেই তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিল। পা নাচাতে লাগল বিজন। লোকটা কী করতে এসেছে? সকাল বেলায় মিষ্টি নিয়ে এল কি তার বাড়ির ঐশ্বর্যের কথা শুনতে। অদ্ভুত মানুষ! তাকে না শুনিয়েছিল তার কোন পূর্বপুরুষ ওর পূর্বপুরুষের জমি গ্রাস করেছিল পূর্ববাংলায়! সেই কারণে ও ছলে দখল করেছে তাদের আমতলির পাকা দালান।

সন্তোষ একটু কুঁকড়ে গেছে, বলল, আমার একটা নিবেদন আছে ছোটবাবু।

বলুন। বিজন সতর্ক হয়ে ওঠে।

আমি কিছু দিতে চাই।

দিতে চান মানে?

মানে বাড়িটায় বসে আছি, আমার খুব উপকার করেছিলেন আপনার বাবা, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, এমনি নেব?

নিতে কে বলেছে, আমি তো চাইছি নিজের ব্যবস্থা করুন, অনেক বছর তো হল।

তা তো পারলাম না, আর আপনাদেরও হয়েছে, পায়ের তলায় মাটি হয়েছে, আমার দ্বারা আর হবে না, মেয়ের বিয়ে ছেলের লেখাপড়া, ওর জন্য তো কিছু রেখে যেতে হবে ছোটবাবু।

না থাকলে রাখবেন কী?

রাখতে তো হবে, আপনারা ও বাড়িতে আর যাবেন না, আমি হাজার পনেরো দিচ্ছি, আপনি সই করে দিন।

সই করে দেব মানে?

আমি কাগজপত্তর সব রেডি করে এনেছি, টাকা যতটা পেরেছি ধার ধোর করে নিয়ে এসেছি, আপনি সই করে দিন, আমি বাড়িটা আমার ওই ছেলের জন্য রেখে যাই। বলতে বলতে সন্তোষ চক্রবর্তী তার কাঁধের সাইড ব্যাগ থেকে ফাইল বের করল। বিজন দেখতে লাগল। ফাইল খুলে স্ট্যাম্প পেপারে টাইপ করা কাঁচা দলিল বের করল, তার দিকে বাড়িয়ে দিল, নিন ছোটবাবু। আপনি সই করে দিন, আমি পনের হাজার দিচ্ছি, বাড়িটা একেবারে পেয়ে যাই।

পনেরো হাজারে?

এর বেশি আমি কী দেব?

এনেছেন?

হ্যাঁ এনেছি। সন্তোষ চক্রবর্তীর মুখে হাসি ফুটল, এনেছি ছোটবাবু।

বিজন হাসতে হাসতে বলল, ওটা তো এই ক'বছরে থাকার দাম, এক পয়সাও তো দেননি, টাকা দিয়ে দলিল ফেরত নিয়ে যান।

তার মানে?

মানে বুঝিয়ে দিতে হবে, পনেরো হাজারে অতটা জমি বাড়ি হয়?

মুহূর্তে সন্তোষ চক্রবর্তী সিধে হয়ে গেল। বিজন বোধহয় সাপের লেজেই পা রেখেছে, সন্তোষ বলল, আমি ফ্রিতে পাচ্ছি, টাকা দেব কেন, আপনি এসে বাড়ির দখল নিয়ে নেন, অ্যাই করুণা এদিক আয়, চ।

বিজন কিছু বলতেই পারল না। সন্তোষের তেজ খুব। বলল, আপনাদের অনেক আছে, আরো হোক, ভেসে যান টাকায়, কিন্তু চক্কোত্তিরে পারবেন না, এখন থেকে ও বাড়িতে পা দিতেই দেব না, ঢুকতেই দেব না, ওটা আমার বাড়ি, আমার।

তিন

ছুটির দিনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। বাইরে মেঘ সেজেছে ঘন করে। ছোট ফ্ল্যাটের ভিতরে মেঘের অন্ধকার এসে ঢুকেছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তারা এখন নিশ্চিন্ত হয়েছে যে তাদের যেতে হবে না জগৎপুরে। কলকাতার এখানে তারা লালিত। কলকাতায় তারা পালিত। তারা কলকাতা ছেড়ে ধূলিহরে ফিরবে কেন? ধূলিহরের সঙ্গে তাদের যোগ কোথায়? সাতক্ষীরা পূর্ববঙ্গকে তারা বিদেশ বলেই জানে।

মেয়ে বড়। মৌটুসির ডাক নাম পাখি, জিজ্ঞেস করল, লোকটা যে চলে গেল বাবা?

পাখির বয়স বছর ষোলো, মাধ্যমিক দিয়ে এইচ. এস.-এ ঢুকেছে। একা একা স্কুল যাওয়া শুরু করেছে। তাদের জগৎপুরের ধূলিহর যখন আরম্ভ হয়েছিল, বছর সাত আগে, তখন পাখি ফোর পার হয়েছে সবে। আশ্চর্য লাগত। এখন সে বুঝেছে জগৎপুরে ধূলিহর নির্মাণ তার বাবার বড় একটা ভুল। মানুষ একবার ভুল করলে তা সংশোধন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কী রকম জগৎপুরের লোকগুলো। দুধকুমার গৌড়েশ্বর—হা হা করে হাসে প্রাইভেট টিউটর শুভব্রত। ওখানে ঠিক দুধসাগর ক্ষীরসাগর আছে পাখি, ভালই হবে।

কে যায় ওখানে, আপনি যান।

শুভব্রত বলে, তুমি গেলে আমাকে যেতে তো হবেই।

কেন কেন?

তোমাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়াবে কে বলো, কেই বা তোমাকে কবিতা পড়তে দেবে?

ওখানে কি মানুষ থাকে না?

কেন থাকবে না, তাহলে দুধকুমারের কাছে পড়ো।

পাখি খিলখিল করে হাসে, বলে, দুধকুমার বলতে কী ভাল লাগে না?

মোটেই না, দুধকুমার গৌড়েশ্বর, ভগবান—এসব স্বাধীনতার আগের নাম, ক্লাইবের আমলেরও বলা যায়।

তাতে কী হয়েছে, আমার তোমাকে দুধকুমার বলতে—। পাখি আর পারে না। কতদিন ধরে চেষ্টা করছে আপনি থেকে তুমি তে নামবে, পারছেই না। এক একবার হয়ে যাওয়ার পরই—ইস! সে সতর্ক হয়ে ওঠে। বলে, সার, আপনার কবিতা একদম বোঝা যায় না, এম. সি. এ. করছেন, সায়েন্স সাবজেক্ট পড়াচ্ছেন আর কবিতা লিখছেন।

বেশ করছি, তুমিও লেখো।

আমি পারি না দুধকুমার সার।

তখন কী আশ্চর্য চোখে তাকিয়েছিল শুভব্রত তার মোটা কাচের চশমার ভিতর দিয়ে। কতরকমে তার আকর্ষণ, সায়েন্স ফিকশন, অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আবার বাংলাও। বনলতা সেন পড়েছ পাখি?

পাখি মাথা নেড়েছে, না তো।

বাড়িতে নেই জীবনানন্দের বই?

আছে, বাবা তো লিখত কবিতা।

জানি, কিন্তু তোমার বাবাকে দেখে একদম মনে হয় না হি ইজ আ পোয়েট, মনে হয় কবিতা উনি চেনেন না।

চেনেন খুব চেনেন, আমার মায়ের নামই কবিতা।

সে তো আমি জানি, তুমি কখনো কিন্তু বোলো না আমি কবিতা লিখি।

কী হবে বললে?

আমার চাকরিটি যাবে।

বললেই হলো—!

পাখির খুব ভাল লাগে টিচারকে। টিচারকে মনে মনে সে দুধকুমার নাম দিয়েছে। সে একটা চিঠি যদি লেখে, লিখবে দুধকুমার সার—। আর কিছু ভাবতে পারে না পাখি, কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। নাসারন্ধ্র স্ফূরিত হয়। বাবা সব ভুল করেছে, ওখানে কেউ থাকতে পারে না, কিন্তু বাবা ওখান থেকে একটা নাম এনে দিয়েছে পাখিকে। মনে মনে সে জপে দুধকুমার দুধকুমার। দুধকুমার না এলে পাখির ভাল লাগে না।

পাখি বাবাকে জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছিল দুধকুমার?

কই দুধকুমার? বিজন অবাক, বলল, ও তো সন্তোষ চক্রবর্তী।

পাখি জিভ কাটল। ইস! মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওই নামটা। যদি বেরোত শুভব্রত! এইচ, এস. তারপর জয়েন্ট এনট্রান্স—পাখির টার্গেট অনেকদূর, কিন্তু যদি দুধকুমার থাকে। যাক গে! পাখি জিজ্ঞেস করল, চলে গেল হঠাৎ?

বিজন বলল, মনটা খারাপ হয়ে গেল।

কেন বাবা?

লোকটা ঠকাতে এসেছিল সাত সকালে, ঠকলাম না।

অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে পাখি। ইস বাবার এই কথা যদি দুধকুমার শুনত! দুধকুমার দুধকুমার আমার বাবা অদ্ভুত! সে জিজ্ঞেস করল, ঠকলে তোমার ভাল লাগত?

বিজন বলল, না, তা লাগবে কেন?

ঠকলেও মন খারাপ হতো?

বিজন বলল, হ্যাঁ।

তাহলে তুমি কী করবে বাবা, তোমার দুধকুমারকে দেখে এস।

চমকে ওঠে বিজন। সন্তান কি ভগবান? সব মানুষের ভিতর ভগবান থাকে? মানে ভগবানের প্রাণ থাকে আবার অন্য পাঁচটা মানুষের জানও থাকে। ভগবানের প্রাণ দিয়ে মানুষ সন্তান আনে পৃথিবীতে। পাখির ভিতরে তা আছে। পাখি কি তাকে সতর্ক করে দিচ্ছে? পাখি মনে মনে সব জেনে বসে আছে ঠিক। বিজন প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয়, বলল, সন্তোষ চক্রবর্তী লোকটাকে দেখলে মায়া হয়, তাই না?

হয়, কীরকম ভাবে বসেছিল তোমার সামনে!

কী রকম?

বলব বাবা, বলছি, বলছি, যেন কাছারিতে খাজনা দিতে এসেছিল।

এ আবার কী কথা?

খাজনা আদায়ের কাছারি নামে একটা বই আছে। চীন দেশে বিপ্লবের আগে—বলে পাখি টের পায় জেরার মুখে পড়ল। বইটা তাকে তার দুধকুমার দেখিয়ে ছিল। দুধকুমারের বাবা জেলখাটা বিপ্লবী। ধরা পড়েছিলেন সুবর্ণরেখা তীরের এক গ্রামে। দুধকুমারের জন্ম তারপরে। তার মা বাবার বিয়ে অনেক বয়সে। কী আশ্চর্য এক প্রেমের কথা বলে দুধকুমার। মা বসেছিলেন বাবার জন্য। বাবার মুক্তি হলো, তারপর বিয়ে সেই ১৯৮২-তে। মা চাকরি করতেন একটা ইস্কুলে। বাবা ফিরে এসে কবিতা আর গান নিয়ে থাকেন। দুধকুমারের বাবা বলেন, বিপ্লবীর অবলম্বন হতে পারে এই সব, আর কিছু না।

ইস! শুধু দুধকুমার দুধকুমার! আসলে যে সে শুভব্রত। তার বাবা দেবব্রত। শুভব্রত হয়ে গেল দুধকুমার। মায়ের ছিল প্রাইভেট ইস্কুল, দুধ খেয়েছে সে কবে? তবু তার চেহারা কত সুন্দর। দুধকুমার দুধকুমার!

বিজন জিজ্ঞেস করল, ও বই এখন পাওয়া যায়?

সার দেখিয়েছিলেন।

বিজন বলল, খুব ভাল অঙ্ক জানে তাই না?

সব সাবজেক্টই জানে।

বিজন বলল, সন্তোষ চক্রবর্তীকে দেখে তোর তাই মনে হলো?

কেন এসেছিল বাবা সঙ্গে ওই বাচ্চাটা?

বিজন তখন বোঝাতে লাগল পাখিকে। শুনতে শুনতে পাখির চোখ ছলছল করতে লাগল। কেঁদেই ফেলল পাখি। কাঁদছিস কেন মেয়ে? কী হল রে তোর? পাখি বলল, মেয়েদের কি কোনো দাম নেই বাবা।

তাই কি রে হয়, দেশ চালাচ্ছে মেয়েরা।

পাখি বলল, ছেলের জন্যই বাড়িটা কিনতে হবে ওঁকে?

কী করবে বল?

পাখি চোখ মুছতে মুছতে বলল, তুমি দিয়েই দিতে পারতে, ও বাড়িতে তো আমরা আর যাব না, কী করে যাব, থাকতে পারব গিয়ে?

বিজন মেয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এত নরম ওর মন। এত নরম হলে কি চলে? কিন্তু কাঁদল কি সে সন্তোষের আনা দলিলে সই করেনি তাই, নাকি সন্তোষ তার মেয়েদের জন্য কিনবে না তা জেনে?

পাখি বলল, দুটোই খারাপ লেগেছে বাবা, তুমি দিয়েই দাও।

ওরা তো রয়েছে, আমি তুলতে যাচ্ছি না।

কিন্তু বাড়িটা ওর ছেলে তো পাবে না, দরকারে আমরা তুলে দিতেও পারি ইচ্ছা হলে, সে আশঙ্কা থাকবে, কী রকম বুড়ো চাষির মতো বসেছিল বাবা, জমিদারের কাছে খাজনা দিতে এসেছে যেন।

বিজন বলল, আরো বড় হ বুঝবি, আমার ওই বাড়ি তো আমি সেল করে দিচ্ছি, আমতলিটা দিয়ে দেব?

পাখি এসব শিখেছে দুধকুমারের কাছে। তার বাবা গান গায়। কবিতা লেখে, আর টিউশানি করে। চাকরি হয়নি। মায়ের আয়ে সংসার চলে। দুধকুমার খুব কষ্ট করে বড় হয়েছে। সাইকেলে কলকাতা চক্কোর দিয়ে বেড়ায়। বাস ভাড়া এক পয়সাও খরচ করে না। তার মা বাবার মন সেও পেয়েছে। পাখি ওর কথা শুনতে শুনতে ওর মতো হয়ে যাচ্ছে। তার এখন মনে হচ্ছে মানুষকে সাহায্য করা উচিত। মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। ত্যাগ করা উচিত। এতে তার নিজেরও ভাল হবে। পাখি তার বাবার পাশে উঠে এল, তুমি ওকে দিয়ে দাও।

লোকটা খুব চতুর, আচমকা এসে বলছে দলিলে সই করে দিতে।

বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে এরকম হতে হয়। পাখি কথাটা বলে ফেলেই বুঝল একথা তার নয়, দুধকুমারের। কী প্রসঙ্গে কবে বলেছিল শুভব্রত স্যার—দুধকুমার। তার মনে গেঁথে গিয়েছিল। দুধকুমার দুধকুমার! ভাল ভাল কথা কত বলে। সব যত্ন করে রেখে দেয় পাখি।

বিজন হেসে বলল, ঠিক বলেছিস, তুই তো দেখছি বড় হয়ে গেলি।

বাহ বড় হলে বড় হব না?

তা তো হবি! বিজন কথাটা বলে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সন্তোষ চক্রবর্তী এখন গেল কোথায়? তারামণ্ডল? ছেলেকে আকাশ ভরা সূর্যতারা দেখাবে। তারপর ব্যর্থতা বয়ে বাড়ি ফিরবে। নাকি এখনই ফিরে যাবে বাড়িতে? বিজন বলল, কী করব বল দেখি?

দিয়েই দাও, ত্যাগ করলে না হয়।

এসব তুই কবে শিখলি?

পাখি সতর্ক হল। দুধকুমারের কাছে শোনা কথাগুলো আর বলবে না। কিন্তু তার ঠোঁটে এসে যাচ্ছে যে। কী করবে সে? বলল, বাবা, যাদের আছে তারা যদি না দেয়, গরিবরা কেড়ে নেয়।

হা হা করে হাসল বিজন, বলল, দারুণ বলেছিস রে, দেখে যাও মেয়ে তোমার বড় হয়ে গেছে, এতো মহাত্মা গান্ধীর পথ, কিন্তু কেউ কি ছাড়তে চায়, যাদের আছে তারা ত্যাগ করবে কেন?

পাখি বলল, তাহলে মানুষ হিংসায় যাবে।

হিংসা কি ভাল?

ভাল না বাবা, কিন্তু না পেতে পেতে তাই তো হয়।

সুতরাং সন্তোষ চক্রবর্তীকে বাড়িটা দিয়ে দিতে হবে, তাহলে ওই গৌড়েশ্বরকেও দিয়ে দি বাড়িটা, ওর তো অমন বাড়ি নেই।

পাখি বলল, বাবা আমার কষ্ট হল তাই বলেছি, আমি আর কিছু বলব না তোমাকে। বলতে বলতে হাঁটল মেয়ে। বিজন হাসল মনে মনে। সে কি বুঝতে পারছে না, তার মন টের পাচ্ছে না কি সব, এই সব কথা কি এমনি বলল পাখি?

পাখি ফোন ধরেছে ওঘরে। কার ফোন? স্যার স্যার বলছে। তার মানে শুভব্রতর। অদ্ভুত ছেলে! সাইকেলে এখান থেকে এয়ারপোর্ট যায়, আবার এয়ারপোর্ট থেকে শিয়ালদাও যায়। জগৎপুরের ভগবান যেমন আটচল্লিশ ঘণ্টা সাইকেলে এও দিনে পাঁচ ছ ঘণ্টা তো বটেই। বেশি ছাড়া কম, না। বিজন বুঝল, এসব ওই টিচারের শিক্ষা। সে চায়নি অত কম বয়সের কাউকে রাখতে, কিন্তু শুভব্রতর তো নাম আছে টিচার হিসেবে। দশ জায়গায় টিউশানি করে বেড়ায়। ওর ছাত্রছাত্রীরা রেজাল্টও ভাল করে। বিজন ভাবল মেয়ের কথায় কান পাতে। গলার স্বর কত নামিয়ে কথা বলছে এখন পাখি। বিজন ভাবল, শোনে মেয়ের কথা। বাবা হিসেবে সতর্ক হওয়া তো দরকার। তারপর ভাবল সতর্ক হয়ে সে কী করবে? এই বয়সে সেও কি নিজেকে আটকাতে পারল? আর এ তো হাওয়া ভরা সোনালি সন্ধ্যার কথা। এ তো সোনার বরনি মেয়ের কথা। তার কন্যাটি কী সুন্দর! অত নরম মন ওর!

বিজন বউকে ডাকল, শুনে যাবে পাখি কী বলছে।

কবিতা এল আঁচলে হাত মুছতে মুছতে। গ্যাস ওভেনের সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখ লাল। কপালে ঘাম বিন্দু, বলল, হঠাৎ চলে গেল যে?

বিজন বলল, শুনবে?

শুনল কবিতা, বলল, আমাকে ডাকলে না কেন, বাচ্চাটা সকালে এল, না খেয়ে গেল, তুমি কেন কড়া করে বললে?

কী বলব?

পরে আসতে।

নাকি পাখির মতো বলব বাড়িটা দিয়ে দিতে।

ও ঠিক বলেনি বলছ, কিন্তু অমন কথা বলতে তো পেরেছে।

বিজন বলল, হ্যাঁ পেরেছে।

এমন মন তো সবার হয় না।

আমার ঠাকুর্দা দুর্গাদাসের ছিল, বাবারও ছিল।

তাঁরা ওর ভিতরে আছেন।

বিজন বলল, কী করব?

কিছুই করতে হবে না, তুলতেও হবে না আবার রেজিস্ট্রি করে টাকাও নিতে হবে না।

বিজন বুঝল এমন একটা সিদ্ধান্ত তারা অনায়াসে নিয়ে নিল। মেয়ে হয়েছে মায়ের মতো। কবিতার মন আছে। দু'জন একরকম, আর সে অন্যরকম। দেবে নাকি রাজেশ ত্রিপাঠীকে বসিয়ে। থাকুন।

পাখি এল, বলল, বাবা আমি একটু জগৎপুর যাব, ধূলিহর।

কেন, ও বাড়ি তো রাখব না।

রাখবে না তাই যাব দুধকুমারকে দেখতে।

দুধকুমার! দেখিসনি?

না তো কবে দেখলাম?

এ বাড়ি তো এসেছিল।

আমি ছিলাম না।

বিজন বলল, তাকে কি দেখার মতো, দেখলে ভয় পাবি।

পাখি হেসে বলল, তাই কি হয় দুধকুমার বলে কথা।

বিজন হাহা করে হাসল, ওই জন্যে? পাগলি! দুধকুমারকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।

চার

পাখির দুধকুমার মানে শুভব্রত বলল, তুমি ঠিক বলেছে পাখি, আবার ঠিকও বলনি, হ্যাঁ বাড়িটা দিয়ে দিতেই পারেন তোমার বাবা, কিন্তু এতে কি কিছু হয়, এভাবে কিছু হয়?

কী হবে?

দেশের পরিবর্তন?

পাখি বলল, ও মা আমি দেশের পরিবর্তনের কথা বলেছি নাকি দুধকুমার?

কী বললে?

পাখি জিভ কাটল, ভুল হয়ে গেছে স্যার।

ভুল হয়নি, তুমি কী বললে বলো আবার।

পাখি বলল, কী বলব বলছি আমি কি দেশের পরিবর্তনের কথা বলতে গেছি, আমি বলছি লোকটা খুব গরিব।

তা বুঝেছি, আর কী বললে শেষে?

কিছু বলিনি।

বলোনি তো?

না, না, না।

তুমি আমাকে কী বলে ডাকলে?

ডাকিনি তো।

তখন শুভব্রত বলল, মেনে নিলাম, আচ্ছা পাখি আমাকে কি তুমি দুধকুমার বল মনে মনে?

পাখি কেঁপে উঠল। মাথা নামিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। কী হবে এখন? তার মনের খবর যে জেনে গেল স্যার। পাখি চুপ করে থাকল। শুভব্রতও। দুজনের মধ্যিখানের শূন্যতাটুকু গোলাপি আলোয় ভরে গেল। পাখি মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। তখন তার মাথা স্পর্শ করল শুভব্রতর হাত, চাপা গলায় শুভব্রত বলল, তুমি কি আমার কথা ভাবো?

পাখি ঘাড় কাত করল। .

শুভব্রত বলল, আমিও।

পাখি বলল, আমার ভয় করছে স্যার।

আমারও।

তাহলে কী হবে?

শুভব্রত চুপ করে থাকল, তারপর পাখির মাথা থেকে হাত সরিয়ে এনে কোলের উপর ফেলে রাখা হাত স্পর্শ করল, কী হবে পাখি, কিছু না, ভয় পেয়ো না।

পাখির দুচোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে যাচ্ছিল। পাখি এখন শালোয়ার কামিজের ওড়না দিয়ে যে চোখের জল মুছে নেবে যে উপায়ও নেই তার।

শুভব্রত বলল, তুমি খুব ভাল পাখি, তুমি খুব নরম।

পাখি মাথা নিচু করে বলল, কী হবে স্যার?

স্যার না দুধকুমার।

পাখির খুব ইচ্ছে করছিল দুধকুমার যদি তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। তা তো হবে না। যদি হতো কী ভাল না হতো! কী আনন্দ হতো তার। সে মুখ নিচু করে ওড়নার কোণ দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে মুখ নিচু করেই বসে থাকল।

তুমি খুব ভাল পাখি! আবার বলল শুভব্রত।

পাখি অস্ফুটস্বরে বলল, আপনিও।

আমাদের বাড়ি একদিন তোমাকে নিয়ে যাব।

তা হয় নাকি? পাখি মুখ তুলল।

হবে হবে ঠিক হবে, হ্যাঁ, দেখি অঙ্কগুলো।

দেখতে হবে না, সব হয়েছে।

তুমি একদম অঙ্ক পারতে না, মনে আছে?

হুঁ।

এখন কী করে পারছ?

জানি না।

শুভব্রত বলল, তুমি কি সত্যি চাও ঐ বাড়ি লোকটা এমনি নিয়ে নিক।

হ্যাঁ তাই।

তাহলে কি লোকটা ছোট হয়ে যাবে না?

যে পারবে না দাম দিতে, তাকে তো পেতে হবে, কী করে পাবে?

লোকের দয়ায়?

দয়ায় পাওয়া কি ভাল না? পাখি জিজ্ঞেস করল।

না পাখি না।

ও যে পনেরো হাজার নিয়ে এসেছিল।

যাক গে, তোমার বাবা তো দেননি, কেন দেবেন?

কেন দেবে না? পাখি একেবারে টানটান হয়ে উঠল, লোকটাকে যদি দেখা যেত, বোঝা যেত কীভাবে বাবার সামনে বসেছিল।

শুভব্রত পাখিকে দেখছিল। কী ভাল না লাগছে! এতদিন যে ভাললাগা গোপনে গোপনে ছিল মনের ভিতর, তা এখন ডালপালা মেলে তাকে ঘিরে ধরেছে। পাখি তো তেমন সুন্দর বলা যাবে না। পাখির চেয়ে তার আর এক ছাত্রী সেন্ট মেরিজ স্কুলে পড়া ঋতুপর্ণা কত সুন্দরী। কিন্তু তার দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করে না রূপের গরব আছে বলে। সে একদিন তাকে বলেছিল, স্যার আপনি তো আমাকে দ্যাখেন না।

অবাক হয়ে গিয়েছিল শুভব্রত। ঋতুপর্ণার অ্যামবিশন নাকি ভারতসুন্দরী হবে, তারপর আরো উপরে যাবে। তার জন্য পাঁচ বছর বয়স থেকেই তার মা তার পিছনে পড়ে আছে। একদম নিয়মে ভরা জীবন। ভোর থেকেই সুন্দরী হয়ে ওঠার চর্চা চলতে থাকে। এ সব ঋতুপর্ণাই বলে, তাকে মা কোনোদিন তাকে মিষ্টি খেতে দেয় না। সেই কোন ছোটবেলায় খেয়েছে, এখন আর সে পাট নেই। ঋতুপর্ণার চেয়ে পাখি সুন্দর। পাখি তোমার কী খেতে ভাল লাগে, পাখি বলবে রাজভোগ, কমলা ভোগ। তাতে যদি মোটা হয়ে যাও? যাই যাব। ঋতুপর্ণা আমও খায় না। পাখি তুমি আম ভালবাস? খুউউব, হিমসাগর, গোলাপখাস, ল্যাংড়া...।

পাখি তুমি নাচ শেখ না?

পাখি মুখ তুলল, বলল, জানেন তো, ভরত নাট্যম, মা শেখায়।

পাখি আজ গল্প করি।

করুন গল্প। পাখি এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

শুভব্রত ভাবল কী গল্প করবে? কথা যে আর আসছে না। বুকের ভিতরটা কেমন ভার ভার লাগছে। পাখির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। পাখি তুমি ঋতুপর্ণাকে চেন? চেন না। ঋতুপর্ণা একদিন বলল, স্যার আমি সুন্দরী হব না।

কেন রে কী হলো?

উফ! আমার দম আটকে আসে, সকাল থেকে শুধু এক্সাইজ, শুধু ফুড কনট্রোল, এটা না ওটা না, আমার বেলা অবধি ঘুমোতে ইচ্ছে করে।

ঘুমোবি।

হবে না, মোটা হয়ে যাব।

স্বাস্থ্যচর্চা তো ভাল।

একদম ভাল না, আমি একদিন আপনার সঙ্গে বেরিয়ে শুধু রসগোল্লা খাব।

হা হা করে হেসেছিল শুভব্রত, বলেছিল হবে, ভাল রেজাল্ট কর, তোকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা এনে দেব।

পাখি বলল, কী ভাবছেন স্যার?

তুমি আমাকে দুধকুমার বললে না?

না তো, কখন?

এই যে এখন?

ওমা আমি তো কিছুই বলিনি।

মনে মনে বলছিলে না?

পাখি বড় বড় দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল তার দুধকুমারের মুখের দিকে। সারাদিন সাইকেলে টো টো করে। ওই যে এম. সি. এ. পড়ে বাইপাসের ধারে কোন কলেজে, সেখানেও সাইকেলে যায়। পাখির ভয় করল। বাইপাসে কত গাড়ি। সব যেন চোখ লাল করে ছুটে আসে। একটু এদিক ওদিক হলেই — উফ্! পাখি আর ভাবতে পারে না, বলল, আপনি সাইকেলে অতদূর যাবেন না।

কতদূর?

কলেজে যান না?

হাসল শুভব্রত, বলল, সাইকেল আমার কথা শোনে।

পাখি বলল, আমার ভয় করে।

ভয়ের কী আছে পাখি, ভীড় বাসে আমি যেতে পারি না, কত আরামে যাই সাইকেলে, কোনো খরচ নেই।

পাখির চোখে মেঘ এসে যায়। সে অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে। স্যারের বাড়ির কথা শুনেছে সে। সাইকেলে কত পয়সা বাঁচে। সে প্রসঙ্গ বদলে দিল, আমাদের জগৎপুরে একটা লোক আছে, ভগবান।

জানি তো।

সে নাকি বাহাত্তর ঘণ্টা সাইকেলে থাকতে পারত।

শুভব্রত বলল, গ্রামের দিকে অমনি লোক থাকে।

আপনি পারবেন?

জানি না, কিন্তু সাইকেলটার তো কষ্ট হবে।

আপনি বাহাত্তর ঘণ্টা সাইকেলে থাকুন, আমরা সবাই দেখতে যাব।

পাখি তুমি একেবারে ছোট্ট।

পাখি বলল, তার মানে?

তুমি একেবারে মুনিয়া পাখির মতো।

এসব বলবেন না। পাখি তার বিনুনি সামনের দিকে টেনে দুই আঙুলে নাড়াচাড়া করতে লাগল, বলল, আমি শুধুই পাখি।

মোটেই না, বাহাত্তর ঘণ্টা সাইকেল! হাহা করে হাসল শুভব্রত, আমি কি তোমাদের জগৎপুরের ভগবান?

না, তা নয় তবে—। পাখি চুপ করে গেল, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, জানি না যান।

গল্প হলো এইরকম। শুভব্রতও উঠল। আর কত সময় থাকবে? যাওয়ার সময় তাকে হোম টাস্ক দিয়ে বলে গেল, তুমি খুব ভাল।

পাখি বলল, আর একজনও।

সে কে?

জানি না যান।

শুভব্রত চলে যেতে পাখি থম মেরে বসে থাকল। শুভব্রতদের বাড়িতে একটা মোবাইল ফোন। বাড়িতেই থাকে। ওটা বাড়ির ফোন। শুভব্রতর একটা নিজস্ব ফোন থাকলে বেশ হতো। পাখি কথা বলতে পারত। না, তা ভাল হত না। শুভব্রত তখন হয়ত সাইকেলে ছুটছে বাইপাস ধরে। ফোন ধরতে গেলে—। দরকার নেই। শুভব্রতর ফোন নেই তাই ভাল।

বাবা বসে আছে জানালার ধারে খাটে। মা টিভির সাউন্ড কমিয়ে তামিল চ্যানেলে ভরতনাট্যমের একটা প্রোগ্রাম দেখছে। পাখি বাবার পাশে এসে বলল, তাহলে বাবা আমাদের ও বাড়িটা কী হবে?

বিজন বলল, আমতলির বাড়ি?

হ্যাঁ, কী হবে সে বাড়ি?

থাকবে অমনি।

পাখি বলল, বাবা একদিন আমতলি যাবে?

ইচ্ছে হয় না।

কেন বাবা?

মন থেকে সরে গেছে পাখি।

আমরা যাই গিয়ে ওকে দিয়ে আসি বাড়িটা।

তা হয় না রে পাগলি মেয়ে, এ কি তোর খেলনা পুতুল যে দিয়ে দিলেই হলো, এর নাম জমি, বাড়ি—।

পাখি চুপ করে থাকল। তারপর ভাবল সত্যিই তো কেন দেবে? বাড়িটা তাদেরই তো। লোকটা এমনি কেন নেবে? বিজন মেয়েকে দেখতে দেখতে বলল, হঠাৎ তোর এমন মনে হচ্ছে কেন?

পাখি বলল, আমরা তো যাবই না, তাতে লোকটা যদি আনন্দ পায় পাক।

জানিস না ওর মেয়েরা কেউ পাবে না।

পাখি বলল, ওটা ভাল না, থাক বাবা, তাহলে জগৎপুরে নিয়ে চলো।

যাবি, কী করতে যাবি?

দেখে আসব, ঘোরাও তো হবে।

কী দেখে আসবি, ও জায়গা কি দেখার মতো?

পাখি বলল, তোমার ভগবান সাইকেলওয়ালা আর দুধকুমারকে।

দুধকুমার কালপরশু আসবে মুন্নার সঙ্গে।

মুন্না কে?

মুন্নার পরিচয় শুনে পাখি বলল, একেই দিয়ো।

কেন রে?

লোকটা ভাল তো।

ভাল লোক খারাপ হয়ে যাবে যে।

মোটেই না, ভাল লোক খারাপ হয় না।

বিজনকে ফোন করেছিল দুধকুমার। মুন্না মানে রাজেশ ত্রিপাঠী ও বাড়ি পাবে না তা ঘোষণা করে দিয়েছে গৌড়েশ্বর। মুন্না নাকি আর একজন রিলেটিভ নিয়ে গিয়েছিল বাড়ি দেখাতে। গৌড়েশ্বর ঢুকতে দেয়নি। দুশো টাকা দেবে বলেছিল দেখানোর জন্য, তবু দেয়নি। মুন্না এখন দুধকুমারকে ধরেছে। দুধকুমার আসবে।

এল দুধকুমার পরের দিন। সঙ্গের লোকটি কী নিরীহ! অনেকটা কার মতো

যেন? বলতে পারবে না পাখি, কিন্তু কারোর একটা মতো, যে খুব ভাল। সে কি শুভব্রত? শুভব্রতর বয়স হলে কি এমনি হয়ে যাবে? মোটেই না। ছ ফুট উঁচু, মোষের মতো কালো শরীরের দুধকুমারকে দেখে পাখির আর হাসি ধরে না, সে বলল, ইস কাকু, আপনি হাঁটলে ভূমিকম্প হবে।

হবে রে খুকি, তাই বিশেষ হাঁটিনে।

হাঁটেন না তো কী করেন?

দুধকুমার বলল, গড়াগড়ি খাই, বাহ্ তুই খুব ভাল মেয়ে, ও দা'বাবু তোমার মেয়ে লক্ষ্মী, ভাল করেছ ও বাড়ি বিচে দিবা মনে করে, ও ওখেনে থাকতি পারবেনি।

বিজন বলল, কী করেছে গৌড়েশ্বর?

তা তো শুনছে দা'বাবু, তুমি কি এরে বেচবা না?

বিজন বলল, কী করি বলো দেখি দুধকুমার।

এ আমার লোক, এরেই বিচতে হবে তুমার, লোন নেচ্ছে, এক্কেরে নগদানগদি কেনাবেচা, গৌড়া হটাও দেখি, হটাও।

পাঁচ

মুন্না মানে রাজেশ ত্রিপাঠী কথা নিয়ে গেল। তার কাছে জমি বাড়ির কাগজ পত্র সব পৌঁছেছে, দুধকুমার দিয়েছে। দুধকুমার মনে হয় অনেক সেট ফোটো কপি করেছে। কাগজ দেখিয়েই সে বাড়ি দেখাচ্ছে। গৌড়েশ্বর এরই ভিতর একটা লোক পাঠাল। লোকটা এসেছে ভোরবেলায় প্রায়। বলল, বনগাঁ থাকে, সাড়ে চারটের ট্রেন ধরেছিল।

ছুটির দিনে তো বেলা অবধিই ঘুমোয় মানুষ, বিজনের তা হয় না। সে আর তার মেয়ে উঠে বসেছিল। পাখি তার অভ্যেসই পেয়েছে, ভোরে উঠে বই নিয়ে বসে। পড়ায় মন না বসলে গান শোনে। সেতারের সিডি চালিয়ে দিয়ে বলে, বাবা সকালটায় কী সুন্দর হয়ে থাকে সব কিছু।

তখন এল শীর্ণকায় বছর চল্লিশের একটা লোক, সার আমাকে গৌড় মণ্ডল পাঠিয়েছে।

বলুন।

লোকটা বলল, বাড়ি পছন্দ হয়েছে।

কে কিনবে, আপনি?

নো সার, আমি তাহলে সবটা বলি।

লোকটা বসে ছিল বসার ঘরে। বিজন তাকে ডেকে নিল জানালার ধারে।

পাখি উঠবে উঠবে করে ও ওঠে না। লোকটার পরনে একটা আধময়লা টেরিকটনের প্যান্ট আর গায়ে হাফহাতা কম ঝুলের পাঞ্জাবি। মাথার চুলে অল্প পাক। মুখখানিতে নানারকম ভাব। খুব চতুর আর সতর্ক মনে হলো বিজনের। লোকটা ঘরে ঢুকে সব কিছু কেমন বুঝে নিচ্ছিল, কোথায় কী দেখে নিচ্ছিল। সে বলল, আজ্ঞে সার আমার নাম গগন, গগন মণ্ডল।

কোথা থেকে আসছেন?

বললাম তো বনগাঁ, তবে প্রপার বনগাঁয় থাকি না, কাল ছিলাম কলকাতা আসার ফার্স্ট ট্রেন ধরব বলে।

কী করেন?

ওই জন্যেই তো সার বলছি আমার যা কিছু সব দিনে দিনে।

কই বলেননি তো।

বলছি সার, আমি বনগাঁ শহরের লাইটম্যান।

লাইটম্যান মানে?

সন্ধেয় রাস্তার আলো জ্বালাই, এটা আমার ডিউটি।

কে নেভায়?

আর একজন আছে, সে করে দেবে আজ মানে নেভাবে সকালে।

পাখি দূর থেকে বলে উঠল, কী অদ্ভুত তো!

লোকটা হেসে বলল, অদ্ভুতই, আবার অদ্ভুত কেন হবে, আমি প্রেশার মাপতে পারি, মানে একাজটাও করি সার, আবার সুগারও মেপে দিতে পারি মেসিনে, এটাও করি।

বাড়ি কিনবেন?

আঁজ্ঞে না, যশোরের যোগীন কুণ্ডুর ছেলে অতীন কুণ্ডু।

যশোর মানে খুলনা যশোর?

ইয়েস সার, অতীন কুণ্ডু বাবা-মাকে নিয়ে আসবে এবার।

না বলছি খুলনা যশোর তো বাংলাদেশে।

ইয়েস সার।

বাংলাদেশের লোক এদেশে বাড়ি কিনতে পারে?

গগন মণ্ডল বলল, টাকা তো বাংলাদেশের লোকের, আর থাকতে না পেরে এতদিনে পাট তুলছেন অতীনবাবুরা, উনি বনগাঁয় ব্যবসা করেন অনেকদিন, বনগাঁয় বাড়িও আছে।

বিজন বলল, তা এখেনে আসতে চায় কেন?

বনগাঁয় বুন, মা বাবাকে রাখবে না, কী বুঝলেন সার, আমরা তো এখন অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশ করছি, আসলে পুলিশের ভয়ে বনগাঁ এড়াতে চাইছে,

জগৎপুরে কে খোঁজ পাবে, ভাববে বনগাঁ থেকে এসেছে।

কী ব্যবসা ওঁর?

হরেক রকম, এমনিতে একটা ওষুধের দোকান আছে, আরো আছে বোধহয় অন্য কিছু।

ওষুধের দোকান তো ভাল ব্যবসা।

হ্যাঁ সার, তবে এ দোকানটা চলেই না, কিন্তু ওনার টাকা প্রচুর, ওদেশের ব্যবসার টাকা আসে এদেশে।

বিজন বলল, আমার কাছে নিয়ে আসুন কথা বলব।

এ আবার কী কথা, আপনার বেচার বেচবেন, তাঁর কেনার কিনবেন, তিনি টাকা দিলেই হলো।

মাথা নাড়ে বিজন, না ভাই, তুমি কেন তার হয়ে বলতে এলে?

লাইটম্যান গগন বলল, আমি একটু আধটু দালালি করি সার, গৌড়াদার শালির বিয়ে হয়েছে আমার পাড়ায়, আমি সবাইকে বলে রেখেছি কোনো সন্ধান টন্ধান থাকলে, তিনিই বলল, মানে নিভা বৌদি।

বিজন বলল, আমার খরিদ্দার তো ঠিক হয়ে গেছে।

মানে রাজেশ ত্রিপাঠী তো?

চেনেন?

হ্যাঁ চিনি, অতীনদারে নিয়ে যেদিন বাড়ি দেখতে এসেছিলাম, সেদিন ও লোকটাও এসেছিল, ওরে গৌড়াদা ঢুকতে দেয়নি।

বাড়ি তো গৌড়েশ্বরের নয়, আমার।

সে তো বটে সার, কিন্তু ত্রিপাঠী যা দেবে এ তার চেয়ে বেশি দেবে, সবটা ক্যাশেও পেতে পারেন, হাফ ক্যাশ হাফ চেকেও পেতে পারেন।

আমি তো কথা দিয়ে দিয়েছি।

অ্যাডভান্স করেছে?

মাথা নাড়ল বিজন, তখন গগন বলল, আমি কাল এসে অ্যাডভান্স করে যাব, অতীনদারে নিয়ে আসব।

আগে বিক্রি করব কিনা ভাবি, ওঁর সব খোঁজ নিই।

তার মানে?

বাহ্, কার কাছে বাড়ি বিক্রি করব তা জানব না!

তা জেনে আপনার কী হবে, টাকা নেবেন সই দেবেন, এই তো।

বিজন বলল, না, আমি অনেক কষ্ট করে বাড়িটা করেছি, খোঁজ নেব না কার হাতে দিচ্ছি।

মিউনিসিপ্যালিটির লাইটম্যান গগন মণ্ডল বলল, কিন্তু সার খোঁজটা কী

নেবেন, টাকা দিতে পারবে কি না বুঝতেই তো পারবেন।

না, টাকাই কি সব, দেখব না স্বভাব চরিত্র কেমন, কী পেশা, টাকাটা আসছে কোথা থেকে, বংশ পরিচয় কী?

গগন ঘাবড়ে গেল বিজনের কথা শুনে, জিজ্ঞেস করল, এসব খোঁজ দিতে হবে?

আমিই নেব, নাম-ঠিকানা দিয়ে যান।

আঁজ্ঞে সার, এটা কি বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে?

তার চেয়ে কম কী, বাড়িটায় কে থাকবে জানব না?

যদি খারাপ লোক হয়?

বিজন মাথা নাড়ে, দেব না।

কোনো লোক যদি মদ খায়, মানে খারাপ গুণ সব থাকে?

দেব না।

এরকম ভাবে বাড়ি বেচা হয়! আমি তো কম কেনাবেচা করিনি এ পর্যন্ত।
বিজন বলল, বাড়ির নাম ধূলিহর, আমার পূর্বপুরুষের গ্রাম।

কোথায় ছিল?

সাতক্ষীরা শুনে গগন বলল, আমার মাসির বাড়ি আশাশুনি, ওই ধুরোলের কাছে, পিসি থাকত বুধাহাটা, তার ছেলে থাকে এখনো।

রয়েছে?

হ্যাঁ ব্যবসাপাতি সব আছে, পিসির দুই মেয়েরও ধারে-কাছে বিয়ে হয়েছে।

যান না?

নাহ্! কিন্তু আপনি তো থাকতে পারতেন ওপারে।

তাহলে কী হতো?

কী আবার হতো ধুরোলে থাকতেন, এত ঘটা করে এপারে ওই নামে একটা বাড়ি করতে হত না।

আচমকা পাখি উঠে এল, বলল, চা দেব বাবা?

দে।

পাখি বলল, আচ্ছা কোনো সন্ধেয় যদি আপনি বনগাঁ টাউনে না পৌঁছতে পারেন?

তা হবে না, পৌঁছতেই হবে।

ধরুন অসুখ হলো।

সে আলাদা কথা, কিন্তু আমাকে আলো জ্বালাতেই হবে।

বিজন বুঝল পাখি এই গগনের কথায় আনন্দ পেয়েছে। বিজন নিজেও তো পেয়েছে। সকালটা সুন্দর শুরু হয়ে গেল। এক একদিন এমন হয়, [illegible]

সন্তোষ চক্রবর্তী এল, সেদিনের সঙ্গে আজকের কত তফাত। আকাশ ঝলমল করছে আলোয়। বিজন বলল, আগে চা নিয়ে আয়!

আনছি বাবা, কিন্তু এই কাকু তো ঠিক বলছেন।

বলছি! গগন মণ্ডল যেন ধড়ে প্রাণ পায়, দ্যাখো তো খুকি, বাবারে বোঝাও দেখিঁ, বেচাকেনায় এত খোঁজ কেন?

পাখি বলল, বসুন, আমি আপনার পক্ষে।

পাখি চলে যেতে গগন বলল, শুনলেন সার।

বিজন বলল, শুনলাম কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অনড়।

এ খোঁজ তো আপনি নিতে পারেন না।

পারি, আমার বাড়িতে যে সে লোক ঢোকাব কেন?

বাড়ি তো আপনার আর থাকবে না।

বিজন বলল, মনে মনে তো থাকবে।

তখন চেয়ারে নড়ে চড়ে বসার অবস্থাটা আরো পোক্ত করে নিল গগন মণ্ডল, বলল, আপনি ধুরোল থেকে এলেন কেন?

মা বাবা ঠাকুর্দারা এসেছিল।

ফিরে যান।

ফিরে তো যাওয়া যাবে না।

তাহলে এদেশ নিয়ে থাকুন সার, এদেশটা কি খারাপ?

কে বলেছে খারাপ?

তা হলে এত কান্নাকাটি করেন কেন ওদেশের জন্য?

বিজন বলল, আপনার বাড়ি কি বনগাঁতেই?

না জাস্ট ওপারে, গৎখালিতে ছিল, বর্ডার থেকে চার কিলোমিটার।

গৎখালি মনে সেই ভূতের দেশ!

হি হি করে হাসে গগন, বলল, গৎখালি নে এ গল্প শুনেছি আমিও, কিন্তু সে গৎখালি অন্য।

এ গৎখালি কেমন?

ভাল সার, আগে তো যশোর জেলার ভিতরে বনগাঁ ছিল, কোন এক সময়ে খুলনার ভিতরে বসিরহাট, এখন এপারে আলাদা হয়ে গেছে সব।

বিজন বলল, গৎখালির জন্য আপনার মন খারাপ হয় না?

হয়ে কী হবে, ওটা তো আমার দেশ নেই আর।

এপারে একটা গৎখালি—?

হি হি করে হাসে গগন, তা কি হয়, যা চলে যায় তা ফিরে আসে?

তখন পাখি ঢুকল দু কাপ চা নিয়ে। সঙ্গে বিস্কুট। ট্রে সেন্টার টেবিলে

নামিয়ে বলল, বাবা তাহলে কী হবে?

কী হবে রে?

তুমি কি ধুরোলে যাবে?

বিজন বলল, যাব তো, ঠিক যাব।

পাখি হি হি করে হাসল, আমরা যাব না, তুমি তোমার 'গেরাম' নিয়ে থেকো।

এবার গগন মণ্ডল যেন শক্তি পেল ভিতরে ভিতরে। জিজ্ঞেস করল, যদি এত ধুরোলের উপর টান, তাহলে আপনার ধূলিহর মানে ধুরোল বিক্রি করে দিচ্ছেন কেন?

বিজন বলল, থাকা যাবে না।

থাকতে পারবেন না যখন করলেন কেন?

আগে বুঝিনি।

তাহলে সার অতীন কুণ্ডুকে দিয়ে দিন, বারো লাখ অবধি দেব।

আগে তার সম্পর্কে সব জানি।

কেন সার, আপনি কি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন?

বিজন বলল, বাড়ি কত কষ্ট করে করতে হয় জানেন, যার তার হাতে তুলে দেব, তার চেয়ে আমার বাড়ি আমারই থাকবে।

তাহলে সার্চ করুন, আমরা তো সার্চ করি দশবছরের সেল, অ্যাকোয়ার হয়েছে কিনা, ভেস্ট হয়েছে কিনা এসব, যে ক্রেতা তার দরকার হয়।

বিজন বলল, উভয় পক্ষকে করতে হয়।

কাগজপত্র দেবেন সার।

গৌড়েশ্বর দেয়নি?

ওঁর কাছে নেই।

তাহলে কী দেখাল, কাগজ দেখায়নি?

নো সার।

বাড়িটার কোনো পরিচয়ই তাহলে পাননি?

নো সার, সার্চ করে দেখি, তবে মনে হয় ঠিকই আছে।

বিজন বলল, না ঠিক নেই।

ঠিক নেই মানে?

ওর টাইটেল মানে মালিকানা নিয়ে গোলমাল আছে।

কী বলছেন সার?

যা বলছি ঠিক বলছি, আপনি ফিরে যান।

কিন্তু! এবার গগন মণ্ডল পাখির দিকে তাকায়, ও খুকি বাবা কী বলছে?

পাখি বলল, আপনি কিনুন না, আপনাকে দেবে বাবা।

কিন্তু গোলমাল বলছেন যে?

পাখি বলল, ও সব ঠিক হয়ে যাবে কাকু, আপনি কিনুন, সন্ধেবেলায় জগৎপুরের রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে দেবেন পর পর।

এই কথা শুনে গগন মণ্ডল হাঁ করে তাকিয়ে থাকল পাখির মুখের দিকে। তারপর দেখল পাখির বাবাকে। দুচোখে কী বিস্ময়! এমন অদ্ভুত কথা আর অদ্ভুত পিতাপুত্রীকে দ্যাখে নি সে কোনোদিন! একটু চুপ করে থেকে বলল, তাহলে যে বনগ্রাম সন্ধেয় অন্ধকার হয়ে থাকবে, কে জ্বালাবে আলো?

খিলখিল করে হেসে উঠল পাখি, বলল, সব বাবা জানে।

হ্যাঁ, উনি জানেন, উনি সেই মুন্না না কে তাকেই দেবেন, লস করে হলেও তাকে, তাই তো সার?

ছয়

গৌড়েশ্বর খবর দিয়েছিল যেতে, বলল, দাদা একবার আসুন, কাগজপত্তর কপি না থাকলে আমি কী করে কথা বলব, খদ্দের ফিরে যাচ্ছে।

বিজন গেল প্রায় দেড়মাসের মাথায়। ভরা বর্ষা। ভেড়ির জল খলখল করছে। জলে মেঘের ঘন ছায়া পড়েছে। বিজন ছাতা মাথায় হাঁটছিল। কিন্তু একটু হাঁটতেই তার বুক ভার হতে আরম্ভ করল। টের পাচ্ছিল কালিদাস আবার পিছু ধরেছে। এমন জলজ আবহাওয়ায় মৃতেরা প্রাণ পায়। কালিদাস সর্বাঙ্গ নিয়ে জেগে উঠেছে বিজনের ভিতর। বিজন দাঁড়ায়। কী করবে সে? দুধকুমার ভগবান কি এমন বর্ষার দিনে বাড়ি আছে? বিজন সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এই অপেক্ষার অর্থ সে যাবে কোথায় তা নিজের কাছ থেকে জেনে নেওয়া। যখন জগৎপুর-ধূলিহর ছেড়েই যাচ্ছে তখন আর কোনো মায়া রাখবে না এখানে। কালো জলে ঢেউ উঠছিল পুবালী বাতাসে। বিজন হাঁটতে আরম্ভ করল। ঘোরের ভিতর হেঁটে যাচ্ছিল সে। কোথায় পৌঁছবে জানে না। কিন্তু একটা কোথাও পৌঁছবেই।

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। কী নিঃঝুম। কোথাও কেউ নেই। বিজনের ভিতরে কালো জল আছড়ে পড়ল যেন। সমুদ্র উত্তাল হলো। সে ডাক দিল, দুধকুমার, ও দুধকুমার।

কোনো সাড়া পেল না। ভিতর থেকে আগল দেওয়া মানে লোক আছে ভিতরে। সে আছে। ভরা বর্ষার দিনে ঘুমিয়ে আছে হয়ত। বিজন আসেনি অনেক দিন। এসেছিল এর ভিতরে একবার, বাড়ি থেকে বাড়ি। বিজন ডাকল, দুধকুমার আছ নাকি?

সাড়া নেই। বিজন ভাবল বারান্দায় উঠে দরজায় টোকা দেয়। বারান্দায় উঠতে যাবে তখন যেন সাড়া পায়। দরজা খুলছে। খুলল দরজা। এলোমেলো প্রায় চাঁদনি দাঁড়িয়ে আছে দরজার মুখে। বুকের কাছে আঁচল ফেলা কিন্তু গায়ে কোনো ব্লাউজ নেই। মুখখানি ড্যাম ড্যাম করছে। ঘুমিয়ে ছিল নাকি?

বিজন কোনো রকমে জিজ্ঞেস করল, ঘুমোচ্ছিলে?

মাথা নাড়ল দুধকুমারের বউ, বলল, কী মনে করে ঠিক দুকুর বেলা? কার খোঁজে?

দুধকুমার নেই?

না নেই, থাকপে না তো জানা কথা।

ভগবান?

কেউ নেই তো জেনে এয়েচ আপনি?

চাঁদনি! বিজন চাপা গলায় ডাক দিল।

চাঁদনি বলল, বাড়ি তো রাখছ না?

রাখতে পারছিনে।

আমার ভয়ে দাদাবাবু?

না তা কেন, তুমি আছ কেমন?

ভাল আছি, বাড়িই যদি না থাকে তো এলে কেন?

বিজন ঢোক গিলল, দেখছিল দুধকুমারের বউ-এর দুচোখ যেন আগুনের গোলা হয়ে গেছে। উত্তেজনায় থরথর করছে। বলছে, কতবার বললাম আমারে রাখনি করে রাখো দাদাবাবু, ওখেনে রাখো, তুমি বিচেই দিবা।

আমি তো আর আসব না সপরিবারে।

তা জেনেই তো বলেছিলাম, অতটা নিলে আমার, তোমার মনে কোনো দয়া মায়া নেই, ভালবাসাও নেই।

না তা নয়, আমি যে পারব না।

তুমি এইটে বলতে এলে?

বিজন বলল, তোমাকে বলতে এলাম চাঁদনি।

কী বলবা, সব লুটেপুটে খেয়ে বলবা চলে যাচ্ছি।

বিজন চুপ করে আছে। চাঁদনি দরজা থেকে নড়ছে না। বিজন একটু সময় বাদে বলল, বলে গেলাম, যাই।

দাঁড়াও। গর্জে উঠল চাঁদনি।

বিজন দাঁড়াল। তার ভয় করছিল। এ কী করল সে? কেন এল? চাঁদনি ডাক দিল, ভিতরে আসবা নাকি?

মাথা নাড়ে বিজন, না থাক।

থাকবে কেন, মেয়েমানুষ খুব শস্তা তো, এস।

বিজন বলল, যাই।

যাবা কেন এস, তুমি বাড়ি বিচছ, দালালি করছে আমার মর্কটটা, সে আমারে ছোঁয় না কোনোদিন, বাড়ি বিচার কথা কি আমি জানতাম না?

বিজন ভাবল যায়। ঘুরেই দৌড়য় মাঠ বেয়ে। একেবারে বারোকপাটের খালের দিকে। কিন্তু পা দুটো যে ভার হয়ে আছে। নড়তে পারে না। চাঁদনি ডাকল আবার, এস।

না চাঁদনি, আমি যদি নাই থাকি, যাই?

এস, যে জন্য এয়েছ জানি, সাধ মিটিয়ে দেব এস।

বিজন পিছতে থাকে। বুঝতে পারে নাগিনী ফণা তুলছে। ফুঁসছে। ফুঁসতে ফুঁসতে বুকের আঁচল নামিয়ে দিল অনেকটা। দরজা থেকে পিছিয়ে গেল, ডাকল, এস, এর জন্য এয়েচ তো দাদাবাবু।

বিজন মাথা নামিয়ে থাকে। হিসহিস করে ওঠে দুধকুমারের বউ, বলে, এস না সব খুলে দিব, এস, তুমি তো লুটেরা, জমির কাগজ দুধকুমার কেড়ে নিইছে, ও জানল কী করে, তুমি বলেছ?

না, না, আমি বলব কেন?

যা, যা, চলে যা, এদিক পানে আর যদি দেখি।

কী বলছ তুমি!

যা বলছি ঠিক, ফের যদি ও মুখ দেখি আমি লোক ডাকব, লোক যদি ডাকি, বলি তুমি আমার কাপড় খুলে দিইছো জোর করে, বাড়ি তুমার থাকবে না তুমি থাকবা?

বিজনের মুখ কালো। বিজনের মাথায় ভারী হাতুড়ির ঘা পড়ছিল যেন। চাঁদনি গায়ে কাপড় তুলে বেরিয়ে এসেছে, চাপা গলায় বলছে, লোকের তো খুব লোভ ই দ্যাহখানির উপর, যেন খুবলে খায়, গিলে খায়, লোকে যদি শোনে তুমি পেয়েছ, ছাড়বে? ও বাড়ি দখল করে ভেঙেচুরে শেষ করি দিবে, যা যা ভাগ শুয়ারের বাচ্চা এখেন থেকে, মেয়েমানুষ দেখলি জিভে জল আসে তোর, কেনে বউমাগি দেয় না?

বিজন মাথা নামিয়ে, প্রায় থেঁতলানো মাথা নিয়ে মরণাপন্ন সরীসৃপের মতো পিছিয়ে যেতে থাকে। মানুষ আশাহত হয়ে এতখানি হিংস্র হয়ে উঠতে পারে যে সে বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না শৌখীন শহুরে রুচিমান মানুষ বিজন বসুর। প্রত্যাখানের ভাষাও যে এতখানি রূঢ় হতে পারে তাও জানত না সে। ঘুরে তাকাতে ইচ্ছে করছিল। এতখানি অপমানের পর ও মনে হচ্ছিল সে যদি চলে যায়, এই চলে যাওয়া চিরকালের মতো হয়ে যাবে। সে কি একটু

দাঁড়াবে? উত্তেজনা কমলে কি তাকে পুরনো কণ্ঠস্বর নিয়ে ডাক দেবে দুধকুমারের বউ। বৃষ্টি জোরে নামল। বিজন ছাতার ভিতরে থেকেও ভিজে যাচ্ছিল। মেঘে ঘোর হয়ে এসেছিল সব দিক। আকাশ থেকে মেঘের কালো ছায়া নেমে এসে ছেয়ে ফেলছিল জগৎপুর। বিজন হাঁটতে আরম্ভ করল।

ভিজতে ভিজতে সে পৌঁছল যখন বাড়িতে গৌড়েশ্বর ঘুমিয়েছিল। তাকে ডাকতে হল। সে সশব্যস্ত হয়ে পড়ল বিজনকে দেখে, সারা-সরস্বতীকে ডাকল, চা করে আন, পাঁপর ভাজ, দ্যাখ দাদার কী অবস্থা, লুঙ্গি দেব?

মাথা নাড়ে বিজন, বলল, বর্ষাকালে তো ভিজতে হবেই।

দাঁড়াতে পারতেন, জোর বৃষ্টিতো নেমেছে অনেক সময়।

বিজন কিছু বলল না। তার মন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। বিরক্ত লাগছিল। মনে হলো সে আবার ফিরল কেন বাড়িতে? ফিরে গেলেই পারত। এখন যদি আহত বাঘিনী গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানে চলে আসে? তার খুব সাধ ছিল এই বাড়িতে বাস করবে বিজনের আশ্রিতা হয়ে। তার স্বামী আর ভগবানের যে মত ছিল না তাতে তাও সত্য নয়। সব ঠিক ছিল, কিন্তু হঠাৎ যে বিজন অন্য পথে হাঁটবে তা ধারণাও ছিল না মেয়েমানুষটির। মেয়েমানুষ হয়ে সে এইটিই জানত তার শরীরে বিজনকে বাঁধবে। বেঁধেও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। বিজনের ভয় করছিল। দুধকুমার আর ভগবান বোঝে লাভ! এখন যদি কেনাবেচার দালালিটা করতে পারে, তাতেই তারা খুশি। চাঁদনি পারেনি আটকাতে, নিশ্চয়ই তা চাঁদনির দোষ। চাঁদনিকে কম সুযোগ তো তারা দেয়নি।

মন খারাপ নাকি? জিজ্ঞেস করল সারা।

না, এত বৃষ্টি নামল!

বৃষ্টিকালে বৃষ্টি নামবে না! বলে হাসল সারা, বলল, থাকতেই পারতে এখেনে কাকা, থাকলে ভাল হত।

গৌড়েশ্বর তখন ঘরে ছিল না। সারা বসেছিল মেঝেতে উবু হয়ে, বলল, তুমি থাকলে এরা এটটু সমঝে চলত।

কাকে সমঝে চলত?

সব বিষয়ে, এরা তো ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

বিজন বলল, শুধু শুধু বাড়িটা পড়ে থাকবে।

সব হারামি সব হারামি! হিস হিস করে ওঠে সারা, হারামিরা সব দিকে আছে, বিক্কিরি করছ ভাল করছ, এ বাড়িতে এরপর নষ্টামি হতো শুধু।

বিজন বলল, তুমি যাও।

কেন কাকাবাবু, তুমিও তো নষ্ট হচ্ছিলে, আমি কি জানি নে, ভাল হয়েছে তবু ফিরতে পারলে, তোমার লেখাপড়া আছে তাই।

বিজন চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুনছিল দুধকুমারের বউটা কত খারাপ। বারো ভাতারি বলে সারা গায়ের ঝাল ঝাড়ল। বলছিল, এখেনের সব খারাপ, পুরুষমানুষগুলো তো মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া কিছু বোঝে না, এখেনের বাতাসই খারাপ।

বিজন বলল, এভাবে শ্বশুরবাড়ির নিন্দে করে কেউ?

করে আঙ্কেল, আপনি নিজে বোঝেননি?

কী বুঝব?

আমি কী করে বলি?

বিজন বলল, যা শুনেছ তা মিথ্যে।

মিথ্যে হলি ভাল আঙ্কেল, আমি তুমাকে কত রেসপেক্ট করি, তুমি জগৎপুরের বাতাসে নষ্ট হয়ো না, আর মিথ্যে যে না তা আমি জানি।

বিজন বলল, থাক এসব, আমি আর ক'দিন, বাড়ি তো থাকবে না।

কারে বেচতিছ, মুন্নারে তো?

বিজন বলল, ও এখেনে এসে যদি খারাপ হয়ে যায়?

ভাল লোক আসার দরকার এখেনে, না হলি এ জায়গার পাপ যাবে না।

তোমার শ্বশুর গেল কোথায়?

সারা বলল, ও বাড়ি গে ঘুম দেচ্ছে হয়ত।

আমাকে বসিয়ে রেখে ঘুম!

ও জানে আপনি ওর কছে এয়েচেন, খুব শায়েনসা লোক আমার শউর, খুব বুদ্ধি ওর, শুধু লোকের ক্ষতি করার ভাবনা মাথায়।

সারার সঙ্গে কথা বলে বিজন ভারমুক্ত হচ্ছিল। এ মেয়ে ভুল করে এখেনে গৌড়েশ্বর মণ্ডলের পুত্রবধূ হয়ে গেছে। সে বলল, যাও, শ্বশুরকে ডাক।

আমি কেন ডাকব, না এলি ঝেড়ে দেবেন।

বিজন বলল, তাহলে আমি ঘরে তালা দিয়ে চলে যাই।

বাড়ি বেচো, তুমার বাড়ি ও নিয়ে নেবে।

বিজন বলল, তুমি তো ঘর শত্রু বিভীষণ!

হ্যাঁ তাই, আমার মরদ অন্য মেয়েছেলে নিয়ে থাকবে, আমি ঘরে বসে ওর বাচ্চা পয়দা করে যাব, সারা সে মেয়েমানুষ না।

কী করবে?

কী করি দেখ, করব একটা কিছু, অত সহজে হবে না।

বিজন জিজ্ঞেস করছে, শ্বশুর-শাশুড়ি কী বলছে?

কী বলবে, শাউড়ি জানে এটা হয়, তার মরদও করেছে এটা এক সময়।

জানা কথা বিজনের, আবার শুনছে। সারা উঠে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে

দাঁড়ায়, বলে, কিন্তু আমি ওদের চোখে সর্ষে ফুল দেখাব।

মাথা ঠাণ্ডা করো?

দ্যাখো আঙ্কেল, আমার মরদ অন্য মেয়েছেলে নিয়ে থাকে, যেদিন ফেরে, রাতি ঘুমের ঘোরেও অন্য মেয়েলোকের কথা বলে, আমি শউর শাউড়িরে বলতে তারা বলল, পুরুষমানষের এসব থাকে, না থাকলে সে কীসের পুরুষ।

বিজন বলল, আমি এসব শুনেছি সারা।

বলা দরকার আবার, তোমরা পুরুষমানুষ, তোমরা শুধু মেয়েমানুষ ঠকাতিই আছ, রাগ করো না আঙ্কেল, তুমি লেখাপড়া জানা লোক, তুমার বংশ ভাল তাই সরে আসতি পারলে, ঘরেও চরিত্ত ঠিক থাকল, আমার মরদ পারবে না তা।

থাক, এসব আমার ভাল লাগছে না।

কী করব বলো আঙ্কেল, কারে বলব এসব কথা, আশুথ গাছেরে না মাঠেরে?

বিজন স্তব্ধ হলো। সারা-সরস্বতীর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বলছে, তুমি বাড়ি বিচে দিবা আঙ্কেল, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে দুঃখ হচ্ছে, বাড়িটা ছেল, তুমি আসতে, তুমারে দুটো কথা বলতাম, এবারে আমি বোবা হয়ে থাকব।

বিজন বলল, আমি গৌড়াবাবুকে বলব।

কী বলবা, ও কি জানে না, বলেছে ছেলে যা করেছে করতি দিতি, মরদের ব্যাপারে অত মাথা গলাতি নেই।

বিজন চুপ করে থাকল। কী বলবে সে? নিজেও তো সরস্বতীর স্বামীর চেয়ে আলাদা কিছু না। সরস্বতী বলছে, তবে আমি ছাড়ব না।

কী করবে?

যখন করব, দেখতি পাবা আঙ্কেল।

রাগের মাথায় নিজের ক্ষতি কোরো না।

এসবে মেয়েমানুষ গলায় দড়ি দেয়, বিষ খায়, কিন্তু আমি তা করব না।

বিজন বলল, তুমি এবার যাও।

কেন যাব, শুনতি ভয় করছে!

ভয় করবে কেন?

তাহলি শুনছ না কেন, শুনা দরকার তুমার, মেয়েমানুষের কথা তো শুনতি হয় না কোনোদিন।

বিজন বলল, আমার ভাল লাগছে না।

ভাল লাগবে কেন, দ্যাখো আঙ্কেল আমি মেরে মরব।

বিজনের গা কেঁপে উঠল। এতক্ষণে সে সত্যিই ভয় পেল, কোনোরকমে বলল, মারবে কেন, না পারলে বাপের বাড়ি যাও।

তাতে নষ্টমির আরো সুবিধে হয়, তাই না! এমন ভাবে শোধ নেব, ওরা তা ভাবতিও পারবে না।

বিজন উঠে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, সদর দরজায় এসে বারো ফুট রাস্তার ওপারের দাঁড়ান গৌড়েশ্বর মণ্ডলকে হাঁক দিল, ও গৌড়াবাবু, আমি চলে যাব।

গৌড়েশ্বর সাড়া দিল না। তার বউও না। শুধু বেরিয়ে এল গৌড়েশ্বরের ছোট ছেলে, সারার স্বামী। রোগা তালঢ্যাঙা কৃষ্ণবর্ণের যুবকটি বলল, ঘুমাচ্ছে, আমার বউ গেছে না, সারা, ওরে ডেকে দিন তো, বলুন আমি এবার বেরোব।

বিজন জিজ্ঞেস করল, কোথায় বেরোবে?

জোতভীম যাব, সারা জানে, ওরে ডেকে দিন, কী করচে এতক্ষণ ওখেনে, চা দে তো চলে আসবে।

সাত

গৌড়েশ্বর আশাহত হলো : কাগজ আনেননি! তাহলে কী দেখাব আমি?

খদ্দেরকে নিয়ে যাবেন, তাকে দেখব তো আমি।

দেখে কী করবেন, যেদিন ডাকব এ বাড়িতেই আসবেন, এখেনে হাকিম আসবে, এখেনে রেজিস্ট্রি হবে, এখেনেই টাকা পাবেন।

বিজন বলল, অজ্ঞাতকুলশীলের কাছে দিয়ে দেব বাড়ি?

কার কাছে দেন তাতে আপনার দরকার কী?

বিজন এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না। গৌড়েশ্বর বলল, খদ্দের নিয়ে আপনার বাড়ি যাব, কাগজ পত্তর জেরক্স করে রাখবেন, আমার কাছে কাগজ নেই অথচ মুন্না কাগজ নিয়ে প্ল্যান নিয়ে ঘুরছে।

আমি জানি না তো। বিজন মিথ্যে বলল।

জানেন না তো কে দিল, দুধকুমারের বউ?

বিজন বলল, আমি যাই।

কাগজ লাগবে দাদা, কাগজ ছাড়া কিছু হবে না।

বিজন কথা বলল না। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেক সময়। জগৎপুরে অকাল সন্ধ্যা নামছে। সে বেরিয়ে পড়তে গৌড়েশ্বর তাকে অনুসরণ করল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, এই যে আপনি বেচে দিচ্ছেন, ভাল সিদ্ধান্ত দাদা, এখেনে বাড়ি রাখলে আপনার ভাল হত না, সহ্য করতে পারতেন না।

বিজন বলল, তাই মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ দাদা, আগে আমি সায় দিইনি, পরে দিলাম, তার কারণ ওইটা,আপনি কুহকিনী ডাকিনীর পাল্লায় পড়েছিলেন।

বিজন চমকে উঠল, 'কুহকিনী ডাকিনী'—এই শব্দ জগৎপুরে ছাড়া কোথায় পাওয়া যাবে? গৌড়েশ্বর নির্বিকার ভাবে বলছিল, আমি কেন, অনেকেই জানে দাদা, আপনার ইমেজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

বিজন বুঝল সরাসরি যাওয়াই ভাল, সে বলল, ইমেজে কী হবে?

কী হবে মানে, ইমেজই হলো সব, আপনি যা করবেন গোপনে করবেন, লোকে যেন না জানে, কিন্তু আপনারটা জেনে গেছে অনেকে।

তাতে আমার কী?

না আপনার কিছু না, কিন্তু মেয়েমানুষটা আপনাকে পাকে পাকে জড়িয়ে নিচ্ছিল, এরপর দম আটকে হাঁসফাঁস করতেন, আপনার সব যেত।

বিজন বলল, থাক, যা হয়নি তা বলে কী হবে?

হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আপনি বেরিয়ে এলেন, এখেনে থাকলে ওই মেয়েমানুষ আপনাকে গ্রাস করত দাদা।

বিজন বলল, হয়েছে, আপনি এবার যান।

যাচ্ছি, আমি খদ্দের নিয়ে যাচ্ছি, আসামের সেই লোক, আগে বলেছিলাম, অত ব্লাস্টিং হচ্ছে, লোক মরছে, তারপর অন্য ঝামেলা আছে, বছরে এক দেড় লাখ দিতে হয় জঙ্গিদের চাঁদা. ব্যবসা শিফট করবে এদিকে।

লোক কেমন?

টাকা আছে আপনাকে দশ দেব, আমি তিন রাখব, তেরো বলবেন দাম।

বনগাঁর লোকটা আর যোগাযোগ করেনি?

আপনি তো বলেছেন ওকে বেচবেন না।

বিজন বলল, এই আসামের লোককেও আমি বেচব না।

কেন, বেচতিই হবে।

না গৌড়েশ্বরবাবু, ওকে দেওয়া যাবে না।

এত দাম কেউ দেবে?

না দিক, ভাল খদ্দের দেখুন।

মুন্নার মতো? বলে তির্যক হাসিতে বিদ্ধ করল বিজনকে।

বিজন বলল, হতে পারে।

তাহলে সাত না ছ'লাখে মুন্নাকে দিন।

ও তো আর আসছে না। বিজন বলল।

আপনার কাছে যাচ্ছে না কিন্তু বাড়ির কাছে আসছে।

আসছে, কবে এল?

আরে দাদা, এবার ওর নানাকে নিয়ে এসেছিল, সে বুড়ো চোখে দ্যাখে না, কানে শোনে না, সে ঘুরতে লাগল বাড়ির চারপাশে মুন্নাকে নিয়ে।

বিজন অবাক হয়ে গেল, জিজ্ঞেস করে, কবে হলো?

এই তো গেল পরশু, আমি ঢুকতে দিইনি।

কেন দিলেন না?

দেব না, আমি বেচছি আপনার হয়ে, আমি যাকে ইচ্ছে দেখাব, যাকে ইচ্ছে দেখাব না।

দেখানোর জন্য টাকা নিচ্ছেন?

ও আপনাকে ভাবতে হবে না, বাড়িটা কি ফালতু, আকাশ থেকে পড়েছে? চাইলেই দরজা খুলে দেব দেখার জন্য।

বিজন হাঁটছিল। বেলা ফুরিয়ে যাওয়ার মতো প্রকৃতির আলোও নিঃশেষ হলো প্রায়। জলের মতো অন্ধকার আবৃত করছে জগৎপুরের চরাচর। গৌড়েশ্বর বলছিল, বুড়োটাকে নিয়ে বাড়ির চারপাশে পাক দিল মুন্না।

ইস! বাড়িটা ওর খুব পছন্দ হয়েছে।

পছন্দ হতেই পারে, তাই বলে পেতে হবে।

বিজন বলল, কিনবে তো।

কতদিন ধরে কিনবে মশায় তিন মাস হয়ে গেল।

সার্চ করছে।

সার্চিং-এ এত সময় লাগে! টাকা দিন, কত সার্চিং এনে দেব তার ঠিক নেই, দেখুন দাদা ওর কোমরে জোর নেই।

তাতে আমার কী?

বাহ্! খদ্দের শাঁসাল কি না দেখতে হবে না।

খদ্দের কেমন লোক, তাও।

আমি বুঝতে পারি না দাদা, আপনি কি বেচবেন না বেচবেন না, ফালতু আমাকে বে-ইজ্জৎ করে লাভ কী?

না বেচলে আমি বলছি কেন?

না না আপনার ভাবভঙ্গি আমার ভাল লাগছে না, মেয়েমানুষটা এখনো যোগাযোগ রেখেছে, নাকি আপনার লোভ এখনো যায়নি।

বিজন বলল, আপনি যান, আর কথা বলবেন না।

তখন গৌড়েশ্বর বলল, রাগ করে তো লাভ নেই, রফায় আসুন মশায়, দুধকুমারের বউরে নিয়ে আপনি শুয়েছেন তা কি আমি জানি নে।

গৌড়াবাবু! বিজন চোখ গরম করতে চায়, পারে না। গলার স্বর মিয়োন

মুড়ির মতো হয়ে যায়।

গৌড়েশ্বর বলল, আমার উপর রাগ করে লাভ নেই, যা সত্যি তা বলছি, ও মেয়েছেলেও খেপে রয়েছে, বাড়ির উপর ওর লোভ ছিল।

বিজন বলল, থাক।

থাকছে, কিন্তু আমার কথা শুনতে হবে, নাহলে কথা সব কলকাতায় চলে যাবে।

ভয় দেখাচ্ছ তুমি?

গৌড়েশ্বর বলল, ভয় দেখাব কেন, কিন্তু আমার কথায় চলতে হবে আপনাকে, তাতে আপনার লাভ ছাড়া লোকসান হবে না।

বিজন চুপ করে থাকল। সে একটু আতঙ্কিতও হচ্ছিল। যদি বাড়িতে গিয়ে এই লোকটা সাতকাহন করে বলে, তার ফলাফল কী হতে পারে? সবাই চুপ করে যাবে। কেউ কোনো কথা বলবে না অভিমানে। তাদের প্রিয় লোকটি তাদের অজ্ঞাতে এই সব করেছে! ধূলিহর-টর মিথ্যে। ওসব ছল। আসল প্রেমটি এই জায়গায়। তার স্বামী তাদের বাবা আসলে চরিত্রহীন, লম্পট একটি লোক। ধস নেমে যাবে পরিবারে। তবু আক্রমণে গেল বিজন বলল, তাই হোক, বাড়িতে গিয়ে তুমি বলতে পার।

গৌড়েশ্বর পিছিয়ে গেল, ভয় পাচ্ছেন না?

না, কেউ বিশ্বাস করবে না।

সত্যি বিশ্বাস করবে না?

এস না তুমি কাল সকালেই, আমার সামনেই বলো।

গৌড়েশ্বরের দু'চোখ স্ফীত হয়ে ওঠে, বলব আপনার সামনে?

হ্যাঁ বলো না। বিজন সাহসী হয়ে ওঠে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বাঘের মতো থাবা তুলে ধরে, এখনই বলো, মোবাইল থেকে বলো।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ বলছি, তুমি খুব চালাক, কালই ঘাড় ধরে ঘর থেকে তোমাকে বের করে দেব, দেখি তুমি কী করো।

পারবেন?

পারব থানা থেকে পুলিশ গিয়ে তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।

থানা জানা আছে?

আছে কি না আছে সে তো তোমায় জানতে হবে না।

গৌড়েশ্বর দাঁড়িয়ে পড়েছে। দুচোখে অবিশ্বাস আর ভয়ের ছায়া পড়ে গেছে যে তা বিজন অন্ধকারেই বুঝতে পারছে। বলছে, তা হলে আমি জানাব না।

জানাও না, মিথ্যে বলে লাভ হবে না।

মিথ্যে?

হ্যাঁ মিথ্যে ছাড়া সত্যি কোথায়?

মানে আপনি দুধকুমারের বউ-এর সঙ্গে শোননি?

না, মিথ্যে কথা বললে ঘাড়টি ধরে ঘরের বাইরে করে দেব।

মানে ওই বউটার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক ছিল না?

কেন থাকবে?

পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষ—এই হিসেবে।

তাহলে তো তোর সঙ্গেও থাকবে। বিজন এবার তুই তোকারিতে নেমে আক্রমণের ধার বাড়ায়। হকচকিয়ে গেছে লোকটা। বাড়ি দেখিয়েই কত রোজগার করছে বুড়ো নখদন্তহীন বাঘ। বাড়ি থেকে বের করে দিলে আর পারবে? নুয়ে পড়ছে গৌড়েশ্বর, বলছে, দাদা আপনার কথা কি সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

কিন্তু আমার বউমাও যে দেখেছে ও ঘরে ঢুকছেন।

লোকের ঘরে লোকে ঢোকে না, যদি ঢুকেও থাকি তার মানে কি ওই, তাহলে তোর বাড়িতে যখন ঢুকি আমি কার সঙ্গে শুতে যাই।

দুহাতে কান চাপল গৌড়েশ্বর।

বিজন বুঝতে পারছিল অস্বীকারই শ্রেষ্ঠ পথ। এই পথেই বাঁচতে পারবে, বলল, তোমার বউমা কাকে দেখেছে, আমাকে?

তাইতো।

নাকি তোমার ছেলেকে?

এ কী বলছেন দাদা।

তোমার ছেলের জন্য বউমা গলায় দড়ি দেবে।

গৌড়েশ্বর বলল, আপনি এসব শুনেছেন?

শুনেছি কি না শুনেছি তা বলতে যাব কেন?

তাহলে বলছেন কেন?

বলছি বেশ করছি, এ কথা তো তুমিই আমাকে বলেছ গৌড়া।

আমি কবে বললাম?

বলোনি, তোমার ছেলে একটা রাখনি রেখেছে ভেড়ি এলাকায়, তা বলোনি? বলোনি সেই জন্য তোমার বউমা রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল।

সে তো অনেকদিন আগের কথা।

এখন কি মিটে গেছে সব?

হ্যাঁ মিটে গেছে, ছেলে তো ফিরে এসেছে বউমার কাছে।

ফের মিথ্যে কথা।

এসব কী বলছেন দাদা?

তোমার ছেলে ওই দুধকুমারের ঘরে যায় কিনা তার গ্যারান্টি আছে?

আমি চলে যাচ্ছি।

ঘর সামলাও গৌড়া, বউমার কিছু হয়ে গেলে তোমাকেও হাতে কড়ি পরতে হবে।

গৌড়েশ্বর আর কথা বলছিল না। বিজনও তাই থামল। গৌড়েশ্বর নিঃশব্দে তার সঙ্গে হাঁটছিল। বিজনও। একটু এগিয়ে গৌড়েশ্বর বলল, তাহলে কী করব?

কী করবে মানে?

খদ্দের দেখব না?

দ্যাখো কিন্তু আমিও দেখে নেব।

দাদা তাহলে আমার না দেখাই ভাল, আপনি দেখুন।

বিজন বলল, মুন্না তো আছে।

ও পারবে না।

পারবে না মানে?

ক্যাশ টাকা নেই, ব্যাঙ্ক লোন নেবে।

লোন পেতে সময় লাগে না।

দেখুন কী হয়, আপনি ওর কাছে লাখখানেক অ্যাডভান্স চান দেখি, ওর ফুটো পয়সা নেই, ধার করে বাড়ি কিনবে।

বিজন বলল, ধার করেই তো লোকে কেনে।

যার টাকা থাকে সে ধার করে, ধার করা তারে মানায় দাদা, টাটা বিড়লা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নেয় কোটি কোটি, আমরা পারব?

অল্প টাকা নিতে অসুবিধে কোথায়?

ব্যাঙ্ক কি ভিখিরিকে লোন দেয় দাদা?

কে ভিখিরি?

ওই মুন্না, হাতে এক পয়সাও না নিয়ে বাড়ি কিনতে বেরিয়েছে, দেশে পোস্টকার্ড পাঠাচ্ছে, ফোন করছে বাড়ি কেনার কথা জানিয়ে, তাদের আসতে বলছে কলকাতায় মকান দেখতে, তারাও এসে দেখে যাচ্ছে, কিন্তু কিনছে কই, ক'দিন লাগে কিনতে?

বিজনের মনে হলো কথাটা একেবারে অসত্য নয়। সে পরদিন অফিস থেকে মুন্না—রাজেশ ত্রিপাঠীকে ফোন করল, কী খবর আপনার?

খবর ভাল সার, সার্চে সব ওকে আছে।

এবার তো কিনতে হয়।

হাঁ, লোনের জন্য ব্যাঙ্কে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি, হামার ভকিল বাবুই সব করছে, হয়ে যাবে সার।

আপনি কোথায় থাকেন ত্রিপাঠীজি?

আজ্ঞে বাগবাজার।

কোথায় চাকরি করেন?

গরমেনট অফিসে কম্পিউটার চালাই।

অফিস আপনাকে লোন দেবে না?

রাজেশ ত্রিপাঠীর ফোন কেটে গেল।

আট

শুভব্রত জিজ্ঞেস করল, জগৎপুর কোন পথে যেতে হয়?

বাবার কাছে জিজ্ঞেস করে নেব। পাখি বলল।

আমার সঙ্গে যাবে?

কোথায়?

কেন জগৎপুরে, সাইকেলের পিছনে চেপে।

ইস তা হয় নাকি? পাখি বলল।

শুভব্রত তখন বলল, আমি একদিন একা একা চলে যাই তাহলে?

চিনতে পারবেন?

খুউব পারব।

যদি হারিয়ে যান?

যাব যাব, তোমার সেই দুধকুমার আমাকে কলকাতায় ফেরত দিয়ে যাবে।

পাখির মনে গান এল। পাখি মনে মনে গেয়ে উঠল, মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলিতে....। পাখি গাইল বটে কিন্তু কেউ শুনতে পেল না। এই দুধকুমারকে দিয়ে যাবে জগৎপুরের দুধকুমার। মোটা কালো ছ ফুট উঁচু, হাঁটলে মেদিনী কাঁপে। অমন একটা লোকের নাম যে কী করে দুধকুমার হয়!

পাখি বলল, যান ঘুরে আসুন, আমি একবার গিয়েছিলাম, কী গ্রাম!

গ্রাম কি খারাপ?

খারাপ ছাড়া কী, গ্রাম তো শহর হয়ে যায়।

সে তো হবেই, গ্রাম কি চিরকাল পাড়াগাঁ, মশামাছি ম্যালেরিয়া নিয়ে পড়ে থাকবে?

তবে, গ্রাম কী করে ভাল হয়, গ্রাম থেকেই তো লোক শহরে আসে।

শুভব্রত বলল, সেটাই স্বাভাবিক, আবার শহরের লোক দম ফেলতে যে গ্রামে যায় মানে নেচারের কাছে যায়।

সে তো দু'একদিন, তারপর যে শহর টানে, আমার কলকাতা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না, আবার এ পাড়া ছাড়া কিছু ভাল লাগে না।

শুভব্রত বলল, আমি যখন সাইকেলে চাপি, মনে হয় চালিয়েই যাই, চালিয়েই যাই, আমি একটা বই খুঁজছি, দু চাকায় বিশ্ব, সাইকেলে চেপে পৃথিবী ভ্রমণ, আমি একদিন অমনি বেরিয়ে পড়ব।

কেন নিজের বাড়ি ভাল লাগে না?

খুউব লাগে।

বাড়ি ছেড়ে কেউ যেতে পারে?

তুমি একটা সাইকেল কিনে নিও এইচ এস-এর পরে।

আমি? পাখি অবাক হলো।

হ্যাঁ তুমি।

কী করব সাইকেলে?

কেন প্যাডেল করেই যাবে প্যাডেল করেই যাবে।

তা হয় নাকি, বাবা দেবেই না।

আব্দার করবে, খাবে না, কথা বলবে না।

পাখি বলল, আমি ওসব পারিই না।

আচ্ছা তুমি ভাল রেজাল্ট করলে, বাবা বলল কী চাই, তুমি বললে সাইকেল, হবে না?

হবে কিন্তু আমি সাইকেল চাইবই না।

শুভব্রত বলল, কেন চাইবে না?

সাইকেলে আমার ভয় করে।

ভয়, কিসের ভয়রে পাখি?

পাখি কী বলবে? পাখি মাথা নামাল। বলবে নাকি? সেই যে ই. এম. বাইপাস, ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটছে, পাশ দিয়ে চলেছে সাইকেল! রাজপুত্তুর দুধকুমার ঘাড় নামিয়ে নিচু হয়ে চালিয়েই যাচ্ছে সাইকেল। সাইকেল চলছে, চলছেই। সাইকেলের গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ছুটে যাচ্ছে বিদেশি গাড়ি, তার কতরকম রং। একটা গাড়ির — হলুদ গাড়ি, নীল গাড়ি, লাল গাড়ি, যে কোনো গাড়ি—হাওয়া লেগে গেল সাইকেলে। সাইকেল ছিটকে পড়ল কোথায়! উফ্! পাখি আর ভাবতেই পারে না। কলকাতার রাস্তাতেই বা কত গাড়ি, গাড়ির পর গাড়ি, একটা বাস আর একটা বাসকে টপকে যেতে চাইছে। বাসের

ভিতরের যাত্রীরা সব হইহই করছে, এই আস্তে চালাও, আস্তে আস্তে। সেই চলন্ত বাসের সামনে সাইকেল। পাখি ভাবতেই পারে না। সাইকেল সেই জগৎপুরে ভাল। ধুধু রাস্তা। গাড়ি নেই, শব্দ নেই, ভয় নেই।

পাখি সেই কথাটাই বলল। মানে শেষের কথাটা। শুনে শুভব্রত হাহা করে হাসল, তার মানে তুমি জগৎপুরে গিয়ে সাইকেল চালাবে?

জগৎপুরে তো যাবই না।

ঠিক হয়ে গেছে সব?

বোধহয়।

শুভব্রত বলল, বাবাকে বলেছিলাম ওই বাড়িটার কথা।

কেন?

এমনি, আমাদের তো বাড়ি নেই।

বাড়ি তো আমাদেরও নেই।

বাড়ি না থাকলে কেউ বাড়ি বিক্রি করে?

সে তো ওখানে থাকা যাবে না তাই।

শুভব্রত বলল, তাই কি হয় পাখি, উত্তর মেরুর বরফেও মানুষ থাকে, এস্কিমোরা থাকে না, অরণ্যের ভিতরেও মানুষ থাকে।

সবাই কি পারে থাকতে, আমরা কি এস্কিমোদের মতো বরফের ভিতর ইগলু বানিয়ে থাকতে পারব?

মানুষ সবই পারে পাখি।

আপনি কী বলতে চান স্যার? পাখির মনের অসন্তোষ আর চাপা থাকল না। কেউ কি কলকাতা শহর ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর গিয়ে বাস করতে পারে?

শুভব্রত বলল, বলছি, তোমরা এইরকম, তোমাদের কত বাড়ি, আমতলির বাড়িটাও তো ছেড়ে দিলে।

পাখি বলল, দিইনি তো।

ও তো দেওয়াই, আর কি ওখানে যেতে পারবে?

পাখি বলল, জানি না যান, ওসব বাবা জানে।

শুভব্রত চুপ করে থাকল। তার বাবা বলেছিল সেই অল্প বয়সে কোন গহীন অরণ্য ঘেরা গ্রামে আদিবাসীদের ভিতর চলে গিয়েছিল। কোনো অসুবিধে তো হয়নি কলকাতা থেকে ওখানে গিয়ে। প্রথম প্রথম অসুবিধে যে হত না তা নয়। খুবই হতো। কিন্তু আস্তে আস্তে সব সয়ে গেল। মনে হতে লাগল ওই গ্রাম মৌভাণ্ডারের মানুষই তিনি। বাবা কী সুন্দর গল্প করেন র‍্যাংটা মুর্মু, সাহেব মাণ্ডিদের। এক বুড়ো সাঁওতাল সাহেবমারি বাস্কে বাবাকে কী ভাল না বাসত। সাঁওতালি উপকথা শোনাত। কী ভাবে সাঁওতাল জাতির জন্ম হলো

সেই কথা বলত। এসব কি পাখি জানে? জগৎপুরে থাকলে ওরা জগৎপুরকে আলো দিতে পারত না কি?

কী দিতাম? পাখি সচকিত হয়ে উঠল।

আলো, মানে নগরের আলো।

সে তো বনগাঁয় থাকে।

কে বনগাঁয় থাকে?

পাখির মুখে বনগ্রামের গগন মণ্ডলের কথা শুনে শুভব্রত আর হেসে বাঁচে না। বলল, এক্সেলেন্ট, এমনি লোক জমি কেনাবেচা করে?

করে, করলে কী আছে?

না, কিছুই নেই, আচ্ছা পাখি তোমার বাবাকে বলো না বাড়িটা না বিক্রি করতে।

তাহলে আমতলির বাড়ির মতো হয়ে যাবে।

শুভব্রত বলল, অদ্ভুত! তাহলে বাড়িটা করতে গেলে কেন?

আমি কি করেছি, সাত বছর আগে আমি ক্লাস ফাইভ।

শুভব্রত বলল, আমি তোমার বাবাকে বলব রেখে দিতে।

না, একদম না।

একদম না কেন?

বাবাকে তাহলে শুধু ছুটতে হবে জগৎপুর।

ছুটলে কী হয়েছে?

বাবার টেনশন হবে, আর গৌড়েশ্বর মণ্ডল বাড়িতে বসে পা নাচাবে, বাবার একদম সহ্য হয় না লোকটাকে।

শুভব্রত চুপ করে থাকল, তারপর বলল, আমি যাব একদিন?

চিনতে পারবেন?

খুব পারব, আমার সাইকেল চিনে নেবে।

সাইকেলে করে অতদূর!

কত দূর, কাছেই তো।

আমার মনে হয় যে অনেক অনেক দূর, পঞ্চাশ ষাট একশো বছরের পিছনে পড়ে রয়েছে ও জায়গা, অতদূর পিছিয়ে যেতে পারবেন?

সময়কে পিছিয়ে নিতে হবে? এইচ জি ওয়েল্‌স, আইজাক অ্যাসিমভ?

পাখি বলল, হ্যাঁ তাই।

তুমি পড়েছ?

না পড়িনি।

তবে যে হ্যাঁ বললে?

জানি না কেন বললাম।

শুভব্রত হেসে উঠল। তার ওঠার সময় হয়ে গেছে। উঠলও। উঠতে উঠতে বলল, তোমার বাবার কাছ থেকে ডিরেকশানটা জেনে নেব।

কেন গিয়ে কী হবে? পাখিও উঠে দাঁড়াল।

শুভব্রত বলল, বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেলেই তো তোমাদের সঙ্গে জগৎপুরের আর সম্পর্ক থাকল না, জগৎপুর মুছে যাবে তোমাদের জীবন থেকে।

পাখি বলল, ধূলিহরও।

হ্যাঁ, তোমাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতিও।

পাখি বলল, ও সব কল্পনা, আমার দেশ তো এটা।

তখন শুভব্রত বলল, এমন যদি হতো, ধরো—। থেমে গেল শুভব্রত, চুপ করে থাকল। কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না। কী রকম যেন হয়ে গেছে চোখ দুটো। পাখি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। শুনতেও পাচ্ছে না বলা কথা।.... যদি এমন হতো সে আর শুভব্রত ওই জগৎপুরের বাড়িটায়..। মাথা নত হয়ে গেল পাখির, চাপা গলায় বলল, দুধকুমার তুমি এখন যাও।

যাব পাখি যাব?

হ্যাঁ যাও, যাও, আমার ভয় করছে খুব।

তুমি বুঝে গেলে?

হ্যাঁ দুধকুমার হ্যাঁ। বলে পাখি দুহাতে মুখ ঢাকল। তারপর কী গভীর নৈঃশব্দ্য বয়ে যেতে লাগল দু'জনের ভিতরে যে! পাখি যখন মুখ থেকে হাত নামাল, শুভব্রতকে দেখতে পেল না।

কেন যে তাদের বাড়িটা করেছিল বাবা? যদি করেও থাকে তবে তা বিক্রিই বা করছে কেন? রাতে পাখি একা একা অন্ধকারে শুয়ে ভাবে। হয়ত তার দুধকুমার ওই বাড়িটা কিনবে ভেবেছিল? ও নয়, ওর বাবা। দু কামরার আধো অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ফ্ল্যাটে থাকার চেয়ে একটু দূরে জগৎপুরের আলো হাওয়ার ভিতরে ওই চমৎকার বাড়িতে থাকায় অনেক সুখ। আর দুধকুমারের যখন সাইকেল আছে অসুবিধে কী? জগৎপুর থেকে সাইকেলে চেপে সে হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াতে পারবে। বলতে পারছে না শুভব্রত। বলতে পারছে না কোনো কথাই। ওই বাড়িতে সে পাখিকে নিয়ে যাবে সাইকেলের পিছনে বসিয়ে। এমন যদি হতো......। কী হতো? না, পাখি আর শুভব্রত! পাখি বিড়বিড় করল, তাহলে বাড়িটা থাক। এখন তো শুভব্রত কিনতে পারবে না। ওর বাবা-মার সে ক্ষমতা নেই, কিন্তু শুভব্রতর তো ক্ষমতা হবে একদিন। তখন এসে দাঁড়াবে বনগাঁর গগন মণ্ডল, সার একটা ক্রেতা আছে।

কে, নাম কী?

বলছি, আমাকে চিনতে পেরেছেন তো?

বিজন বলল, না তো।

পাখি বলল, আমি পেরেছি, আপনার চুলগুলো সব শাদা হয়ে গেছে, আপনি আরো রোগা হয়ে গেছেন যে।

কে বলো দেখি মেয়ে?

এখনো আলো জ্বালান সন্ধেবেলায়?

গগন মণ্ডল অভিভূতের মতো বলল, প্রদীপ জ্বালাই পথে পথে।

পাখি বলল, যেমন জ্বলে আকাশে?

বলতে পার তা! লোকটা কেমন অদ্ভুত চোখে তাকায়। বিড়বিড়িয়ে বলে, ধরো একজন জ্বালান মস্ত আকাশে, সন্ধে থেকে সারারাত ধরে, আর আমি এই সামান্য মানুষ, বিকেল কখন ফুরোবে তার অপেক্ষায় বসে থাকি, তারপর বেরিয়ে পড়ি, একটি দুটি তারা ওঠে ফুটি ফুটি...

পাখি বলল, কী সুন্দর!

কী সুন্দর?

এই আপনার কাজটা।

তখন বিজন না পেরে বলল, সেই যে একটা স্মাগলারের জন্য বাড়ি কিনতে এসেছিলেন চার বছর আগে, এবার কিনবে কে টেররিস্ট?

কী যে বলেন সার, আমি কি জানতাম আগে?

আমি খোঁজ নিয়েছিলাম জানেন তো?

কী দরকার জানার, বলছি এবারের যিনি তিনি খুব ভাল ক্যানডিডেট, আপনি দেখলেই বুঝবেন রহিস্ পার্সন।

কী নাম তাঁর?

আঁজ্ঞে দুধকুমার রাজকুমার।

বিজন নড়ে বসল, জিজ্ঞেস করল, বাড়ি কোথায়?

এই নাগেরবাজার থেকে উত্তর-পশ্চিমে।

বিজন জিজ্ঞেস করল, কী করেন?

কাজ করেন, ভাল কাজ।

বিজন জিজ্ঞেস করল, বয়স কত?

আঁজ্ঞে বত্রিশ তেত্রিশ, বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান, ঘোড়ার পিঠে ছুটে বেড়ায়, যে সে ঘোড়া নয়, পক্ষীরাজ।

পাখি জিজ্ঞেস করল, দুই চাকার?

তুমি কী করে জানলে মা?

পাখি বলল, মনে হলো তাই বললাম।

তখন গগন মণ্ডল লাইটম্যান বলল, হ্যাঁ সাইকেল ছাড়া চলেন না, অতবড় চাকরি, মেঘ নিয়ে গবেষণা ওঁর কাজ, মাসে লাখ টাকা বেতন কিন্তু সাইকেল ছাড়া চলেন না, আর একটাকা হাতে নিয়ে বাকি বেতন গবেষণায় দান করে দেন।

পাখি বলল, তাই তো হবে।

গগন বলল, তাহলে বাবাকে দিতে বল, কথা বলে সুখ পাবেন।

বিজন বলল, কথা দিতে পারছি না, খোঁজ নিতে হবে।

পাখি আর পারল না, বলে উঠল, না বাবা খোঁজ নিতে হবে না, ও তো আমার রাজকুমার দুধকুমার।

হ্যাঁ ওঁর। বলে পাখিকে জোড় হাতে নমস্কার জানাল গগন মণ্ডল, বলল, এমন ভাল মানুষ আর পাবেন না, দিয়ে দিন সার, ওর ও তো বয়স হয়ে যাচ্ছে, মানে আপনার বাড়ির, বয়স হলে দর কমে যাবে, দিন সার দিয়ে দিন, সাইকেলে করে এসে কথা বলতে চান উনি, কথা বলুন না, দেখুন না সার, ট্রাই করতে দোষ কী?

নয়

সক্কালে এল একদিন রাজেশ ত্রিপাঠী—মুন্না। সঙ্গে একজন বুড়ো মতো মানুষ, প্যান্টশার্ট পরা। রাজেশ পরিচয় করিয়ে দিল, সার ইনি হলেন গণেশ তিওয়ারি, হামার মুলুকের লোক, ভকিল।

বিজন বলল, উনি বাড়ি দেখলেন?

নো সার, ভকিল পুরা কাজটা করে বাড়ি দেখতেও পারে নাও পারে।

উকিল গণেশ তিওয়ারি বলল, হামার কাজ সব পেপারে, হামি স্পটে যাই না কখনো, দরকার পড়ে না।

পেপারে কী দেখলেন?

সব কুছ ঠিক হ্যায়।

তাহলে কী বলবেন?

মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে ওর এগ্রিমেন্ট করতে হবে, ব্যাঙ্ক এগ্রিমেন্ট চাইছে, মানে বাড়িটা যে আপনিই ওকে বিক্রি করবেন তার গ্যারান্টি।

সে করে দেব ছ'মাসের জন্য।

ছ'মাস কিঁউ পন্দেরো দিনে হয়ে যাবে।

তাহলে পনেরো দিনের চুক্তি করি।

নো নো সার ছ'মাহিনাই করুন, হামি বলছি ওতো দিন লাগবে না।

বিজন বলল, কিন্তু এতে ছ'মাস তো বাড়িটা আটকে থাকল।

আপনি অ্যাডভান্স নিন, না কিনতে পারলে টাকা ফরফিট হয়ে যাবে।

বিজন মাথা নাড়ল, অ্যাডভান্স তো নিতে পারব না।

তাহলে এগ্রিমেন্ট হবে কী করে?

এমনি হবে। বিজন বলল।

তিওয়ারি উকিল বলল, ও এগ্রিমেন্টের কোনো ভ্যালু নেই সার, রূপয়া ট্রানজ্যাকশন নাহলে ব্যাঙ্ক ওটা নেবেই না।

বিজন বুঝল টাকা দিয়ে বাড়িটা বেঁধে নিতে চাইছে উকিল। তারপর আজ না কাল করবে। এ হলো উকিলের বুদ্ধি। মুন্নার মাথায় এত বুদ্ধি নেই। মুন্না কেমন করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, কত টাকা অ্যাডভান্স দেবেন?

আজ্ঞে বিশ হাজার।

বিশ হাজার টাকায় ওই বাড়িটা হয়ে যাবে?

কিঁউ সার! উকিল বলল, ছ'মাহিনার ভিতরে রেজিস্ট্রেশন!

বিজন বলল, থাক উকিলবাবু, আপনি লোনটা বের করে দিন, একেবারেই টাকা নেব।

লেকিন অ্যাডভান্স তো নিতেই হবে।

মাথা নাড়ে বিজন, না নিতে হবেই না, আমার বন্ধু ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আছে, ফোন করব?

সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ ত্রিপাঠী বলল, কোন ব্যাঙ্ক কোন ব্রাঞ্চ সার?

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ফিয়ার্স লেন ব্রাঞ্চ।

আপনি একটু বলে দিন সার, হামাকে লোনটা স্যাংশন করে দিক।

তুমি কি ওখানে অ্যাপ্লাই করেছ?

নো সার, হামি পাঞ্জাব ব্যাঙ্ক, ইউ বি আই আর ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তিন ব্রাঞ্চে গেলাম, ফ্যাকড়া তুলছে।

কীসের ফ্যাকড়া?

তখন উকিল তিওয়ারি ধমকে উঠল, আরে চুপ যা মুন্না, সব বেপার গোলমাল করে দিস, ওসব ডিসপ্যুট হামি কিলিয়ার করে দিব, সার অ্যাডভান্সটা নিয়ে এসেছি, রিসিট করে এনেছি, ক্যাশ টাকা, আপনি ইচ্ছে মতো খরচ করুন।

বিজন মাথা নাড়ল, নো তিওয়ারি বাবু, হবে না, এই মুন্না তুমি চলে যাও ফিয়ার্স লেন ব্রাঞ্চে, আমি ফোন করে দিচ্ছি।

সার আপনি হামার গ্যারান্টার হবেন?

আমি! বিজন অবাক, আমি গ্যারান্টার হব কেন?

হবেন সার, গ্যারান্টার প্লাস মর্টগেজ, দুই-ই চায় ব্যাঙ্ক।

গ্যারান্টার যে কেউ হতে পারে।

সার আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে বলে দিন, হামি চলে যাচ্ছি, আপনি গ্যারান্টার হয়ে যান, মর্টগেজ না দিয়েও ম্যানিজার লোন স্যাংশন করে দেবে।

মর্টগেজ কেন দেবে, চাকরিই তো গ্যারান্টি। বিজন বলল।

হামার চিঠি এখনো আসেনি। মুন্না বলল।

কিসের চিঠি?

অ্যাবসর্ব করবে তো, ওটা হয়ে যাবে, রাইটার্স গেছে রিপোর্ট।

তুমি কী চাকরি কর মুন্না?

সি. ও সার, কম্পিউটার অপারেটর, ডেইলি ওয়েজ বেসিসে করি, ইট উইল বি কনফার্মড সুন, চাকরি পাকা হয়ে যাবে, তখন লোনের অসুবিধে হবে না।

তুমি কতটা পড়েছ?

বি. এস.-সি. কেমিস্ট্রি অনার্স, এম. এস.-সি. চান্স হয়ে গেছিল, কিন্তু বাবুজি রিটায়ার করে গেল।

কোথায় চাকরি করতেন উনি?

সি পি ডব্লু ডি, হামার পাঁচ বহিন সার, ওদের ম্যারেজেই সব চলে গেছে, হামাকে তাই এ কাজে ঢুকতে হলো।

দিস ইজ নট আ গুড জব।

আই নো ইট সার, লেকিন জব দিবে কে? হামার পাঁচ পাঁচ দশহাজার রূপয়া দালালে হজম করে দিয়েছে।

তুমি তো লোন পাবে না মুন্না।

পাব সার, আপনি বলে দিন মুন্না সব রূপয়া শোধ করে দিবে, চাকরি কনফার্ম হলে মাস মাহিনার হাফ দিয়ে দেব, বাবুজি বলেছে দেশ থেকে রূপয়া পাঠাবে, হয়ে যাবে সার, ভাগোয়ান ঠিক জিন্দা রাখবে।

ব্যাঙ্কের তো নিয়ম-কানুন আছে।

ম্যানজার সব পারে সার, আপনি উঁচা আদমি আছেন, বড়িয়া কাম করেন, অফিসার আছেন, আপনি গ্যারান্টার হলে ঠিক দিয়ে দেবে ম্যানিজার।

বিজন দেখছিল মুন্না-রাজেশ ত্রিপাঠীর পিছনে যেন তার ঠাকুর্দা দুর্গাদাস দাঁড়িয়ে আছেন সহাস্য মুখে। ঠাকুর্দার প্রবল আপত্তি এই লোকটাকে বাড়ি বেচায়। ভাল লোকটা ওখানে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু রাজেশ ত্রিপাঠীকে দেখে কি নষ্ট হওয়ার মতো মানুষ মনে হয়? জলে ধোয়া ওই মুখে কি ধুলোবালি লাগতে পারে?

বিজন বলল, আমি বাড়ি বেচব তোমাকে, আমি গ্যারান্টার হব তোমার লোনের, এর চেয়ে অ্যাবসার্ড কিছু হয়?

হামি সার ঠিক করে নিয়েছি, বাড়ির পজেশন নিলাম রেজিস্ট্রি করে, উসকি বাদ বাড়ি মর্টগেজ দিয়ে অন্য ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে আপনার ব্যাঙ্কের লোন শোধ করলাম, এবার হামার লোন হামি শোধ দিব।

কী বললে বুঝতে পারছি না। বিজন বলল।

রাজেশের গলা আটকে যাচ্ছে। কথাটা বলেও বলতে পারছে না সে। উকিল তিওয়ারি ব্যাগ থেকে এগ্রিমেন্টের টাইপড্ কপিতে চোখ বুলোচ্ছে। বিজন তাকিয়ে আছে মুন্না-রাজেশ ত্রিপাঠীর দিকে। সে বলল, হামাকে কি খারাপ লোক মনে হয় সার?

না, সে কথা উঠছে কেন?

আপনার মকানে ভগোয়ান আছে সত্যি।

যার যা বিশ্বাস।

হামি ঢুকতে ঢুকতে ধুপধুনোর গন্ধ পেয়েছি।

ভাল, কিন্তু বাড়ি তো বেচতে হবে।

বাড়ি না ওটা মন্দির সার।

মন্দিরে মানুষ থাকে না, দেবতা।

মুন্না বলল, সাচ বাত সার, লেকিন ই মকানে হামরা পূজারির মতো থাকব, পূজারি তো মন্দিরে থাকে।

এবার উকিল বিরক্ত হয়ে ওঠে, বলল, আরে মুন্না হামার ফিজ্ দে, হামি চলে যাই, তুই এত ফালতু বকিস।

ফালতু কেন হবে, ইম্পর্টান্ট কথা হচ্ছে। বিজন বলল।

নো সার, ও ভেবেছে ওর মুখ দেখে সবাই লোন দেবে, হামি চার পাঁচটা ব্যাঙ্কের পর ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে গেলাম, কেউ দিচ্ছে না, বাট আই উইল ডু ইট, হামি তিওয়ারি আছি, হামি যা বলি তা করি।

মুন্না মাথা দোলায়, হাঁ সার বহুৎ নামী ভকিল আছে, ওর টায়েম হয় না যে দুটো কথা বলবে।

বিজন ভাবছিল কী ভাবে রাজেশ ত্রিপাঠী-পেয়ারের মুন্না টাকাটা জোগাড় করতে পারে। দুর্গাদাস যে আটকাচ্ছে লোন তা বুঝতে পারছে বিজন। দুর্গাদাসের মায়া পড়ে গেছে লোকটার উপর। আহারে, এমন ভালমানুষটি গৌড়েশ্বর আর দুধকুমারের হাতে গিয়ে পড়বে! দুধকুমারের বউ ওকে গিলে নিতে বসে আছে। উর্বশী মেনকা কত মুনি ঋষির ধ্যান ভাঙিয়েছে তো রাজেশ ত্রিপাঠী। চাঁদনি একবার কটাক্ষ হানলে রাজেশের মাথা থেকে ভগবান উবে

যাবে। কিন্তু দুর্গাদাসের বিপক্ষে কালিদাস ও যে আছে। বিজন বলল, লোন তো দেবে না তোমাকে, অ্যাডভান্স নিয়ে আমি কী করব?

সে হামি বুঝে নেব সার। তিওয়ারি উকিল বলল।

বিজন বলল, অ্যাডভান্স নিয়ে আমাকে আটকে দেবেন?

নো সার। তিওয়ারি বোঝাতে লাগল রাজেশ ত্রিপাঠীর অসুবিধে কোথায়। বুঝতে বুঝতে বিজন বলল, সে তো আমার দায় নয়।

বাড়িটা ওর পছন্দ হয়েছে।

বিজন বলল, আমার তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল খুব পছন্দ, কিনতে যাব নাকি, আপনি যান।

চুক্তিপত্রটা দেখুন।

বিজন বলল, মুন্না এখানে এলে একা আসবে।

রাজেশ ত্রিপাঠী বিপদেই পড়ল। এই তিওয়ারি উকিলে তার খুব বিশ্বাস। আবার বিজনকে ছেড়ে ও তো যেতে পারবে না। তিওয়ারি উঠে দাঁড়ায়, হাম যা রহা মুন্না, ও ক্ কে।

রাজেশ ত্রিপাঠী বলল, নেহি তিওয়ারিজি, সার খুব ভাল মানুষ।

তিওয়ারি বলল, তুমি থাক এখানে, হামি যাচ্ছি, তুমি এক্টা বুড়বক আছ মুন্না, মকান তুমি পাবে না।

কিঁউ, পাব না কেন?

তিওয়ারি বলল, হি ইজ জাস্ট প্লেয়িং আ গেম উইথ ইউ, অন্য কাউকে বিক্রি করবেন উনি।

কৌন বোলা?

হামি বলছি মুন্না, তোমাকেই যদি সেল করবেন তো এগ্রিমেন্টে রাজি কেন হবেন না।

বিজন বলল,আপনি বড় উকিল তিওয়ারি বাবু, ঠিক ধরেছেন।

তিওয়ারি বলল, ডেইলি হামাকে বহুৎ আদমিকে মিট করতে হয় বিজনবাবু, হামি বুঝি কৌন আদমি কেমন।

আমি কেমন?

তিওয়ারি বলল, ফুল অফ কমপ্লেক্স, আ ক্লেভার ম্যান।

গুড, ঠিকই ধরেছেন।

তিওয়ারি তিক্ত হাসি মুখে ফুটিয়ে বলে, লেকিন মুন্না খুব ভাল ছেলে, সিম্পিল, ওকে নাচানো ঠিক না।

কে নাচাচ্ছে?

হামি যাই, নমস্কার। বলে তিওয়ারি তড়িৎগতিতে বেরিয়ে গেল। মুন্না হাঁ

করে দরজার দিকে তাকিয়ে। তার মুখখানিতে হতাশার এমন ছায়া পড়ল যে বিজনের কষ্ট হলো। সে বলল, তুমি বসো।

বসছি, লেকিন ভকিল চলে গেল।

যাক।

ভকিল ছাড়া লোন বের করা যাবে না।

পরে যোগাযোগ করো, মুন্না ও বাড়ির সন্ধান পেলে কী করে?

রাজেশ ত্রিপাঠী বলল, দুধকুমার মণ্ডল বলেছিল।

দুধকুমারকে চিনতে?

নো সার, চায়ের দুকানে আলাপ, আমি বাড়ি খুঁজছি শুনে যেতে বলল ওর বাড়ি।

গেলে?

হাঁ গেলাম, পর্চা কাগজ দেখাল।

ওর বউ?

হাঁ সার, তারপর বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেল, গৌড়া মণ্ডল ফার্স্ট ডে থেকে ঝামেলা করছে, দেড়শো রুপয়ার কমে ঢুকতে দিল না।

ও বাড়িতে ভগবান আছে?

ইয়েস সার, হামি তো বলেইছি।

কিনতেই হবে?

ইয়েস সার।

ফ্যামিলি থাকতে পারবে অত ভিতরে?

ফেমিলি আসবে যাবে, দেশে থাকে তো।

আনবে না।

আনব সার, সব আনব।

তোমার লোন তো হচ্ছে না।

হবে সার, হামি বলছি সার আপনি গ্যারান্টার হয়ে যান।

আমি কেন গ্যারান্টার হব?

রাজেশ ত্রিপাঠী তার হাত ধরে ফেলল, নাহলে ও মকান কিনা হবে না হামার, লোন হামি পাব না বুঝে গেছি।

বিজনের মায়া হলো, আবার সন্দেহও হলো, বলল, যদি না বিক্রি হয় কিনবে, টাকা জোগাড় করো।

মকান হামার চাই সার, হামি ডিসঅনেস্ট নই, টাকা ঠিক শোধ করব, সার আপনি লোন নিন, হামি মাসে মাসে আপনাকে শোধ করব।

আমি বিজন নিজের বুকে হাত দিল, আমি লোন নেব?

হ্যাঁ সাব, হামার হয়ে আপনি।

আমি লোন নিয়ে বাড়ি সেল করব? বিজন অবাক।

ইয়েস সার।

পাগল নাকি?

রাজেশ ত্রিপাঠী তার হাত ছেড়ে দিল, দু-হাত জোড় করে প্রার্থনা করল, প্লীইজ সার, হামি এছাড়া পারব না, ও মকান হামার চাই।

কেন চাই?

অন্তর বলছে সার।

নাকি আর কেউ বলছে?

আর কে বলবে?

কেউ টানছে?

কে টানবে সার।

তুমি খুব ভাল জানো মুন্না, আমি যে কারণে বাড়ি বেচে দিচ্ছি, তুমিও তাই করবে পরে, দুধকুমারের বউকে দেখেছ?

রাজেশ ত্রিপাঠীর মাথা নেমে গেল। থর থর করে কাঁপতে লাগল সে। বলল, হামি ক্যারেক্টার নিয়ে খুব ভাবি সার, কেউ বলতে পারবে না হামি খারাপ আছি, মকানটা হামার এত পসন্দ, সার আপনি লোন নিলে সব মিটে যেত, নিন না সার, লোন নিয়ে হামাকে দিন, হামি আপনাকে দাম মিটিয়ে দিই, পরে হামিই লোন শোধ করি—

বিজন অভিভূত হয়ে রাজেশ ত্রিপাঠীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন কথা শোনাও তো ভাগ্য নিশ্চয়।

দশ

খদ্দের আসছে না, দালাল আসছে। খদ্দের নয় দালাল ফোন করছে। দালাল নিজে দরাদরি করছে, বিজন খদ্দেরকে সামনে আনতে বললে চুপ করে যাচ্ছে। এর ভিতরে গৌড়েশ্বর মণ্ডলের সঙ্গে দুধকুমার মণ্ডলের খুব ঝামেলা হয়ে গেছে একদিন। দুধকুমার এক খদ্দেরকে নিয়ে গিয়েছিল, গৌড়েশ্বর ঢুকতে তো দেয়নি, বেজায় খিস্তি করে তাড়িয়েছে। তা নিয়ে দু'পক্ষই ফোন করল। তারপর গৌড়েশ্বর বলল, সে পাকা খদ্দের নিয়ে যাচ্ছে, আসামের সেই লোক, শুধু সে যা বলবে তা শুনতে হবে বিজনকে।

তারা এল বটে। গৌড়েশ্বর বলল, বারো লাখ ছাড়া হবে না। বিজন চুপ করে থাকল। আসামের লোককে দেখে বিজনের ভাল লাগল না। পালিয়ে

আসছে! এতদিন ওখানে খেয়ে পরে এবার জঙ্গির ভয়ে চলে আসছে? এখানে বসেই নাকি আসামের সঙ্গে কাঠের ব্যবসা করবে সে।

বিজন ডাকল গৌড়েশ্বরকে পাশের ঘরে, বলল, কাগজপত্র জেরক্স আছে, কিন্তু বারো লাখে আমি কত পাব?

নয়, আমি তিন, টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট, মুন্না তো ছ'লাখ দিচ্ছিল।

বিজন বলল, না আমার এগার লাখ আশি চাই, আপনি কুড়ি হাজার পাবেন।

গৌড়েশ্বর বলল, তার মানে?

যা বললাম তাই।

ও পরে হবে দাদা, আগে কাগজ দিন।

না না কথাটা হয়ে যাক।

আমি এমন খদ্দের আনলাম তার পুরস্কার এই?

আপনি তিন লাখ কোন কারণে পাবেন?

এখন ঝগড়া না দাদা, কাগজ দিন, ওরা সার্চ করে নিক, আমি উকিল ঠিক করে দিচ্ছি, ওরা দলিল লিখিয়ে নিক, বাড়িতে রেজিস্টার এনে সইসবুদ লেনদেন হবে।

বিজন বলল, আমার ওইটা চাই, আমার বাড়ি থেকে আপনি মোটা মুনাফা করুন আমি তা চাই না।

এসব কী হচ্ছে দাদা?

যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে।

আপনি কি বেচবেন না?

হ্যাঁ বেচব, কিন্তু আপনাকে বেশি পেতে দেব না।

আপনি খুব খারাপ করছেন।

ঠিকই করছি। বিজন বলল, দালালি করে ফোকটে তিন লাখ, আমাকে তাই মিথ্যে বলতে হবে, আমি গিয়ে বলছি ন'লাখ, আমার হাতে ব্যাঙ্কড্রাফট দিতে হবে, তারপর যা দেব আমি পাঁচ দশ তাই নেবেন।

আমি যাচ্ছি দাদা।

যান।

কিন্তু এটা ভাল করলেন না, আমার প্রেস্টিজ ডাউন হয়ে গেল, আমি বলেছি আমার কাছে পাওয়ার দেওয়া আছে।

পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি?

হ্যাঁ, কিন্তু আমি মিথ্যেবাদি হয়ে যাব সবার কাছে।

মিথ্যে বলার সময় মনে থাকে না?

মৃদু কণ্ঠে যে আলাপ আরম্ভ হয়েছিল তা আর মৃদু থাকে না। ধীরে ধীরে

কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে পৌঁছে যেতে থাকে। বিজনের খুব রাগ এই লোকটার উপর। তার বাড়িতে ঢুকে পড়ে বাড়ি দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করছে। মুন্না অন্তত দু আড়াই হাজার টাকা খরচ করেছে আত্মীয় স্বজন নিয়ে বেশ কয়েকবার বাড়ি দেখার জন্য। বিজন আজ লোকটাকে বাড়িতে ফেলে অপমান করবে। বলল, বাড়ি দেখানোর জন্য কত হলো এ পর্যন্ত, দিয়ে যাও গৌড়াবাবু।

দাদা আপনার কী হয়েছে?

কিছু হয়নি, আমাকে বুদ্ধু পেয়েছ, আমার বাড়ি দেখানোর জন্য তুমি দেড়শো-দুশো টাকার টিকিট করেছ, মুন্না কত দিয়েছে? সব ওকে ফেরত দিতে হবে।

দাদা আমি আপনার বাড়ি এসেছি।

আমার বাড়িতেই তো বডি ফেলে আছ জগৎপুরে, মুন্না কতবার দেখেছে বাড়ি? বলেই বিজন তার মোবাইলে ধরল মুন্নাকে, জিজ্ঞেস করল। দুঃখিত মুন্না বলল, ও বাদ দিন সাব।

কতবার বলবে, তারপর ও টাকা ফেরতে পাবে।

নেহি সাব, আই অ্যাম ট্রাইয়িং টু গেট দি লোন।

তুমি যা ইচ্ছে করো, কিন্তু গৌড়াকে কত দিয়েছ বাড়ি দেখার জন্য।

তিন হাজার হোবে সাব, বিশ বার দেখেছি, হামার নোট করা আছে ডায়েরিতে, সাব হামি একটা কোম্পানির সঙ্গে কথা বলছি, লোন দিবে বলছে।

গ্যারান্টার?

লাগবে না, সুদটা বেশি হচ্ছে।

কত?

টু পার্সেন্টি পার মান্থ সার?

বছরে চব্বিশ?

ইয়েস সার।

তুমি মরে যাবে মুন্না।

হামার ও মকান চাই সাব, ও মকানে সত্যি ভগোয়ান আছে, হামি জানি ও মকানে ঢুকলে হামার লাক ফিরে যাবে।

ফোনটা একটু বাদে রেখে দিয়ে বিজন বলল, মুন্নাকে তিন হাজার টাকা ফেরত দিন।

কোথা থেকে দেব, কেনই বা দেব, শুধু লোক আনবে আর আমাকে দরজা খুলতে হবে।

যা বলছি তাই করো।

করব না, কী করবেন?

ঘাড় ধরে বের করে দেব বাড়ি থেকে।

আসুন না, আমিও যত কেচ্ছা সব বলে যাব, বাড়ি থেকে বেরোব না, কী করবেন।

অ্যাই বেরো এখান থেকে।

তখন কবিতা ঢুকে পড়ল, ছি ছি ছি, উনি বাড়িতে এসেছেন, ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে আছে, বসুন গৌড়াবাবু, আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

গৌড়েশ্বর মাথা নিচু করে ফুঁসছিল। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হলো। তারপর উঠে ভিতরে ঢুকে আসামের ক্রেতাকে বলল, আমি যাই, আপনি কথা বলুন, তবে আমার পাওনাটা চাই, টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য সেল ভ্যালু, না হলে বাড়ির দখল পাবেন না।

আসামের লোক বুঝল গোলমালে পড়েছে। এমন গোলমাল ভরা বাড়ি সে কিনতে যাবে কেন? বিজনের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের কথা কাটাকাটির সবটাই শুনেছে সে। সে নমস্কার জানিয়ে উঠে গেল। বিজন কবিতাকে বলল, ঠিক করেছি, হি ইজ আ কালপ্রিট, আমার বাড়ি বেচবে বারো না তেরো লাখে, আমাকে দেবে ন'লাখ।

ন'লাখ তো তুমি এমনি পাবে না, ও বাড়ির দাম হয় অত?

বিজন বলল, আমি যা পাই পাব, কিন্তু ও কেন ইনকাম করবে আমার বাড়ি নিয়ে, ওর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বিকেলে দুধকুমার এল। বিষণ্ণ মুখ, বলল, দাদাবাবু, মুন্না খুব কান্নাকাটি করেছে আপনি আগাম নেননি তাই, বাড়ি কি ও পাবে না?

লোন নিতে যদি দশ বছর হয় আমি বাড়ি রেখে দেব?

ও যা পারে দেবে, ওকে ঢুকিয়ে দিন বাড়িতে, যতদিন ফুল পেমেন্টে না হয় রেজস্ট্রি হবে না, ও ফেমিলিও আনবে না।

মুন্না বলেছে?

হ্যাঁ দা'বাবু, বলেছে মাসে মাসে টাকা দেবে লোন শোধের মত, চেক দিয়ে দেবে, মাসে মাসে ব্যাঙ্কে দেবেন আপনি, কিস্তিতে নেবে।

হয় না।

আমার এই খদ্দের তাহলে পাবে না?

না পাবে না। বিজন বলল, অন্য খদ্দের আছে?

আছে, সে তো অনেকদিন আমাকে বলছে, খুব দুঃখী মানুষ অথচ কত পাওয়ার, গৌড়াকা' হাঁকিয়ে দিয়েছিল, ওর কাছে গিয়েছিল বাড়ির জন্য।

মুন্নার মত লোন না পেয়ে দুঃখী?

না দাদাবাবু, টাকা এক হাতে বাড়ি অন্য হাতে।

কে সে?

নন্দীবাবু, পুলিশের অফিসার।

বিজন বলল, না হবে না।

কেন হবে না?

পুলিশ আমার পছন্দ হয় না, ভয় লাগে, কী রকম পেটায় মানুষকে, ভয় দেখিয়ে টাকা নেয়।

এক পয়সাও নেয় না, নির্দোষকে পেটায় না।

কী করে জানলে?

জানি দা'বাবু, আমাকে একবার উনিই তুলেছিল নেশা করে রাস্তায় মাতলামি করছিলাম তাই।

মারেনি তুলে নিয়ে?

না দাদাবাবু, তবে মারে না কি, তেমন হলে হয়, মাস্তান দাদাকে ধরে পেটায়, খুব রোষ তখন, দেখলে ভয় লাগে।

বিজন বলল, কী জানি, আমার বাড়িতে পুলিশ ঢুকবে, পাবলিক পিটিয়ে বাড়ি ফিরবে, হাজতে পিটিয়ে ঘরে ফিরবে!

দুধকুমার বলল, দা'বাবু, খুব দুঃখী উনি, দুঃখে পড়ে শপথ করেছে নির্দোষকে মারবে না, ভাল কাজ করবে।

দুঃখী কেন?

কেন আবার একটা ছেলে, দেহে বড় হয়েছে মাথা বাড়েনি, উনি চায় জগৎপুরে গিয়ে যদি ছেলেটা ভাল হয়।

হবে?

তুমার বাড়িতে ভগবান আছে দা'বাবু, আমি তাই বলেছি, তারপর থেকে ধরেছে খুব, আমি বলিনি, অমন জড়বুদ্ধি ছেলে নিয়ে যে ফেমিলি, তারে তুমি কি দেবা বাড়ি, তুমার তো পছন্দ আছে।

বিজন জিজ্ঞেস করল, কী করব?

দাও, গৌড়া বলেছিল দাদা বেচবে না আপনি আসবেন না।

বিজন বলল, খবর দেবে, কথা বলতে দোষ কী?

দিচ্ছি দা'বাবু, মুন্না ফুটুক, মুন্না কেন অত নাছোড়বান্দা তা কি আমি জানিনে, আমারও পাপ হচ্ছিল, আমার ফেমিলির ও পাপ হচ্ছিল, ভগবানেরও পাপ হচ্ছিল, মুন্না খারাপ হওয়ার জন্যি পাগল হয়েছে ও বাড়ি নে তা কি আমি বুঝিনে দা'বাবু।

বিজন বলল, তাহলে কী করব?

কালই নিয়ে আসি, ফোন করে দেব।

তুমি জগৎপুরে নিয়ে এস, আমি যাব, বাড়িতে বসে কথা হবে।

হলো তাই। বিজন সে দিন মেয়েকে বলল, যাবি?

পাখি বলল, যাব।

তাহলে চল।

তখন কবিতা বলল, না,আগে বিক্রি হয়ে যাক, আমরা সবাই দেখতে যাব কে কিনল, কেমন আছে তারা, তোকে যেতে হবে না।

পাখির মন খারাপ হয়ে গেল। তারপর ভাবল, তাই ভাল। কেন যাবে? বাড়িটা রেখে দিলে না হয় দুধকুমার-শুভব্রতকে একদিন নিয়ে আসত গগন মণ্ডল। বলত, সচ্চরিত্র, ভাল চাকরি, ভাল ফেমিলি, এর চেয়ে ভাল পাত্র আর পাবেন না সার, আর একটা ছেলের মতো থাকবে ও বাড়িতে .....।

ইস! ভাবতে গেলেই পাখির সর্বাঙ্গ কাঁপছে। মন খারাপ করে পাখি বসে থাকল জানালার ধারে। কোনোদিনই আর শুভব্রতর সাইকেলের পিছনে বসে জগৎপুরে যাওয়া হবে না তার। গগন মণ্ডলও আসবে না প্রস্তাব নিয়ে। কী যে হলো তার! ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল পাখি। তার দুধকুমার সাইকেলে চেপে কলকাতা শহর পাড়ি দিচ্ছে এখন। নাগেরবাজার থেকে চলে যাচ্ছে বালিগঞ্জে, বালিগঞ্জ থেকে কসবা হয়ে বাইপাস দিয়ে ফিরে আসছে। পাখি মনে মনে বলল, ভাল ভাবে ফিরে আসুক, ভাল ভাবে ফিরে আসুক!

বিজন গেল। বিজনের আগেই সেই প্রিয়তোষ নন্দী তার ছেলেকে নিয়ে বসেছিল বাড়িতে। গৌড়েশ্বর গম্ভীর হয়ে বসেছিল ঘরের কোণে। দুধকুমার তার পাশে। বিজন বলল, দেব, এখানে পরিবার নিয়ে থাকবেন তো?

হ্যাঁ, বোসবাবু।

তাহলে আসুন আমার কলকাতার ফ্ল্যাটে, এ বাড়ি দেখে নিয়েছেন তো?

হ্যাঁ দেখেছি।

জড়ভরত ছেলেটি জুলজুল চোখে বিজনকে দেখছিল। মস্ত মাথা, মস্ত শরীর, বছর পনেরো ষোলো হবে। ওর নাম কপিল। কপিলের পিঠে হাত রাখলেন প্রিয়তোষ, বললেন, কপিল, এই আমাদের বাড়ি।

কপিল চুপ করে ঘরটা দেখতে লাগল ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। বিজন জিজ্ঞাসা করল, কেন হলো এমন?

ফরসেপ ডেলিভারি তো, মাথায় আঘাত লেগেছে।

কিছুই বোঝে না?

বোঝে অল্প অল্প, মাঝে মধ্যে ভায়োলেন্ট হয়ে যায়, এত বড় বাড়ি, ছাদ যদি ওর ভায়োলেন্সটা কমাতে পারে, বাগান করব সামনের জমিতে, ওকে বাগান করা শেখাব।

বিজন বলল, ভাল হবে।

ওর মা ওকে নিয়ে ওই মাঠের দিকে বিকেলে বেড়াতে যাবে, যেখানে থাকি মাঠ নেই, খেলার জায়গা নেই, ও ছেলে শুধু টিভির সামনে বসে থেকে থেকে হঠাৎ খেপে ওঠে, এই বাড়িতে শুনেছি ভগবান আছে।

বিজন অবাক হয়ে যাচ্ছিল। এমন দুঃখী মানুষ তো সে দ্যাখেনি। বলল, আপনাকেই দেব, আমি এমন মানুষই খুঁজছিলাম যে আমার ধূলিহরকে দেখবে, অনেক শ্রম দিয়েছি এ বাড়ির পিছনে।

প্রিয়তোষ চলে গেলেন। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। প্রিয়তোষের সঙ্গে দুধকুমারও গেল। বসে থাকল শুধু গৌড়েশ্বর। সে এত সময় নিজেকে চেপে রেখেছিল, বলল, আমি কি এমনি দিয়ে দেব?

তার মানে?

এতদিন রাখলাম, আমি কি বেরোব?

বেরোবেন না?

না।

বিজন বলল, আমি নন্দীবাবুকে বলছি, ওঁর বাড়ি বুঝে নেবেন উনি।

তার মানে?

হি ইজ ইন পোলিস সার্ভিস, তুমি পারবে?

গৌড়েশ্বর চুপ করে গেল। একটু বাদে বলল, ওকে তো আগে ঢুকতেই দিইনি ভিতরে, ওইরকম একটা পাগলা ছেলে আমার বাড়ির সামনে থাকবে দাদা?

থাকবে।

আমি শুনেছি ও রেগে গেলে ল্যাংটো হয়ে যায়।

যাবে, ভাল করার দায়িত্ব তোমার।

এটা ঠিক হলো, আসামের লোক কী অন্যায় করেছিল?

বিজন জবাব দেয় না। গৌড়েশ্বর আচমকা বিজনের হাত ধরে ফেলল, আমি কিছু পাব না?

কী পাবে, ফোকটের পয়সায় খুব মজা, মুন্নাকে টাকা ফেরত দিয়েছ?

কেন দেব, ঘর খুলতে হয়নি আমাকে?

ঘর তো খোলাই থাকে।

মুন্না ঘর দেখতে আসার নাম করে আমার জিনিস তুলে নিয়ে গেছে, একটা টর্চ, একটা ক্যালকুলেটার।

তুমি বুঝে নিয়ো।

গৌড়েশ্বর আবার চুপ করে থাকল। চুপই করে গেল। বিজন বলল, চাবি

দাও, মালপত্র যা আছে নন্দীর কাছ থেকে বুঝে নিয়ো।

গৌড়েশ্বর তার জিনিশপত্র বের করে চাবি দিয়ে দিল। মনে মনে কোনো পরিকল্পনা যে ভাঁজছে তা বিজন টের পাচ্ছিল। দেখা যাবে।

ফিরছিল বিজন নিশ্চিন্তে। একা একা অন্ধকারে। তখন তার পিছনে ঁকালিদাসের ছায়া জেগে উঠল, হেরে গেলাম, মুন্নাকে দিলি না বিজন।

বিজন বলল, যাও ঠাকুদ্দা ভাল হও, জড় ভরত ছেলেটাকে ভাল করো ওর পাশে থেকে থেকে।

পারব না।

কেন পারবে না, অনেক তো ভোগ করেছ, এবার একটু ত্যাগ করো।

ঁকালিদাসের ছায়া মিলিয়ে গেল। বিজন ঁদুর্গাদাসকে মনে মনে প্রণাম করল, বলল, তুমি ছিলে বলে ঠাকুর্দা আমি বাঁচলাম।

এগারো

কাহিনি শেষই হয়ে যেতে পারত। কিন্তু হয়নি। বিজন ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছিল জগৎপুর ধূলিহরের কথা, প্রিয়তোষ নন্দী, তার জড়ভরত ছেলে কপিল, দুধকুমার, চাঁদনি, গৌড়েশ্বর, সারা ওরফে সরস্বতী—সবার কথা। বিজন ভুলে যেতে পারে, কিন্তু জগৎপুর তো আছে। বাড়িখানির গায়ে শ্বেতপাথরে ধূলিহর নামটিও আছে। জগতে সব কিছুই নিজের মতো থাকে, সব গ্রাম সব নগর। যদি না ভূমিকম্পে বিধ্বংসী ঝড়ে, বন্যায় তা শেষ না হয়ে যায়।

বছর প্রায় ঘুরতে যাচ্ছে, গৌড়েশ্বর মণ্ডল চেষ্টা করে যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরোতেই বারোফুট রাস্তার ওপারের পাকা দালানের ছাদে কপিলকে দেখতে পায় সে। তাকে দেখলেই ছাদের পেরাপেট ধরে দাঁড়ায় কপিল। গৌড়েশ্বর তাকে ডাক দেয় চাপা গলায়, আয়, আয় লাফ দে, হাওয়ায় ভেসে যাবি, আয় লাফ দে।

সে একদিন প্রায় লাফিয়ে পড়েছিল আর কী, তখন সরস্বতী এসে দাঁড়ানোয় থেমে গিয়েছিল। জড়ভরত হলে কী হবে, যুবতী মেয়েমানুষ দেখলে স্থির হয়ে যায়। গৌড়েশ্বর জানে তার ডাকে একদিন ওই ছেলে হাওয়ায় নিজেকে ভাসিয়ে দেবেই। নীচে আছড়ে পড়ে মাথা ফেটে মরবে, না মরলেও মরার মতো হয়ে যাবে। গৌড়েশ্বর হিশেব করে ইট সিমেন্টে বাঁধানো চাতালটার সামনে এসেই চাপা গলায় ডাকে, আয়। চাতালে পড়লে ওর মাথার নরম ঘিলু ছিটকে যাবে সব দিকে। তারপর তো পুলিশ এ বাড়িতে আর থাকবে না। অপয়া হয়ে যাবে বাড়িটা। শয়তানের বাড়ি হয়ে যাবে। বিক্রি করবে

পুলিশ। গৌড়েশ্বর আবার দখল পাবে। দখল সে নেবেই।

গৌড়েশ্বর ডাকতে শীতের বিকেলে কপিল উপর থেকে একটা ইটের টুকরো ছুড়ে দিল তার দিকে। তারপর প্যারপেটের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে বার করে দিল প্রস্রাবের যন্ত্র। তীব্র বেগে তা নেমে এল গৌড়েশ্বরের দিকে। গৌড়েশ্বর সরে যেতে যেতে শুনল, শুয়ার!

সারা বেরিয়ে এসে বলল, ছি ছি মনা অমন করতে নেই।

গৌড়েশ্বর বলল, সরে যাও বউ মা, ও ছোট নেই, কী দেখছ!

আহ্ বাবা, তোমার মনে কি মায়া নেই! বলে দুচোখে কটাক্ষ হেনে সারা ঢুকে গেল ও বাড়িতে। ছেলের মা চুপ করে জানালার ধারে বসে বিকেল শেষ হয়ে যাওয়া দেখছিল। অঘ্রান মাসটা বড় মন খারাপ করায়।

সারা তরতর করে উপরে উঠে গিয়ে ডাক দিল, অ্যাই কপিল।

কপিল প্যান্টের জিপার খোলা অবস্থায় ঘুরল, কী?

তোর লজ্জা করে না?

কপিল হাঁ করে সারার দিকে তাকিয়ে, তারপর এগিয়ে গেল। ঝপ করে তার হাত ধরল, তুমি কি বউ?

বউ তো, এই কপিল!

কী?

আয় এখেনে আয়।

কপিল যেতে যেতে বলল, দেবে?

দেব আয়।

কপিল হাসল এমন চোখে যা দেখে সারার বুঝতে ভুল হয় না, বলল, চুপ কথা বলবি না।

কপিল মাথা কাত করে।

নে আমাকে ধর।

কপিল ধরল। একেবারে স্তনের ওপর হাত রাখল।

সারা জানে কপিলের মা এখন আসবে না। কপিলের মা কি টের পায় না? পায়। টের পেয়ে ও চুপ করে থাকে। সারা চাপা গলায় বলল, কী চাস?

চুমু।

আর অমন করবি?

না।

এটা সবার সামনে খুলবি? সারা জিপার থেকে বেরিয়ে আসা পুরুষাঙ্গটা চেপে আদর করে ঢুকিয়ে দেয় ভিতরে।

না।

বুড়ো যত ডাকুক, ছাতের ধারে যাবি?

না।

নে চুমু। বলে সারা কপিলের মস্ত বুকের উপর ঠোঁট দেয়। কপিল তার বুক থাবড়ে ধরে। চাপ দিতে দিতে রাঙা হয়ে উঠতে থাকে। আর সারা— সরস্বতীও। তার স্বামী যেথায় যাচ্ছে যাক, তার কী অভাব? কপিলকে ভাল করে তুলবে সে। তুলবেই।

সেই অঘ্রানের দুপুরেই বিজনকুমার বসু একদিন আচমকা ফোন পায় প্রিয়তোষ নন্দীর। নন্দী বললেন, বোসবাবু যা ভেবেছিলাম তাই হলো।

কী?

ছেলেটা বদলাচ্ছে।

সত্যি?

হ্যাঁ মাথা খুলছে।

সত্যি?

হ্যাঁ আপনি একদিন আসুন, দেখবেন।

বিজন বলল, এতদিনে বাড়ি করার একটা মানে খুঁজে পাওয়া গেল নন্দীবাবু, ওই ধূলিহর গড়ে তোলার একটা মানে খুঁজে পাওয়া গেল নন্দীবাবু, ভাল থাকুন।

রাত্রে বাড়ি ফিরে কথাটা জানাতেই পাখি বলল, এবার তাহলে নিয়ে চলো বাবা, আমার স্যারও যাবে, ও কোনোদিন জগৎপুর দ্যাখেনি।

কোন স্যার?

যে স্যার আমাকে পড়াত এইচ.এস-এ।

শুভব্রত?

হ্যাঁ। পাখি বলল, আবার কে?

পাখির এইচ.এস শেষ হয়ে ফার্স্ট ইয়ার শেষের মুখে। বিজন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এখনো যোগাযোগ আছে নাকি?

পাখি মাথা নামিয়ে ভিতরে ভিতরে কাঁপতে লাগল।